Himalaya Darshan (Vol.III)

A book on Trekking
by Kalidas Chakraborty

প্রকাশক ঃ

রঞ্জু চক্রবর্তী
৭৬এ/১, বামাচরণ রায় রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০০৮

প্রচ্ছদ, ছবি ও মানচিত্র

রঞ্জু চক্রবর্তী (কোয়ার্টারমাষ্টার)

মুদ্রণে ঃ

পি. কে. ভট্টাচার্য
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস্

ISBN 81-901723-11

আরোহণী

নিখিল বিশ্বচরাচরে অনাদ্যন্ত কাল ধরে রূপ রস শব্দ গন্ধ ও স্পর্শের বিপুল বিচিত্র আয়োজন। জগতের এই আনন্দযজ্ঞে দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরদের মতই মানবের আমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন কবিকুল যুগযুগান্ত কাল। রচিত হয়েছে কত কাব্য আর সাহিত্য-সম্ভার। বিশ্ব-সৌন্দর্যের বিশালতার বিস্ময় মানুষের মন আর ইন্দ্রিয়গুলিকে যেভাবে আপ্যায়িত আপ্লুত করেছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিমালয়। কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস তাই তাঁর কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যের সূচনায় হিমালয়ের মহিমা উদ্‌ঘোষণ করে বলেছেন—

উত্তর দিকে রয়েছেন দেবতাত্মা হিমালয়। যেন পৃথিবীর বিস্তার নির্ণয়ের মানদণ্ডরূপে দাঁড়িয়ে আছেন পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন ক'রে। (কুমার ১/১)। পৃথিবীর ভার ধারণ করতে যে শক্তির প্রয়োজন, তা রয়েছে হিমালয়ের। তাছাড়া যজ্ঞের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন তার উৎস হিমালয়! সৃষ্টিকর্তা বিধাতা এই সমস্ত বিবেচনা করেই হিমালয়কে পর্বতদের রাজা বলে ঘোষণা করেছেন। (কুমার ১/১৭)। রজনীর জ্যোৎস্নালোকে যেন হিমালয়ের মস্তকে শ্বেত ছত্র, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যখন চমর মৃগীগণ তাদের শ্বেতবর্ণ লাঙ্গুল আন্দোলত করতে করতে ঘুরে বেড়ায়, তখন মনে হয় হিমালয়ের 'রাজা' নাম সার্থক ছত্র আর চামরতো রাজারই চিহ্ন। (কুমার ১/১৩) কি স্নিগ্ধ হিমালয়ের সমীরণ! এই সমীরণ বয়ে আনে গঙ্গাপ্রপাতের বিন্দু জলকণা, যার বেগে মুহুর্মুহুঃ কেঁপে ওঠে দেবদারু গাছগুলি। ময়ূরদের পুচ্ছ বিশ্লিষ্ট হয়ে শোভাবিস্তার করে। (কুমার ১/১৫)। হিমালয়ের শিখরস্থিত সরোবরে প্রস্ফুটিত হয় কত পদ্ম। সপ্তর্ষিগণ চয়ন করার পরে যে সব পদ্ম অবশিষ্ট থাকে— সূর্যদেব উপরে কিরণ প্রসারিত ক'রে সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করেন। (কুমার ১/১৬)।

এই হল বিস্ময়-বিমুগ্ধ কবির বাক্যময় বন্দনা-হিমালয়ের বর্ণনা। তার পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর কত ভাষায় কত কবিসাহিত্যিক আর হিমালয়-পথিকের কত শত শত সাহিত্যসম্ভারে হিমালয় বর্ণিত আর বন্দিত হয়েছে।

হিমালয় দর্শন

৩য় খণ্ড

কালিদাস চক্রবর্তী

ট্রেকস্ এণ্ড ট্যুরস্

কলকাতা - ৭০০ ০০৮

Himalaya Darshan (Vol.III)

A book on Trekking

by Kalidas Chakraborty

প্রকাশক ঃ
রঞ্জু চক্রবর্তী
৭৬এ/১, বামাচরণ রায় রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০০৮

প্রচ্ছদ, ছবি ও মানচিত্র
রঞ্জু চক্রবর্তী (কোয়ার্টারমাষ্টার)

মুদ্রণে ঃ
পি. কে. ভট্টাচার্য
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস্

আরোহণী

নিখিল বিশ্বচরাচরে অনাদ্যন্ত কাল ধরে রূপ রস শব্দ গন্ধ ও স্পর্শর বিপুল বিচিত্র আয়োজন। জগতের এই আনন্দযজ্ঞে দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরদের মতই মানবের আমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন কবিকুল যুগযুগান্ত কাল। রচিত হয়েছে কত কাব্য আর সাহিত্য-সম্ভার। বিশ্ব-সৌন্দর্যের বিশালতার বিস্ময় মানুষের মন আর ইন্দ্রিয়গুলিকে যেভাবে আপ্যায়িত আপ্লুত করেছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিমালয়। কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস তাই তাঁর কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যের সূচনায় হিমালয়ের মহিমা উদ্‌ঘোষণ করে বলেছেন—

উত্তর দিকে রয়েছেন দেবতাত্মা হিমালয়। যেন পৃথিবীর বিস্তার নির্ণয়ের মানদণ্ডরূপে দাঁড়িয়ে আছেন পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন ক'রে। (কুমার১/১)। পৃথিবীর ভার ধারণ করতে যে শক্তির প্রয়োজন, তা রয়েছে হিমালয়ের। তাছাড়া যজ্ঞের জন্য যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন তার উৎস হিমালয়! সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা এই সমস্ত বিবেচনা করেই হিমালয়কে পর্বতদের রাজা বলে ঘোষণা করেছেন। (কুমার ১/১৭)। রজনীর জ্যোৎস্নালোকে যেন হিমালয়ের মস্তকে শ্বেত ছত্র, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যখন চমর মৃগীগণ তাদের শ্বেতবর্ণ লাঙ্গুল আন্দোলত করতে করতে ঘুরে বেড়ায়, তখন মনে হয় হিমালয়ের 'রাজা' নাম সার্থক ছত্র আর চামরতো রাজারই চিহ্ন। (কুমার ১/১৩) কি স্নিগ্ধ হিমালয়ের সমীরণ! এই সমীরণ বয়ে আনে গঙ্গাপ্রপাতের বিন্দু জলকণা, যার বেগে মুহুর্মুহুঃ কেঁপে ওঠে দেবদারু গাছগুলি। ময়ূরদের পুচ্ছ বিশ্লিষ্ট হয়ে শোভাবিস্তার করে। (কুমার ১/১৫)। হিমালয়ের শিখরস্থিত সরোবরে প্রস্ফুটিত হয় কত পদ্ম। সপ্তর্ষিগণ চয়ন করার পরে যে সব পদ্ম অবশিষ্ট থাকে— সূর্যদেব উপরে কিরণ প্রসারিত ক'রে সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করেন। (কুমার ১/১৬)।

এই হল বিস্ময়-বিমুগ্ধ কবির বাক্যময় বন্দনা-হিমালয়ের বর্ণনা। তার পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর কত ভাষায় কত কবিসাহিত্যিক আর হিমালয়-পথিকের কত শত শত সাহিত্যসম্ভারে হিমালয় বর্ণিত আর বন্দিত হয়েছে।

হিমালয়-বর্ণনা অর হিমাচল-বন্দনার এক আধুনিকতম বাঙালী সাহিত্যিক হিমালয় প্রেমিক শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়। হিমালয়ের উপর রচিত তাঁর দ্বাদশতম গ্রন্থ "হিমালয় দর্শন— তৃতীয় খণ্ড" প্রকাশিত হতে চলেছে। তাঁর এই সাম্প্রতিকতম গ্রন্থকে একজন হিমালয় সাহিত্য-পাঠকরূপে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই।

শ্রীযুক্ত কালিদাসবাবুকে চিনি এবং জানি বিগত পঁচিশ বৎসর ধরে। তাঁকে 'হিমালয়-পথিক' বা 'হিমালয়-প্রেমিক' না বলে এখন 'হিমালয়-পাগল' বলাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। এই মানুষটি হিমালয়ের কোল ছেড়ে নিজের নিশ্চিন্ত নিরাপদ আরামের আবাসে বিশ্রাম নিতে চান না কিছুতেই — এখনো এই সত্তর বৎসর বয়সেও। হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ, পর্বতগুহা, পাইনবনের সবুজের সমারোহ, ব্রহ্মকমল, নীলকমল, বহুবর্ণ ঘাসের গালিচা আর অজস্র নির্ঝর ও কুণ্ডগুলি তাঁকে নিরন্তর আকর্ষণ করে। ঘুরে ঘুরে বারে বারে যত দেখেন, ফিরে এসে এসে ততই তার স্মৃতি রোমন্থন করেন কলম হাতে নিয়ে। তারই ফসল তাঁর হিমালয়-সাহিত্য গ্রন্থমালা। হিমালয়ের বিপুল অঙ্গনে কত বিচিত্র পথে কতবার যে তিনি একাকী পথিক হয়েছেন! কতবার গিয়েছেন পারিবারিক ট্রেকিং টীম নিয়ে। তাঁর হিমালয়কে দর্শন করার চক্ষু এবং হিমালয়কে অনুভব করার অন্তর বার বার তাঁর গ্রন্থ-রাজিতে উপস্থিত হয়েছে অন্তরঙ্গ রূপে। তাঁর পাঠকসমাজ তাই আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন তাঁর পরবর্তী গ্রন্থের জন্য। হিমালয় দর্শন-তৃতীয় খণ্ড এই প্রতীক্ষাকে সার্থকতায় মণ্ডিত করবে — এ আমার ধ্রুব প্রত্যয়।

শ্রীযুক্ত কালিদাসবাবুর সঙ্গে মানসিক ঐক্যে হিমালয়ের সান্নিধ্য উপস্থিত হয়ে হিমালয়ের মহিমায় বিমুগ্ধ হ'য়ে ঋষিবাক্য উচ্চারণ করতে ইচ্ছা হয় —

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

মকর সংক্রান্তি

—অধ্যাপক শ্রী কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী
কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-বেদান্ততীর্থ।

উৎসর্গ

সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে, দৃঢ় হস্তে করে আলিঙ্গন
দেব-স্তুতি শিরে ধরি, অঞ্চলে মুছাইয়া আঁখি
কর্মযজ্ঞে দিয়েছো ঠেলিয়া।
এ জগত মায়াময়, পরবাসে যত না সংশয়।
জীবন-মধ্যাহ্নে কত রজনী প্রভাত হয়,
না বলা কথায়। সায়াহ্নে দর্শক মাত্র শুধু দু-জনায়।
সফলতার মূলে যার দান সর্বাধিক, সেই স্নেহময়ী
ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিলাম আমার দ্বাদশতম
সৃষ্টি হিমালয় দর্শন (৩য় খণ্ড)।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
ট্রেকস্ এণ্ড ট্যুরস্
৭৬এ/১, বামাচরণ রায় রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৮
Ph. : 2406-8597

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

- হিমালয় দর্শন (১ম খণ্ড)
- হিমালয় দর্শন (২য় খণ্ড)
- রূপময়ী পিণ্ডারী
- রহস্যের অন্তরালে রূপকুণ্ড
- পঞ্চকেদার পরিক্রমা (পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ)
- মণিময় মণিমহেশ
- রাউণ্ড অন্নপূর্ণা
- নেপালের পথে হিমালয়
- অমৃতময় অমরনাথ
- অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প
- দেবভূমি কেদারতাল

সূচিপত্র

এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ হিমালয়ের বঞ্চিত মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নকল্পে ব্যয়িত হবে।

নিবেদন

কলিংবেলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কম্বলের ভিতর থেকে মাথাটা বের করে দেখি অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছি। মোটেই স্বপ্ন নয়। স্পষ্ট কলিংবেলের আওয়াজ। ঘরে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, কলিংবেলের বালাই নেই। কি ভাবে তার শব্দ পাই? আমার ইন্দ্রিয়কে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।

দেশলাই জ্বেলে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালি। হাতের ঘড়িতে ভোর চারটে। রাতে যেভাবে শুয়েছি এখনও ঠিক সেই অবস্থা। ধুনির একদিকে আমার বিছানা, সম্মুখে ও বামে আরও দুটি চটের আসন, সেখানেও শোয়া যায়। ডান হাতে দেশলাই, প্রদীপ, সামান্য কিছু কাঠ। আমি যেখানে বসে আছি সেটা কোন মহাত্মার ধ্যানাসন।

গতকাল কালশিলা আসার পর ঐটি আমার জন্য বরাদ্দ হয়। যুক্তি তর্কের অবতারণা না করে গুরুজীকে স্মরণ করি।

মহাত্মা বর্খাগিরির ডাক শুনতে পাই। চা পানের আহ্বান আসে। বাইরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে মহাত্মার ঘরে গিয়ে ধুনির পাশে বসি। মহাত্মা আসনে বসেই ধুনির আগুনে চা তৈরি করেন। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে ঘটনার বিবরণ দিই।

বর্খাগিরি প্রতিদিন রাত সারে তিনটেয় শয্যা ত্যাগ করেন। অতি প্রত্যুষে মন্দিরে গিয়ে মহাসরস্বতীর প্রভাতি বন্দনা সম্পন্ন করেন। তারপর নিজের হাতে চা তৈরি করে পান করেন। এসবই বর্খাগিরির নিত্য কর্মের অঙ্গ।

মহাত্মা বলেন, এটা সিদ্ধপীঠ। এখানে অনেক ঘটনাই ঘটে। অনেক কিছু দেখা যায়, শোনা যায়। এসবের কোন ব্যাখ্যা মেলে না। রাতে-দিনে যে কোন সময় স্তব্ধতার মধ্যে সুমধুর সঙ্গীত শোনা যায়। অবাক হয়ে মহাত্মার কথা শুনি।

কোটিমায়েশ্বরীতে মহাত্মা শিলাগিরির ঘরে বসেও একই কথা শুনি। এ স্থান কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন। স্কন্দপুরাণে কেদারখণ্ডে সিদ্ধপীঠ নামে এইসকল স্থানের উল্লেখ আছে। মাঝে মাঝে কে যেন বীণা বাজায়, সুমিষ্ট সুরে বাঁশি বাজে, নানা সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে। চোখ বন্ধ করে চুপটি করে শুনি। —এখন বর্ষাকাল, মধুগঙ্গা ও সরস্বতী গঙ্গার গর্জনে সবকিছুই ঢাকা পড়ে। শীতের রাতে আপনিও স্পষ্ট শুনতে পাবেন।

এসব অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও ঘটনা। হিমালয়ে ঘুরে ঘুরে ঋষি মহাত্মাদের

কথা অবিশ্বাস করতে ভুলে গেছি। হাজার হাজার বছর ধরে হিমালয় ঋষি মহাত্মার তপোস্থলী। ব্যাস, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, অত্রি প্রমুখ ঋষিগণ অধ্যাত্ম জগতের পথ প্রদর্শক। এইসকল মহাত্মা আপন ঘরে স্থান করে নিয়েছেন।

আবহমান কাল থেকেই সেই ধারা আজিও বর্তমান। বর্তমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেই ধারাকে পাথেয় করে নব নব আবিষ্কারের পথে এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের হিমালয় মহান মহিমময়, তীর্থময়, দেবতাত্মা, ব্রহ্মবিদ। ভারতের উত্তর সীমান্ত হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

হিমালয়ের তুষার-শুভ্র হিমবাহ থেকে উৎসারিত অসংখ্য নদী নির্ঝরিণী অহর্নিশ ভারতমাতার চরণ যুগল বিধৌত করে। হিমালয় থেকে আগতা নিত্য প্রবহমানা স্রোতস্বিনীর জল সিঞ্চনে ভারত ভূমি উর্বর ও শস্য-শ্যামল।

বর্তমান যুগের মানুষ হিমালয় তীর্থ পরিক্রমার মাধ্যমেই তার মাতৃভূমির মহনীয় ঐতিহ্যের সন্ধান ও স্বাদ পায়। মানুষ পৌরাণিক ও আধুনিক ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাধনার তত্ত্ব অনুধাবন করে ধন্য হয়। হিমালয় ভারতবাসীর মাতৃভূমি, এ ভূমির অমোঘ অদৃশ্য হাতছানি শাশ্বত। সেই অদৃশ্য হাতছানির আহ্বানে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য নর-নারী ছুটে যায় হিমালয় অঙ্গনে। কেউ যায় কৌপীনবন্ত হয়ে সাধনা সিদ্ধির সংকল্প নিয়ে। কেউ যায় তীর্থ দর্শনে। কেউ যায় পদযাত্রী ও অভিযাত্রীর মন নিয়ে। কেউ যায় নিঃসর্গ সৌন্দর্য উপভোগের বাসনা নিয়ে। আবার কেউ যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নবতম তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

মহাভারতের লেখক মহামুনি ব্যাস বলেছেন—পুণ্য-উৎসারক যাগ-যজ্ঞে ব্যয় বহুল অনুষ্ঠান করা রাজা বা ধনী ব্যক্তিদের ছাড়া অপর কারুর পক্ষে অতি কঠিন। কিন্তু তীর্থ-পরিক্রমারূপ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সক্ষম ধনী দরিদ্র সবাই। এই তীর্থ-যজ্ঞে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা মানুষ স্বীকার করে তা অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। — বনপর্ব, ১৩।১৮।।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের গ্রন্থসমূহ বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, গীতা ও চণ্ডী। এই সকল গ্রন্থ হিমালয়ের প্রতিটি উপলখণ্ডের সাথে মিশে আছে। মানব ধর্মই প্রতিটি যুগের যুগধর্ম। ত্যাগ, সেবা, নিষ্ঠা ও দান মানব ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

হিমালয় দর্শন (৩য় খণ্ড) রচনার সুবাদে প্রকৃতির নানা অঙ্গনে অজানা অপ্রচলিত পথে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি। হিমালয় নিবাসী গৃহী, সন্ন্যাসী, ও বানপ্রস্থে থাকা প্রবীণ ব্যক্তিদের দর্শন পেয়েছি। দেবতাত্মা হিমালয়ের দেবময় জগতের সান্নিধ্য

লাভ করেছি। হিমালয় বিরাট, তার বিরাটত্বের নিকট অবনত মস্তকে প্রণতি জানাই।

হিমালয়ের মহাঙ্গনে যিনি আমার হাতখানি চেপে ধরেন, অন্ধের যষ্টি হয়ে পথ দেখিয়েছেন, সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী রামতা যোগী স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজের নিকট আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁর অকৃপণ প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আমি মুগ্ধ। তাঁর দীর্ঘায়িত-হিমালয় সন্ন্যাস জীবন প্রার্থনা করি।

পরম পূজ্যপাদ শ্রী কেদারেশ্বর চক্রবর্তী আমার শ্রদ্ধার স্যার। তার নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে আমি মুগ্ধ। তাঁর হিমালয়-প্রতিম ঔদার্য মূল্যায়নের উর্ধ্বে। আমার প্রতিটি গ্রন্থই তাঁর স্নেহময় স্পর্শে ধন্য। হিমালয় দর্শন তৃতীয় খন্ডের ভূমিকা রচনা করা তাঁরই অবদান। আমার জীবনে তাঁর দান অপরিশোধ্য। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সাধ্য আমার নেই। শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণতি জানাই।

আমার জীবনে অধ্যাপক সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হিমালয়ের এক মহান প্রাপ্তি। তাঁর প্রীতিময় মহানুভবতা ও বিরাটত্ব পরিমাপের উর্দ্ধে। হিমালয় দর্শন ৩য় খন্ডের সংযোজন ও সংশোধন প্রক্রিয়া তিনিই সম্পন্ন করেছেন। তার প্রতি রইল সুগভীর প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা। বন্ধুবর চট্টোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

ডঃ দিলীপ ভট্টাচার্য্য আই.এ.এস, প্রাক্তন শিক্ষাধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, একটি হিমালয় নিবেদিত প্রাণ। হিমালয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ পরিমাপের উর্ধ্বে অবসর জীবনেও তিনি হিমালয়ের ডাকে দূর-দূরান্তে পারি জমান। হিমালয়ের নানা তথ্যে সমৃদ্ধ এই মানুষটির নিকট আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী। গ্রন্থ রচনায় তথ্য ও আলোকচিত্র দিয়ে তিনি নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর মহা মূল্যবান সময় ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাঁর প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি,শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

অবশেষে হিমালয়ের পথে যাদের সান্নিধ্যে পথ চলেছি, রাতের আস্তানায় একত্রে আহার করেছি, সেইসব হিমালয় নিবাসী রচ্‌পাল, মহীপাল, ভগবান সিং, ফকিরা সিং, চৌকিদার মঙ্গল সিং, (মিলামের পথে) TBPF সকলকে জানাই অকৃত্রিম প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

নিবেদন ইতি —

বিনয়াবনত —

(গ্রন্থকার)

কেন যাবেন ভ্রমণে

সুস্থ, সবল দেহ নিয়ে শান্তিতে বাঁচতে হলে দেহের সাথে চোখ ও মনের খোরাক চাই। আমরা দেহ নিয়েই ব্যস্ত, মনের কথা ভাবি না।

মনের খোরাকের শতকরা ৮০ ভাগ আসে প্রকৃতি থেকে বা ভ্রমণে। চোখ ও মনের ক্ষুধা মেটাতে পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র ও নদীতটে অসংখ্য খাদ্য ভাণ্ডার থরে থরে সাজানো।

শ্যামল, শুভ্র, সোনালী প্রকৃতির কোলে যেখানে ভ্রমর আপন মনে সুধা পান করে, চাতক প্রাণভরে তৃষ্ণা মেটায়, প্রেয়সী তার প্রেমাস্পদকে বুক উজাড় করে ঢেলে দেয়, যেখানে দীননাথ ব্রাহ্ম মুহূর্তে শুভ্র শিখরে আলপনা আঁকে, গভীর সমুদ্রে পঞ্চপ্রদীপে আরতি হয়, নিঃশব্দ পদ সঞ্চালনে বনদেবীর ঘুম ভাঙ্গে সেই অজানা অচেনা চত্বরে মনের খোরাকের কোন অভাব নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চিত্তবিনোদনের জন্য যে পসরা সাজিয়েছে তা শুধু চোখ ও কানের তৃপ্তিদায়ক। মনের ক্ষুধা মেটাতে তার কোন আয়োজন নেই।

ভ্রমণে গিয়ে যে রসদ সংগৃহীত হয় তা দিয়ে অনেক দিন চলে। মন যে পরিমাণ আহার করে সেটা সে সারা বছর চর্বণ করে। সেই আনন্দ তার চোখে মুখে এমনকি শরীরে প্রকাশ পায়।

হিমালয় ভ্রমণে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, আনন্দে কর্মদক্ষতা বাড়ে, মানুষকে বড় করে। অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে। নিজেকে, সমাজকে ও দেশকে চেনার সুযোগ আসে। তাইতো ভ্রমণ শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। ভ্রমণ নেয় না কিছুই, ভরিয়ে দেয় নিঃসঙ্গ মানুষকে নানা উপাদানে।

ভ্রমণে সুস্থ শরীর কাম্য। ভ্রমণ-প্রিয় মানুষ প্রাতর্ভ্রমণ বা শরীর চর্চা করেন। উন্নয়নশীল দেশে ভ্রমণ পারিবারিক মর্যাদার সূচক (status symbol)।

কোন সময় যাবেন

ট্রেকিং, পর্বতাভিযান এবং হিমালয় ভ্রমণ — এ তিনের কাল নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী, এই চার ধাম হিমালয় পিপাসু তীর্থযাত্রীর মহাতীর্থ। শীতকালে এই চার ধাম ১৫-২০ ফুট বরফের নীচে চাপা পড়ে। হিমালয়ের অধিকাংশ রাস্তাঘাট যান চলাচলের অনুপযুক্ত থাকে। দীপাবলীতে প্রথম তিন ধামের পাট বন্ধ হয়, কয়েকদিন পর গঙ্গোত্রীর পাঠ বন্ধ হয়। মন্দিরের বিগ্রহ, পূজারী ও পাণ্ডারা সকলেই নীচে শীতকালীন আবাসনে চলে আসেন।

বরফ গলা শুরু হয় মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে। এপ্রিলের শেষ দিকে রাস্তাঘাট বরফমুক্ত হয়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই যান চলাচল শুরু হয়। মে-জুন এই দুই মাস চার ধাম ভ্রমণ এবং ট্রেকিং-এর পক্ষে উপযুক্ত সময়।

জুলাই-আগষ্ট পাহাড়ে বর্ষাকাল। বর্ষণস্নাত হিমালয় 'পীত-বসন-বনমালী'। প্রকৃতি পুষ্পালঙ্কারে ভূষিত। পুষ্প-প্রেমী পর্যটক জুলাই-আগষ্ট এই দুই মাস Valley of Flowers ভ্রমণের ভ্রমণসূচী রচনা করবেন। ভ্যালী অফ্ ফ্লাওয়ার্স দেখতে এসে হেমকুণ্ড সাহিবের কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। ৫ই জুলাই থেকে ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত চলে হেমকুণ্ড সাহিবের উৎসব। সারা পথ উৎসবমুখর। উৎসাহী পর্যটকগণ একই যাত্রায় হিমালয়ের দুই প্রস্ফুটিত কুসুম চয়ন করতে পারবেন।

বর্ষার পর প্রকৃতি সুনির্মল, আকাশ মেঘমুক্ত, ধ্যানমৌন গিরিরাজ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এই দুই মাস হিমালয়ের সর্বত্র ভ্রমণ ও ট্রেকিং-এর জন্য ভ্রমণসূচি রচনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময়।

ROOPKUND

HOMKUND GALI 17,172'
HOMKUND 15.700'
DODANG 13,300'
SHILA SAMUDRA 14,000'
CHANONIA 11,000'
GHAT
JIUNRA GALI
SUTOL 7190'
SITEL 6,000'
ROOPKUND 16,000'
KANOL
BAGUABASA 14,000'
BAGCHO
KAILU VINAYAK
KUKINA KHAL
WAN 8,000'
PATAR NACHUNI
BAIDINI BUGIYAL 12,500'
KULING
ALI BUGIYAL 12,000'
DIDNA 10,000'
LOHAJANG 8,000'
MANDOLI
DEVAL
THARALI
KARNA PRAYAG
GWALDAM
HALDWANI
HOWRAH
NOT TO SCALE
TRAIN ROUTE
TREKKING PATH
BUS ROUTE
PASS
JEEP ROUTE
LAKE

PRACHIN PATHE KEDARNATH
BAHUJATIA 3700 M.
DHANEJU 3500 M.
KHADORA BUGIYAL 3400 M.
NEROLA BUGIYAL
CHIPI BUGIYAL 3080 M.
DEULI 2600 M.
PAYALU 2080 M.
CHOWMASHI 2040 M.
JALMALLA
JALTALLA
KHUNNU
KOTMA
KALIMATH
GUPTAKASHI 1474 M
HARIDWAR
HOWRAH
GOURIKUND
BHAIRAVNATH
KEDARNATH
NOT TO SCALE
TRAIN ROUTE
TREKKING PATH
BUS ROUTE
PASS
JEEP ROUTE
TEMPLE

MILAM GLACIER

Nilkantha Mahadev

নীলকণ্ঠ মহাদেব
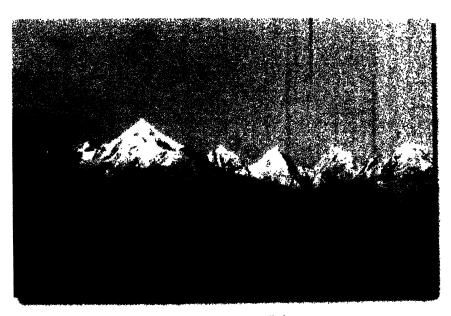
Panchachuli in twilight

গোধূলীর রঙে পঞ্চচুলী

Kotimayeswari Temple

কোটিমায়েশ্বরী মন্দির

Ruchmahadev

রূচ মহাদেব

Bangali Baba - Kedarnath

বাঙালীবাবা - কেদারনাথ

Barkha Baba - kalsila

বর্খাবাবা - কালশিলা

Onkareswar Temple - Ukhimath

ওঙ্কারেশ্বর মন্দির - উখীমঠ
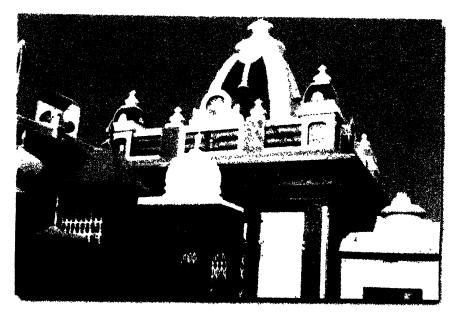
Kamaleswar Temple

কমলেশ্বর মন্দির

Duli yatra - Kedarnath

ডুলিযাত্রা - কেদারনাথ

Munsiyari
মুন্সিয়্যারী

Writer in trekking path
ট্রেকিং পথে লেখক
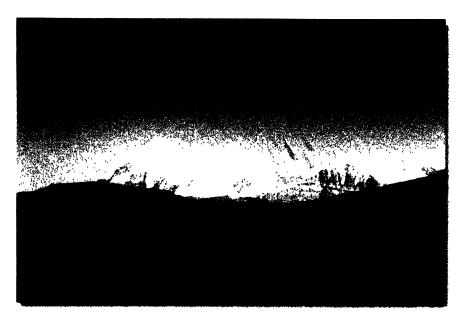
Mt. Trisul in twilight

গোধূলির রঙে ত্রিশূল

Mysterious Rupkund

রহস্যময়ী রূপকুন্ড

Reflection of Mt. Trisul

বেদনীকুণ্ডে ত্রিশূলের প্রতিফলন

Nandadevi Tample-Bedni bugiyal

নন্দাদেবী মন্দির - বেদনী বুগিয়াল

Khunnu Base-camp - Prachin Pathe Kedarnath
খুন্নু বেসক্যাম্প
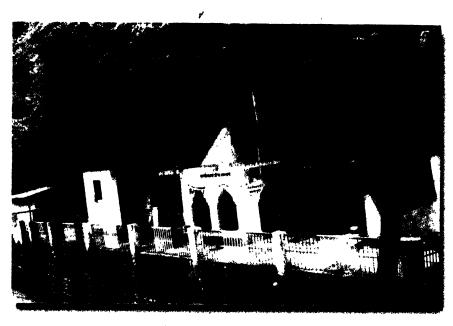
Kapilkuti-Gourikund
কপিলকুঠি - গৌরীকুন্ড

প্রাক কথন

সৃষ্টির আদিপর্ব থেকে হিমালয় ও ভারতবর্ষ পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রাণীজগত ও উদ্ভিদজগত হিমালয়ের প্রভাবে সমৃদ্ধ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সংস্কৃতি সকল বিষয়ে হিমালয়ের দান অনস্বীকার্য। হিমালয়কে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব ভাবা যায় না।

মহাকবি কালিদাস ভারত জননীর অন্যতম সৃষ্টি। তাঁর রচিত অধিকাংশ গ্রন্থই হিমালয়ের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলম্ ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ সমূহ সংস্কৃত সাহিত্যের এক একটি মহামূল্যবান রত্ন। হিমালয়কে তিনি শিব ও পার্বতীর লীলাভূমি নামে অভিহিত করেছেন। হিমালয় দেবতাত্মা। দেবতার আবাসভূমি হিমালয়। হিমালয় প্রাণের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক। নগাধিরাজ গিরিরাজ ইত্যাদি শত নামে ভূষিত। প্রতিটি সম্ভাষণই শোভাময়।

মেঘদূত কাব্যে 'মেঘ' বার্তাবহ। মহাকবির সুমধুর সম্ভাষণে মেঘকে কৈলাস পর্বতে বিরহকাতরা প্রিয়ার কাছে প্রেমিকের বার্তা বহনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কবির কুমারসম্ভব কাব্য হিমালয়- কন্যা পার্বতী ও নগাধিরাজের লীলারসের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সৃষ্টির আনন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ। যেখানে সৃষ্টি নেই সেখানে আনন্দ নেই। সৃষ্টি সুন্দরের প্রতীক। শকুন্তলম্ নাটকের প্রারম্ভে তিনি গিরিরাজের বন্দনা করেছেন।

বাংলা কাব্য জগতের অমর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর হিমালয় বন্দনাঃ-

[illegible]সীম নীরদ নয়, ওই গিরি হিমালয়
[illegible] উঠেছে যেন অনন্ত জলধি,
ব্যাপে [illegible] দিগন্তর তরংগিয়া ঘোরতর
প্লাবি[illegible]গনাংগন জাগে নিরবধি

ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি;

কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন।

হিন্দি কাব্য-গ্রন্থে কবি নিরালা হিমালয়কে অদ্বৈনিবাদী দার্শনিক রূপে বর্ণনা করেছেন।

তুমি তুঙ্গ হিমালয় শৃঙ্গ, তুমি চঞ্চল গতি সরিতা

তুমি বিমল হৃদয়-উচ্ছ্বাস, তুমি কান্ত কামিনী কবিতা।

হিমালয় গণতন্ত্রের প্রতীক। দেশী, বিদেশী, নানা বর্ণের, নানা মতের, নানা ধর্মের, মানুষ আসে হিমালয়ে। হিমালয় নেয় না কিছুই, ভরিয়ে দেয় নিঃসঙ্গ মানুষকে নানা উপাদানে। সকলের একটাই পরিচয় হিমালয়-পরিব্রাজক। হিমালয়ের পথে রাম-রহিম একই বোতলে জলপান করে। একই মন্ত্রে দেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদান করে।

হিমালয় দেবতার আবাসভূমি, ঋষি, মুনি, যোগীর তপোবন, সিদ্ধভূমি। সাধু মহাত্মার চরণ স্পর্শে হিমালয়ের প্রতিটি উপলখণ্ড পরম পবিত্র ও তীর্থময়।

হিমালয় উৎসারিত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, অসংখ্য স্রোতস্বিনী ভারতবাসীর মাতৃ স্বরূপা। মাতৃ-দুগ্ধে বসুন্ধরা সবুজ, সতেজ ও প্রাণময়। সেই স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপা হিমালয়ের কোলে আদর পেতে কার না ইচ্ছা হয়?

পূর্বেই বলেছি মায়ার বাঁধন কাটিয়ে, বাড়ির গণ্ডি পেরিয়ে হিমালয়ের পথে পা-বাড়ালেই কে যেন হাত ধরে টেনে নেয়। সেই অজানা, অচেনা অদেখার হাত ধরে আমিও এগিয়ে চলি। পথের দুর্গমতা, পথের বিপদ, পথের বাঁধা, কোন কিছুই বুঝতে পারি না।

হিমালয়ের কৃপায় যাকে পেয়েছি সেই পরমারাধ্য গুরুজীকে মনে মনে স্মরণ করি। তাঁর কথাগুলি প্রতিমুহূর্তে ধ্বনিত হয় হৃদয় মন্দিরে। এ সবই তার কৃপা। তাঁর কৃপাতেই তাঁকে প্রাপ্তি।

প্রথম যেদিন গঙ্গোত্রীর অমৃতঘাটে যাই সেদিন যে পথ দেখিয়েছিল সে

আমার কোয়ার্টারমাষ্টার। 'Way to Falahari baba' লেখা ফলক তাঁর নজরেই প্রথম আসে। মহাত্মার সান্নিধ্যে জীবনটাই বদলে যায়। হিমালয়ের প্রভাব মানুষের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। হিমালয়কে দেখার দৃষ্টি চাই। হিমালয় কথা বলে, সে কথা কান পেতে শুনতে হয়। হিমালয়ের ভাষা আছে, সে ভাষা মনের মণিকোঠায় অনুভব করতে হয়।

আমি গ্রন্থ রচনা করি আমার পাঠকের জন্য, তাঁরাই আমার প্রেরণার উৎস। তাঁদের মধ্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই। তাদের মনের মণিকোঠায়, হৃদয় জুড়ে আমি বাসা বাঁধি। আমার আদরের সোনা দাদা আমার সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিশোর বন্ধু আমার ক্ষুদে পাঠক, দেখা হলেই মণিমহেশের গল্প শোনায়। তার ইচ্ছা বড় হয়ে সে মাকে নিয়ে মণিমহেশ যাবে। মণিকৈলাসের চূড়ায় চেপে সে বুড়ো দাদুর কপালের ঐ সোনার চাঁদ পেরে আনবে। আমার গুড্ডু ও ছোট্টু হিমালয়ের মত বড় হয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসবে। হিমালয়ের বুকে ঘুরতে ঘুরতে এ স্বপ্ন আমি দেখি। স্বপ্ন যদি সার্থক হয় তবেই আমার লেখা প্রাণ পাবে। আমি লিখে যাই, আমার কথা আমি বলে যাই। সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

হিমালয় থেকে যা কিছু পেয়েছি তাঁর সবটুকু আমার পাঠকের মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই। হিমালয়ের বিরাটত্ব ও উদারতা পরিমাপের ঊর্ধ্বে, তার মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কণামাত্র যদি সঙ্গে আসে তাতেই আমি ধন্য। পুরাণে কথিত আছে সৃষ্টির আদি পর্বে দেবতা ও দানবগণ একত্রে সমুদ্র মন্থন করেন। মন্থনের ফলে প্রথমে হলাহল ও পরে অমৃত উত্থিত হয়। সেই অমৃত পান করে দেবতাগণ অমরত্ব লাভ করেন।

পূর্বেই বলেছি আমার পাঠক আমার দেবতা। আমার দেবতাকে অমৃত সেবনের সংকল্প নিয়ে "হিমালয় দর্শন" তৃতীয় খণ্ড রচনায় ব্রতী হই। আমার এই গ্রন্থ যদি পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণে বিন্দু মাত্র সহায়ক হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক।

— **লেখক**

PANCHAKEDAR
MADMAHESWAR
3289 M.
KEDARNATH
3584 M.
RUDRANATH
2286 M
KALPESWAR
2134 M.
GOUNDER
TUNGANATH
RANSI
PANAR
HELLANG
GOPESWAR
SAGAR
CHOPTA
UNIYANA
KALIMATH
GUPTAKASHI
GOURIKUND
UKHIMATH
CHAMOLI
NANDAPRAYAG
KUND
RUDRAPRAYAG
DEVPRAYAG
RISHIKESH
HARIDWAR
HOWRAH
14
10
5
2
16
3
8
6
9
NOT TO SCALE
DISTANCE IN KM.
TRAIN ROUTE
TRAKKING PATH
BUS ROUTE
TEMPLE
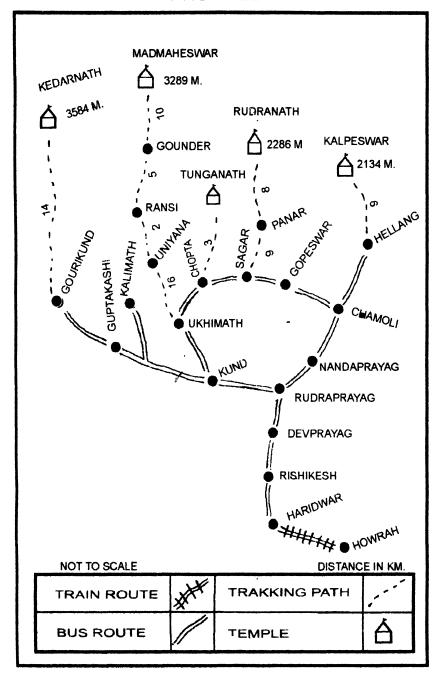
বিল্বকেশ্বর

হরিদ্বারে কুশাবর্তে বিল্বকে নীল পর্বতে,
স্নাতা কনখলে তীর্থে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।

শাস্ত্রে কথিত আছে হরিদ্বারে এসে ব্রহ্মকুন্ডে, কুশাবর্ত ঘাটে, বিল্বকেশ্বরের গৌরীকুন্ডে, এবং কনখলে স্নান করলে পুনর্জন্ম হয় না।

হরিদ্বারের অধ্যাত্ম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বিল্বকেশ্বর। সেই বিল্বকেশ্বরের খবর আমরা অনেকেই জানি না। হরিদ্বারে এসে বিল্বকেশ্বর না দেখলে হরিদ্বার ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

মনসা পাহাড়ের পাদদেশে প্রকৃতির ছায়া ঘেরা পরিবেশে বিল্বকেশ্বরের অবস্থিতি। বিল্বকেশ্বর প্রাণময় প্রশান্তিময়। হরিদ্বারের যে কোন প্রান্ত থেকে পায়ে পায়ে অথবা রিক্সায় চেপে বিল্বকেশ্বর আসা যায়। বিল্বকেশ্বরে এলে মনের ক্ষুধা মেটে। বিল্বকেশ্বর এখন মণ্ডিত। সমগ্র আঙ্গিনা সান বাঁধানো।

বিল্বকেশ্বর শিব ও মহাশক্তির সাধন পীঠ। সত্যযুগের কথা, মহাশক্তি মহামায়া দক্ষরাজের ঘরে কন্যারূপে প্রকট হন। বাবা মা আদর করে নাম রাখেন সতী। আদরের কন্যা সতী শৈশব থেকেই জেদি, সাহসী ও বুদ্ধিমতী। রাজকন্যা প্রায়শই কনখল থেকে বিল্বকেশ্বরে ভ্রমণে আসেন।

একদিন বিল্বকেশ্বরে একটি বিল্ব বৃক্ষের পাদদেশে এক শিব লিঙ্গ দেখতে পান। ঐ শিব লিঙ্গ মূর্তির দর্শনে আপন মনে তিনি মহামায়ার প্রভাব অনুভব করেন। শিব লিঙ্গ পরমেশ্বরের প্রতীক। সতী মহামায়া পরমেশ্বরী। তাঁর অন্তরে পরমেশ্বরের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। বন্ধুদের পরামর্শে তিনিও বিল্বকেশ্বরের তপস্যায় বসেন।

রাজা দক্ষ রাজকন্যার এই আচরণকে মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। এক ভস্মমাখা সাধুকে রাজজামাতা হিসাবে মেনে নিতে তিনি মোটেই রাজি হন নি। শঙ্কর ভগবানকে পরমেশ্বরের সম্মান দিতে তিনি মোটেই সম্মত ছিলেন না।

ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়। সতীর ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সাধনায় তৃপ্ত

হয়ে ভগবান শঙ্করজী সতীর সম্মুখে প্রকট হন। তিনি সতীকে বর চাইতে আমন্ত্রণ জানান। মা ভবানী পরমেশ্বরী শঙ্কর ভগবানকে সতীর পতিরূপে প্রার্থনা করেন। সেই অনাদিকাল থেকে ঐ স্থানের নাম বিল্বকেশ্বর এবং ঐ পর্বতের নাম বিল্ব পর্বত নামে অভিহিত হয়।

পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর বিবাহ্ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ত্রিযুগী নারায়ণে। বিবাহ- যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন ভগবান বিষ্ণু (নারায়ণ)। বিবাহ্ যজ্ঞের অগ্নি আজও প্রজ্বলিত। তাই নাম হয়েছে ত্রিযুগী। ত্রিযুগী নারায়ণ দর্শনে আগত যাত্রীগণ সকলেই্ অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করেন।

কলিযুগে বিল্বকেশ্বরের বিল্ববৃক্ষের বদলে নিম বৃক্ষ দেখা যায়। বৃক্ষের নিম্নভাগে ভূমি সংলগ্ন অর্ধচন্দ্রাকৃতি আসন। আসন-মধ্যে চতুর্ভুজ গণেশজীর মূর্তি। গণেশজীর ডাইনে মা-পার্বতী বামে ময়ূরে উপবিষ্ট কার্তিকজী, সম্মুখে শঙ্কর ভগবান, ভূমিতে শিব লিঙ্গ।

প্রধান মন্দিরের সম্মুখে অন্য এক মন্দিরে নবগ্রহ মূর্তি সমূহ। শুভ্র প্রস্তর ফলকে নির্মিত নাদেশ্বর মহাদেব মূর্তি অতি চমৎকার। অপর কক্ষে শাকম্ভরী দেবী। অন্য কক্ষে হনুমানজী। প্রান্তিক কক্ষে গণেশজী।

বিল্বকেশ্বরে হরিহর মহাদেবের লিঙ্গ মূর্তি অতি চমৎকার। প্রধান মন্দিরের সম্মুখে ধাতু নির্মিত নাদেশ্বর বৃষমূর্তি দর্শন যোগ্য। বিল্বকেশ্বরের মন্দির থেকে উত্তর দিকে সান বাঁধানো পথ গিয়েছে গৌরীকুন্ডে। ছায়া সুশীতল পথ। গৌরীকুন্ডের আঙ্গিনা সান বাঁধানো। পূর্বেই্ বলেছি এখন আধুনিকীকরণের যুগ। সর্বত্রই নূতন মন্দির। বিল্বকেশ্বর-গৌরীকুন্ডের জলাশয় এখন সান বাঁধানো 'কুঁয়া'। ঐ কুঁয়ার জল মহৌষধের কাজ করে। স্থানীয় মানুষ সেই বিশ্বাসে জল সংগ্রহ করেন।

বিল্বকেশ্বর - গৌরীকুন্ডের পশ্চাতে বিল্বপর্বতে বাঙালী সাধক ভোলা গিরি মহারাজের সাধন গুহা। বিল্বকেশ্বরে এলে পবিত্র গুহা দর্শন করতে ভুলবেন না।

বিল্বপর্বত হিমালয়ের অংশমাত্র। গঙ্গা হিমালয়ের অমৃতধারা বহনকারী (মার্গ) পথ মাত্র। হিমালয় জড় নয়, হিমালয় দেবতাত্মা, সচেতন।

ডুলিযাত্রা

বাবা কেদারনাথজীর ডুলিযাত্রায় অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিনের। ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাস্টারের প্রেরণাই যাত্রায় সফলতা এনে দেয়। কোয়ার্টারমাস্টার যাত্রায় অংশ না নিলেও প্রস্তুতি পর্বে তার অবদান সবটাই। দীর্ঘ হিমালয় ভ্রমণে প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষই সে গুছিয়ে দেয়। যাত্রার দিন হাওড়া স্টেশনে পৌছে দিয়েও তার ব্যস্ততার শেষ হয় না। আমার গাড়ি ৩০১৩ আপ উপাসনা এক্সপ্রেস, বেলা ১-১০ মিঃ ছাড়ে। বড় ঘড়ির তলায় আসতেই অমূল্যদার সাথে দেখা। অমূল্যদা অর্থাৎ বিখ্যাত পর্বতারোহী অমূল্য সেন। এক অভিযাত্রী দলকে বিদায় জানাতে তিনিও হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত। তাঁর আশীর্বাদ যাত্রা পথে উপরি পাওনা।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়ে। বিদায় জানাতে টুকাইও স্টেশনে উপস্থিত। কোয়ার্টারমাস্টার দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখের পাতা শক্ত করে হাত নাড়ে। শুধু একটি কথা — 'পৌছে ফোন করবে'। বাড়ি থেকে যাত্রাকালে ক্যাপ্টেন একটি কথাও বলতে পারেনি — তার চোখে বাষ্পায়িত অশ্রু আমি লক্ষ করেছি। তার-ই মাঝে দেবতার আশীর্বাদী প্রসাদ মুখে দিতে সে ভোলে নি।

২৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার, ২০০৩। হিমালয় মন্থনের সংকল্প নিয়ে বাড়ি থেকে যাত্রা। এবারের যাত্রা ডুলির আকর্ষণে। শুনেছি হিমালয়ের ডুলি যাত্রা দেখার সৌভাগ্য নাকি সকলের ভাগ্যে হয় না। হাজার তীর্থ দর্শনের সমান বাবা কেদারনাথ ও মদমহেশ্বরের ডুলি দর্শন।

উভয় দেবতার শীতকালীন আবাসন উখিমঠ, ওঙ্কারেশ্বর মন্দির। উখিমঠ থেকেই শুরু হয় কেদারনাথজীর ডুলি যাত্রা। প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে (রৌপ্য নির্মিত পঞ্চমুখী শিবলিঙ্গ) বাবা কেদারনাথজী ডুলিতে চেপে তাঁর আবাস ভূমি কেদারখণ্ডে যাত্রা করেন।

হিমালয়বাসীর নিকট ঐ দিনটি পরম পবিত্র ও গৌরবময়। সকলের বিশ্বাস দেবতা মঙ্গলময়, যাত্রাকালে তিনি উপস্থিত সকল ভক্ত ও অনুরাগিগণকে অকৃপণ ভাবে আশীর্বাদ প্রদান করেন। কথিত আছে ডুলিযাত্রায় অংশ নিলে

হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অখণ্ড জ্যোতি দর্শনে মানুষ নবজন্ম লাভ করে।

গতকাল অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল বুধবার, সায়ংকালে হরিদ্বারে এসে নেমেছি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের দোতলায় সিঁড়িতে এক শয্যার সুন্দর একটি ঘর আমার জন্য প্রস্তুত । স্বামীজী শুধু আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন।

আমি যখন একাই হিমালয়ে আসি তখন কে যেন অলক্ষ্যে আমার জন্য সব ব্যবস্থা করে রাখেন। হিমালয়ের পথে এ ব্যাপারটা আমি অনেকবার লক্ষ করেছি।

১লা মে, বৃহস্পতিবার, আশ্রমের ঘরে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। গুরুজীকে স্মরণ করি। ঘুম ভাঙ্গতেই কানে আসে ঘন্টা ধ্বনি। সুমধুর কণ্ঠস্বর, বৈদিক সুরে দেবতার স্তুতি গান ভেসে আসে। ঘড়িতে ভোর চারটে। দ্রুত তৈরী হয়ে নিই। সুন্দর ঘরটিকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।

কোন কিছু ভাবার সময় নেই। গতকালই খবর নিয়ে জেনেছি-হরিদ্বার থেকে গৌরীকুণ্ডগামী প্রথম বাস পৌনে পাঁচটায় ছেড়ে যায়। সুতরাং আমার রুক্স্যাক পিঠে তুলে নিই।

মন্দির আঙ্গিনায় কাউকে দেখতে পাই না। স্বামীজী মন্দিরে প্রার্থনা রত। মন্দিরের বারান্দায় দুই একজন ভক্তকে দেখতে পাই। মনে মনে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে যাত্রাপথে পা বাড়াই।

অপরাহ্ন বেলায় উখিমঠে এসে হাজির হই। ভারত সেবাশ্রম সংঘের যাত্রীনিবাসে আশ্রয় নিই।

২রা মে,২০০৩ প্রতিপদ তিথির শুভলগ্নে উখিমঠ থেকে সকাল ৮টায় কেদারনাথজীর ডুলি মহা সমারোহে যাত্রা করে। ঐ ডুলিযাত্রায় অংশ নিতে আমিও উখিমঠ মন্দির আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হই। কর্ণাটকীয় ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রী ১০০৮ শ্রী জগতগুরু ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ যিনি প্রধান রাওলজীর আসনে সমাসীন, তিনিই যাত্রার উদ্বোধন করেন।

পূর্বেই বলেছি উখিমঠ ওঁঙ্কারেশ্বর মন্দির কেদারনাথজীর শীতকালীন আবাসন। প্রধান রাওয়ালজীর গদিও উখিমঠে। ডুলি যাত্রার সময় তিনি কর্ণাটক থেকে উখিমঠে এসে অবস্থান করেন। কর্ণাটক নিবাসী অনেক ভক্ত শিষ্য রাওয়ালজীর সাথে উখিমঠে আসেন। এদের অনেকেই ডুলিযাত্রায় অংশ গ্রহণ

করেন। রাওয়ালজীর হাতে থাকে কেদারনাথ মন্দিরের চাবি, যিনি প্রথম মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং প্রথম জ্যোতি দর্শন করেন। তারপর তাঁর অনুগামী ভক্ত ও শিষ্যগণ।

যাত্রার দিন উখিমঠ মন্দির আঙ্গিনায় ভক্তপ্রাণ মানুষের ঢল নামে। ঢাক, ঢোল, সানাই নানা বাদ্যযন্ত্রে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। স্থানীয় স্কুলের ছেলেমেয়েরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। উখিমঠের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি কেদারনাথজীর সামনে মন্দির আঙ্গিনায় উপস্থিত থাকেন। স্থানীয় প্রশাসন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় উপস্থিত থেকে বাবার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। আশে পাশের গ্রাম থেকে অনেকেই আসেন তাঁদের ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম জানাতে। মন্দির আঙ্গিনার কেন্দ্রস্থলে সান বাঁধানো বেদী। বেদীর উপরে ঢুলি শোভিত। ডুলির নীচে দু-খানি হাতল বাঁধা থাকে। দুই জন ভক্ত শুদ্ধ দেহে নগ্ন পায়ে ঐ ডুলি কাঁধে করে বহনের জন্য প্রস্তুত থাকে।

পঞ্চমুখ (সদ্যজাত, তৎপুরুষ, বামদেব, অঘোর ও ঈশানেশ্বর) রৌপ্য নির্মিত বাবা কেদারনাথের প্রতিমূর্তি ডুলিতে বসানো হয়। স্থানীয় রমণিগণ শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ চিত্তে ডুলি বরণ করেন। দেবতার চরণে সিন্দুর ও কপালে চন্দন পরিয়ে দেন। জগতগুরুর নির্দেশে দুই বাহক ডুলি কাঁধে তুলে নেয়। বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে, বাহকগণ ডুলি কাঁধে নিয়ে মন্দির পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে প্রধান তোরণ দিয়ে যাত্রা করেন। প্রিয়জনের বিদায়কালীন বিয়োগ ব্যথায় সকলেই বিহ্বল। সুদৃশ্য শোভাযাত্রায় স্থানীয় স্কুলের ছেলে-মেয়েরা সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলে। ডুলিকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে তারা স্কুলে ফিরে আসে। ডুলির সাথে ঘোড়ায় চেপে চলেন রাওয়ালজী, যিনি বর্তমান বছরে পূজার দায়িত্ব পেয়েছেন। উপস্থিত সকলেই ডুলিকে অনুসরণ করে।

ডুলি যাত্রার পর উখিমঠের মন্দির আঙ্গিনা জনশূন্য হয়ে পড়ে। প্রথম দিন ডুলি 'ফাটা চটিতে' গিয়ে যাত্রার বিরতি টানে। আমি ডুলির সাথে কিছুটা গিয়ে আবার মন্দির আঙ্গিনায় ফিরে আসি। পশ্চিমবঙ্গে বিজয়া দশমীর পর পূজা প্রাঙ্গণে যে দৃশ্য দেখি ঠিক সেই দৃশ্য ফুটে ওঠে উখিমঠ মন্দির আঙ্গিনায়। বিষাদময় পরিবেশ। গত ছয় মাস "বাবা কেদারনাথজী" মন্দির আঙ্গিনা আলো

করে ছিলেন। সকলেই আত্মীয় বিদায়ের বেদনায় আহত। নিস্তব্ধ পরিবেশ।

ডুলির শোভাযাত্রা উখিমঠ থেকে তিন দিনে কেদারনাথ পৌঁছায়। প্রথম দিন ফাটা, দ্বিতীয় দিন গৌরীকুণ্ড, তৃতীয় দিনে কেদারনাথ। প্রতিটি স্থানেই দেবতার পূজা, ভোগ ও আরতি হয়। কেদারনাথ থেকে ফেরার পথে প্রথম দিন রায়পুর, দ্বিতীয় দিন গুপ্তকাশী ও তৃতীয় দিন উখিমঠ। কেদারনাথ থেকে উখিমঠ যাত্রার দিন সোমবার হলে উখিমঠে গিয়ে পূজা হয়।

বছরে দুবার ডুলিযাত্রার অনুষ্ঠান দেখা যায়। মে মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভলগ্নে উখিমঠ থেকে কেদারখণ্ড যাওয়ার পথে। দ্বিতীয়বার দীপাবলিতে (শীতকালে) কেদারখণ্ড থেকে উখিমঠে ফেরার পথে। কেদার মন্দিরের চাবি খোলেন মন্দির কমিটির অধ্যক্ষ (নটীয়ালজী) মহাশয়। মন্দিরে প্রথম প্রবেশ করেন শ্রীশ্রী ১০০৮ জগতগুরু ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ। জগতগুরুর পশ্চাতে প্রধান পূজারী রাওয়ালজী। তাঁদের পশ্চাতে স্থানীয় মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও বিশেষ বিশেষ যাত্রী। উত্তর দিকের প্রবেশদ্বার এই সকল মহামান্য ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট। মহামান্য অতিথিদের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পুলিশি ব্যবস্থাও নজরে পড়ে। ইতিমধ্যে কেদার মন্দিরের প্রধান প্রবেশ দ্বারে নন্দি মহারাজের পশ্চাতে দর্শনার্থীর দীর্ঘ লাইন দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বিশেষ পরিচিত ফটোগ্রাফার শ্রী কমলেশ কামিল্যা মহাশয় সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে তাঁর ক্যামেরায় ধরে রাখতে ব্যস্ত। মন্দির আঙ্গিনায় মিঃ কামিল্যার সাথে একটু কথাও হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি - 'প্রসাদ' - অর্থাৎ বাবা কেদারনাথের "মাস"।

উখিমঠে রৌপ্য নির্মিত পঞ্চমুখ শঙ্কর ভগবানের যে মূর্তি ডুলিতে বসানো হয় সেই মূর্তি কেদারনাথ মন্দিরে দৃষ্টি গোচর হয় না। ঐ মূর্তি রাখা হয় পূজারীর ঘরে। সেখানে সারা রাত্রি ধরে শঙ্কর ভগবানের বিশেষ পূজা। আরতি ও হোম হয়। এ সবের মাধ্যমে ভগবানের Power (শক্তি) স্থানান্তরিত হয় কেদারনাথ মন্দিরের ঐ শিলামূর্তিতে। ছয় মাস ঘুমিয়ে থাকা শিলা মূর্তি প্রাণ পায়। জাগ্রত হয় বাবা কেদারনাথজী।

বাবা কেদারনাথজীর মন্দির যে দিন বন্ধ হয় তার আগের দিন রাতে বাবার শিলামূর্তিতে ঘি, মধু, চন্দন ইত্যাদি মাখিয়ে বাবার বিশেষ স্নান হয়। স্নানের পরে হোম ও যজ্ঞ সহকারে বাবার বিশেষ পূজা হয়। পূজা অন্তে শিলামূর্তিতে হোম ও যজ্ঞের ভস্ম লেপন করা হয়। অখণ্ড প্রদীপে যথেষ্ট পরিমাণ ঘি, ও সলতে দ্বারা প্রদীপকে সঞ্জীবিত রাখা হয়। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ঐ প্রদীপ যাতে প্রজ্বলিত থাকে ঠিক তেমন-ই ব্যবস্থা করা হয়।

মন্দির খোলার আগের দিন রাতে বাবা কেদারনাথের বিশেষ পূজা হয়। ঐদিন পূজারী বাবার দেহের ভস্ম (মাস) পরিষ্কার করে নূতন করে ঘি, মধু মাখিয়ে দেন। বাবার দেহের ঐ ভস্ম (মাস) প্রধান পুরোহিত উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মহাপ্রসাদ হিসাবে বিতরণ করেন।

পাহাড়ী মানুষের বিশ্বাস ঐ ভস্মের টিকা অব্যর্থ ফলদায়ী। — বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর।

৫ই মে, ২০০৩। অক্ষয় তৃতীয়ার অন্তিম লগ্নে কেদারনাথ মন্দিরের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। প্রবাদ আছে ঐদিন যাঁরা মন্দির দর্শন করেন তাঁদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাঁরা অধিক মাত্রায় সৌভাগ্যবান। আমিও বাবার দর্শন ও পূজা অন্তে ভৈরব মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। রাওয়ালজী থালা হাতে মন্দিরের সামনে দণ্ডায়মান। তিনি অনেকের কপালে প্রসাদী তিলক (মাস) পরিয়ে দেন। রাওয়ালজী তিলক পরিয়ে আশীর্বাদ করেন। রাওয়ালজীকে প্রণাম করে ধন্য হই।

রাওয়ালজী ছয়মাসের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। প্রতিবছর কেদার-বদ্রী মন্দির কমিটির দ্বারা মন্দিরের পূজারী নির্বাচিত হয়। পূজারীর কাজ খুবই শক্ত। দেবার্চনার যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত থাকে। উখিমঠ থেকে ডুলির সাথে তিনি কেদারখণ্ডে আসেন। মন্দির বন্ধের দিন ডুলির সাথেই আবার নেমে যান। বাবা কেদারনাথের রৌপ্যনির্মিত মূর্তি শীতকালীন আবাসনে বসিয়ে তাঁর ছুটি।

দীর্ঘ ছয় মাস তিনি কেদারখণ্ডে কাটাবেন। সংসারের কোন খবরই তাঁকে দেওয়া হয় না। তিনি শঙ্কর ভগবানের ধ্যান, জপ, পূজা ও তর্পণে নিযুক্ত থাকেন।

গতকাল অপরাহ্ণ বেলায় কেদারখণ্ডে এসেছি। চারিদিকে শুধুই বরফ আর বরফ। সমগ্র কেদার খণ্ড ২/৩ ফুট বরফের তলায়। দোকানপাট কিছুই খোলেনি। কেদারখণ্ডে এমন তুষারময় রূপ পূর্বে কখনও দেখিনি। অতি সাবধানে বরফের উপর দিয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের দিকে এগিয়ে যাই।

আশ্রমের প্রধান ফটক বরফের পাহাড় দিয়ে আটকানো। সামান্য এগিয়ে বাঁ হাতে সরু পথ দিয়ে আশ্রমে নেমে যাই। স্বামী নিগমানন্দ মহারাজকে দেখে মনে ভরসা পাই। স্বামীজী সামান্য পূর্বে আশ্রমে এসেছেন। চারিদিকে বরফের স্তূপ দেখে স্বামীজীও চিন্তিত। কি করে বরফ সরাবেন সেটাই তাঁর ভাবনা। আলো ও জলের ব্যবস্থা হয় নি। জলের পাইপে জল জমে বরফ হয়ে আছে। আশ্রমের ছেলেরা প্রাণপণ কাজ করে চলেছে। এত অসুবিধার মধ্যে স্বামীজীর নিকট রাত্রিবাসের অনুমতি পাই। আশ্রমে মালপত্র রেখে মন্দির আঙ্গিনায় ফিরে আসি। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মন্দিরের বাঁহাতের লজে দোতলায় গিয়ে সচ্চিদানন্দের দেখা পাই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কম্বলে আশ্রয় নিয়েছেন।পথের সাথী, কৃষ্ণা, শিপ্রা, অনুরাধা, সকলেই লজের অন্য একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের মনেই আনন্দ। সকলের মুখে একই কথা — ডুলিযাত্রায় না এলে কেদারখণ্ডের এমন তুষারময় রূপ দর্শন হত না। শুভরাত্রি জানিয়ে আশ্রমে ফিরে আসি।

উখিমঠ

উত্তরাঞ্চলের অতি পরিচিত নাম উখিমঠ। রুদ্রপ্রয়াগ জেলার তহশীল শহর। প্রাচীন নাম শোণিতপুর। একদা রাজধানীর গৌরবে গৌরবান্বিত।

বাণাসুর ছিলেন বলিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। শঙ্কর ভগবানের পরম ভক্ত। তার রাজধানী ছিল শোণিতপুর। পরবর্তীকালে রাজকন্যা উষার নামানুসারে রাজধানীর নাম রাখা হয় উষামঠ আরও পরে উখিমঠ। উখিমঠের সন্নিকটে বাণরাজার নামানুসারে বাণসু গ্রাম এখনও বর্তমান।

কেদারনাথ বদ্রীনাথের পথে অনেক যাত্রীই উখিমঠে যাত্রার বিরতি টানেন। উখিমঠ হয়েই কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দুই ধামের সংযোগকারী পথ। এ পথের যানবাহন এখন আর অপ্রতুল নেই। উখিমঠের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন যথেষ্ট উন্নতমানের। এ পথে সর্বদাই জীপ, ট্যাক্সি, টাটাসুমো ও বাস মেলে।

পঞ্চকেদার যাত্রীদের উখিমঠ হয়েই মদমহেশ্বরনাথ ও তুঙ্গনাথ দর্শন করা সুবিধা। মদমহেশ্বরের পথ এখন অনেক সংক্ষিপ্ত। জুরানি থেকে কালীমঠ হয়ে ৩৩ কিমি পথ আর ট্রেকিং করতে হয় না। উখিমঠ থেকে জীপ রাস্তা এগিয়ে গেছে উনিয়ানা পর্যন্ত। উনিয়ানা থেকে রাঁশু, গৌণ্ডার, বানতৌলী, নানু হয়ে মদমহেশ্বর। এ পথের মোট দূরত্ব ১৭ কিমি।

উখিমঠের প্রধান আকর্ষণ ওঁঙ্কারেশ্বর মন্দির। উষা ও অনিরুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মন্দির, পঞ্চকেদারের শিলামূর্তি, ভৈরব নাথজী ও ভোলেশ্বর মহাদেব।

কেদারনাথজী এবং মদমহেশ্বরনাথজীর শীতকালীন আবাসন উখিমঠ। উখিমঠ মন্দিরে দোতলায় একটি ঘর। কেদারনাথজীর স্থায়ী গদি। কেদারনাথের পূজারী কর্ণাটকীয় ব্রাহ্মণ ১০০৮ জগত গুরু শিবাচারী রাওলজী এখানেই বসেন। এই গদিকে কেদারনাথের গদি বলা হয়। কেদারনাথের প্রধান পুরোহিতকে বলা হয় রাওয়ালজী।

প্রতি বছর কেদারনাথের ডোলিযাত্রার ১৮-২০ দিন পর মদমহেশ্বরের ডুলিযাত্রার অনুষ্ঠান হয়।

মদমহেশ্বরের ডুলিযাত্রা অধিক সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ডুলির নীচের দিকে দুটি কাঠের বড় হাতল লাগান থাকে। বাহকেরা কাঁধে করে নিয়ে যায়। বাজনদারেরা সানাই, ঢোল, ঘন্টা এবং শাঁখ নিয়ে প্রস্তুত থাকে। দুই কর্মচারী দুটি রূপার বড় ত্রিশূল ধরেন।

ত্রিশূলের মাথায় হলুদ রঙের ধ্বজা লাগান থাকে। কেবল কর্মচারীর হাতে রূপার রাজদণ্ড।

ভক্তগণ চন্দন, বিল্বপত্র, তিলকে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে, বাজনা বেজে ওঠে। সকলের চোখেই জল দেখা যায়। অতি প্রিয়জন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

ডুলি মাঝে মাঝে ভক্তের সামনে নুয়ে পড়ে, এতে বাহকদের কোনই হাত থাকে না। সারা পথেই ভক্তপ্রাণ মানুষেরা খাদা (চাদর), মালা, ফুল, টাকা ইত্যাদি দিয়ে ডুলিকে প্রণাম ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

উখিমঠের পৌরাণিক কাহিনী অতীব চমকপ্রদ। আমার পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য সেই কাহিনীর কিছু অংশ পরিবেশন করা প্রয়োজন মনে করি।

কাহিনীর প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ এবং প্রধান নায়িকা বাণাসুরের কন্যা ঊষা। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক। বাণাসুর মহাপরাক্রমশালী বীর, শঙ্কর ভগবানের স্নেহ ধন্য, দুই বিপরীতমুখী মহাশক্তির ধারার মহামিলন হয়। তাই উখিমঠের গুরুত্ব সমধিক।

পূর্বেই বলেছি কেদারনাথজীর শীতকালীন আবাসন উখিমঠ। কেদারনাথজী ও মদমহেশ্বরনাথজীর স্থায়ী গদি উখিমঠ। একই আঙ্গিনায় ওঁকারেশ্বর মহাদেব, পঞ্চকেদারের শিলামূর্তি, ভৈরবনাথজী, মান্ধাতা, ঊষা অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা ইত্যাদি দেবতা ও দেবমূর্তি দেখা যায়।

উখিমঠের জলবায়ু অতি চমৎকার। উখিমঠে চিরবসন্ত বিরাজমান। হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভার সন্দর্শনে আনন্দ ও তৃপ্তিতে মন ভরে যায়। কেদারনাথজী ও বদ্রীনাথজীর সংযোগকারী প্রাচীন পায়দল মার্গ আজিও উখিমঠের বুকে স্পষ্ট হয়ে আছে। হিমালয় মহাত্মার পদ স্পর্শে উখিমঠ চিরধন্য চির পবিত্র। হিমালয়-প্রিয় পর্যটক, তীর্থযাত্রী কিংবা ভ্রমণ পিপাসু মানুষের নিকট

উখিমঠের অবদানের কোন তুলনা নেই। পঞ্চকেদার, পঞ্চবদ্রী কোটিমায়েশ্বরী, রুচ্‌মহাদেব, কালীমঠ, কালশিলা, বিশ্বনাথ (গুপ্তকাশী), নারায়ণকুঠী, দেউরিয়াতাল, মাতা অনসূয়া, অমৃতকুণ্ড, (অত্রিমুনি) প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শনের জন্য উখিমঠে আসন পাতাই অধিক সুবিধাজনক।

বাঙালীর পরম প্রিয় ও অন্ধকারের দিশারী ভারত সেবাশ্রম সংঘ। উখিমঠের পর্যটকদের সেবায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ যাত্রী নিবাসের কোন ত্রুটি নেই। অপূর্ব ব্যবস্থা, দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। থাকা, খাওয়া, ভজন, কীর্তন, নির্জন বাস ইত্যাদি বিষয়ে কোন অভাব নেই। বাড়তি পাওনা সুধীর মহারাজের মিষ্টি হাসি, আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ, পথক্লান্ত পর্যটকের মুখেও হাসি ফুটিয়ে তোলে।

তিনটি রাস্তার সংযোগস্থলে যাত্রী নিবাসের অবস্থিতি। যাত্রী নিবাসের দ্বারে বসেই বাস, ট্যাক্সি ও জীপ মেলে। দুইটি জেলা শহর রুদ্রপ্রয়াগ ও গোপেশ্বর থেকে কাজ মিটিয়ে দিনান্তে ঘরে ফেরা যায়।

এহেন উখিমঠের কথা কার না জানতে ইচ্ছা হয়? কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নর মাতা রুক্মিণী, মাতুল রুক্মি। শ্রীকৃষ্ণের সাথে রুক্মির আদৌ বনিবনা ছিল না। রুক্মির কন্যা রুক্মাবতী পরমা সুন্দরী। রুক্মাবতী ও প্রদ্যুম্ন উভয়েই যৌবনের কোঠায় পদার্পণ করে। উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্নেহান্ধরুক্মিণী পুত্রের ইচ্ছাপূরণে রুক্মাবতীর সাথে বিবাহ দেন। যথা সময়ে রুক্মাবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। বাবা মা আদর করে নাম রাখেন অনিরুদ্ধ।

ধীরে ধীরে অনিরুদ্ধ বড় হয়। সে ছিল অতীব সৌন্দর্যের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ, পুত্র ও পৌত্র সহ মহানন্দে শান্তিতে দ্বারকায় বাস করেন। অপরদিকে শোনিতপুরের রাজকন্যা ঊষা একদিন স্বপ্নে অপরিচিত অনিরুদ্ধের সাথে রতিলাভ করেন। স্বপ্নের ঘোরে অনিরুদ্ধকে না পেয়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। — "হে প্রাণকান্ত তুমি কোথায় গেলে?

চিৎকার শুনে সখি চিত্রলেখা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেন " তুমি অবিবাহিত, কাকে প্রাণকান্ত বলে সম্মোধন করলে?" ঊষা আবার বলেন — আমি যাকে

দেখেছি তাকে না পেলে আমার জীবন বৃথা যাবে। উষা স্বপ্নের প্রতিটি কথাই বর্ণনা করেন। চিত্রলেখা ছবির মাধ্যমে তার 'বর' চিনে নিতে বলেন। চিত্রলেখা একের পর এক দেবতা, গন্ধর্ব, ও মানুষের ছবি এঁকে উষাকে দেখায়। অবশেষে অনিরুদ্ধের ছবি দেখে উষা আনন্দে উল্লাসিত হন। চিৎকার করে বলে, সে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রাণনাথকে পেয়েছে। চিত্রলেখা যোগবলে অনিরুদ্ধের অবস্থান জানতে পারেন। তিনি তাঁর যোগ বিভূতি বলে অনিরুদ্ধকে দ্বারকা থেকে অপহরণ করেন। অনিরুদ্ধকে এনে চিত্রলেখা ওঁর প্রিয় সখির হাতে অর্পণ করেন। উষা অনিরুদ্ধকে নিজের ঘরে প্রচ্ছন্নভাবে রেখে পরম আনন্দে দিন কাটাতে থাকেন।

অল্পকাল পরে উষার গর্ভধারণের লক্ষণ দেখে রক্ষিগণ ভয়ে রাজাকে সকল ঘটনা জানিয়ে দেন। রাজা অন্তঃপুরে এসে অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বেঁধে রাখেন। উষা শোকে দুঃখে দিন কাটাতে থাকেন।

এদিকে অনিরুদ্ধের অপহরণের খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দ্বারকা থেকে শোনিতপুরে চলে আসেন। শুরু হয় প্রবল যুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের সাথে মহাদেব, কার্তিকের সাথে প্রদ্যুম্ন, বাণাসুরের সাথে সাত্যকি, বলরামের সাথে মন্ত্রীদের যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে বাণাসুরের সকল সৈন্য-সামন্ত একে একে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। মহাদেব রেগে গিয়ে রুদ্রজ্বরের সৃষ্টি করেন। শ্রীকৃষ্ণও বিষ্ণুজ্বরের সৃষ্টি করে রুদ্রজ্বরের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেন। রুদ্রজ্বর পরাজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে শুরু করেন।

বাণাসুর তখন সাত্যকিকে ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের রথ ও ময়ূরধ্বজ কেতু ভেঙে দেন। বাণাসুর ছিল সহস্র বাহু। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের সাহায্যে চারটি বাহু রেখে অন্য সকল বাহু ছেদন করেন।

বাণাসুরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন—

"হে কৃষ্ণ! বাণাসুর আমার একান্ত অনুগত সেবক, আমি তাঁকে অভয় দান করেছি, অতএব আপনি বাণকে সংহার করবেন না"।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন — " আপনি যেমন বলেছেন তেমনই হবে। প্রহ্লাদকে আমি বর দিয়েছিলাম যে তাঁর বংশধরকে আমি কখনই বিনষ্ট করব না। এই

বলিনন্দন আমার বধ্য নয়। একমাত্র তার দর্পনাশের জন্য আমি তার চার হাত রেখে অন্য সকল ছেদন করেছি। আজ হতে বাণ চার হাত নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করবে"।

যুদ্ধ শেষ হয়। বাণাসুর অনিরুদ্ধের সাথে ঊষার বিবাহ দেন। তিনি স্বয়ং নবদম্পতিকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিয়ে এলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের অনুমতি নিয়ে অনিরুদ্ধ ও ঊষাকে রথে উঠিয়ে দ্বারকায় গমন করেন। বাণাসুর তার প্রিয় কন্যার স্মৃতিতে শোনিতপুরের নাম বদল করে " ঊষামঠ" রাখেন। পরবর্তীকালে ঊষামঠ থেকে উখিমঠ। ইতিহাসের পাতায় উখিমঠের সেই প্রাচীন কাহিনী আজিও স্পষ্ট হয়ে আছে। উখিমঠের মন্দির এখন অতীতের সাক্ষী। বাবা কেদারনাথের শীতকালীন আবাসন।

ভোলেশ্বর মহাদেব

'ওঁ নমঃ শিবায়', শিবজী সত্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতীক, ধর্মের প্রতীক, শিবজী প্রেমময়, প্রেমের প্রতীক, ত্যাগের প্রতীক। সকল চাওয়া পাওয়া, মান অভিমানের ঊর্ধ্বে।

শীত ও উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে এবং মান ও অপমানে তিনি অবিচলিত। তিনি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, সাধকের পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান। কোন কিছুই তিনি মনে রাখেন না। ডাকলেই তিনি সাড়া দেন! তিনি ভোলেশ্বর। সকল দেবতার তিনি "ইষ্ট" তাই তিনি ভোলেশ্বর। তিনি সর্বকালের, সর্বযুগের। মানুষের কাল্পনিক দৃষ্টিতে তিনি মহামানব। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মস্তকে বিষধর সর্প, পরনে বাঘছাল, একহাতে ত্রিশূল, অন্যহাতে কমণ্ডুলু।

এ সবই কাল্পনিক মূর্তি। হিমালয়ের আনাচে কানাচে তাঁর গতি-বিধি। তাঁর কৃপা হলে সাধারণ মানুষও তাঁর দর্শন লাভ করে। হিমালয় মন্থনে বেরিয়ে মনের মণিকোঠায় তাঁর কৃপা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি।

উখিমঠের অন্যতম আকর্ষণ ভোলেশ্বর এই মহাদেব। পাহাড়ের মাথায় একান্ত পরিবেশে বাবা ভোলেশ্বরের অবস্থান। শ্যামায়মান প্রকৃতির কোলে পাহাড় ঘেরা পরিবেশ। দূরে বদ্রীনাথজীর প্রাচীন পায়ে চলা পথ দেখা যায়।

উখিমঠে এসেছি বহুবার। ভোলেশ্বর মহাদেবের কথা কোনদিন শুনিনি। পূর্বেই বলেছি সময় না হলে হয় না। আমি উখিমঠে এসে ভারত সেবাশ্রম সংঘের যাত্রীনিবাসে-ই আশ্রয় নিই।

এবছর অর্থাৎ ১লা মে ২০০৩, বাবা কেদারনাথের ডোলিযাত্রা উপলক্ষ্যে উখিমঠ যাত্রী নিবাসে উঠেছি। আশ্রমের আবাসিক শ্রদ্ধেয় হৃদয়বান সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রথম আলাপেই বাবা ভোলেশ্বর মহাদেবের কথা বলেন। তাঁর কথায় তেমন গুরুত্ব দিই না।

সুপ্রভাত বাবু হিমালয় প্রেমী। নিজে হিমালয়কে ভালবাসেন। অপরকে হিমালয়ের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়ে ও হিমালয়ের কথা বলে অধিক আনন্দ পান। অবসর জীবনে হিমালয়ের আকর্ষণে ধর্মপত্নীকে সাথে নিয়ে উখিমঠের

নির্জন কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্রমের সেবা, যাত্রীসাধারণের সেবা, ভোলেশ্বর মহাদেবের প্রেমময় সান্নিধ্য প্রভৃতি নির্মল আনন্দে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। এহেন উদার ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ ভোলেশ্বর মহাদেবের কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়।

যাঁর কৃপায় সুপ্রভাত বাবুকে পেয়েছি, তিনিই টেনে নেন তাঁর আঙ্গিনায়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনে পিচ্ ঢালা রাস্তা। চোপতার দিকে কয়েক পা এগিয়ে বাঁ হাতে পায়ে চলা পথ গিয়েছে পাহাড়ের মাথায়। সুপ্রভাত বাবু সামনে আমি পিছনে। সামান্য দূরত্ব, অপূর্ব পরিবেশ। সামান্য পথ অতিক্রম করে এক প্রাচীন মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। কতদিনের প্রাচীন তার কোন সন্ধান পাই না।

গর্ভমন্দিরে শঙ্কর ভগবানের শিলামূর্তি। সম্মুখে ছোট নাট মন্দির। মন্দিরে অখণ্ড জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত। পাশেই পূজারীর ঘর ও ধর্মশালা। পূজারীর ঘরে অখণ্ড ধুনি। পূজারী মহাবীর সিং খুবই সজ্জন ব্যক্তি, কথায় ও আচরণে প্রেমভাব প্রকাশিত।

মন্দির আঙ্গিনায় সান বাঁধানো উঠান। উঠানে দাঁড়িয়ে উখিমঠকে ছবির মতো দেখায়। ঐ যে দূরে মন্দাকিনীর বুকে লোহার সেতু দেখতে পাই। চারিদিকে সবুজ ক্ষেতে গাড়োয়ালী রমণী ও কিশোরীর কর্মব্যস্ততা দেখে অবাক হই। যে দিকে তাকাই পাহাড়ের চূড়াগুলি এক একটি ধ্যান মৌন ঋষির ন্যায় প্রতিভাত হয়। সুপ্রভাত বাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই।

ভোলেশ্বর মহাদেবের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে হিমালয়ের যে রূপ দেখেছি তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ হয় না। গুপ্তকাশী, কুঁদ, উখিমঠ, বাণসু ইত্যাদি জনপদগুলিকে ছবির মত দেখায়।

কালীমঠ

সৃষ্টির আদি পর্ব থেকেই শুরু হয় অন্যায়ের সাথে ন্যায়ের বিবাদ। দেবতার সাথে দানবের যুদ্ধ। অধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই। যাহা সত্য, যাহা স্নেহময়, যাহা কল্যাণমুখী তাহাই ধর্ম। এসবের বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী সকল বস্তুই অধর্মের প্রতীক। ধর্মের যিনি ধারক, সত্যের যিনি বাহক, বিশ্ব সংসারকে যিনি মাতৃ স্নেহে পালন করেন তিনিই জগদ্ধাত্রী মহামায়া, পরমেশ্বরী। মা মহাশক্তির আধার সর্ব দুঃখহারিণী। সর্বমুক্তি প্রদায়িণী। সৃষ্টি রক্ষার্থে মা যুগে যুগে আর্বিভূতা হন নানা ছন্দে, নানা রূপে।

দেবতাগণ আত্মরক্ষার্থে যুগে যুগে দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবীর স্তব পাঠ করেন।

দেবী! প্রপন্নার্ত্তি হরে! প্রসীদ-প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরেরি! পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী! চরাচরস্য।। ১১।৩
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে!।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে।।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি!।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি! নমোঽস্তু তে।। ১১।১১

পুরাণে বর্ণিত আছে প্রাচীনকালে অসুরদের অত্যাচারে দেবতাগণ পাতালে প্রবেশ করেন। অসহায় দেবতাগণ দেবীর কৃপা প্রার্থনা করেন। দেবী অসুর বধের জন্য "মহাকালী" নামে এক বিশেষ শক্তি নিয়ে "কালীমঠে" প্রকট হন। কালীমঠ অঞ্চলে মহাকালী পার্বতী কৌষিকী, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করেন। অসুর বধের পর দেবী প্রস্তর রূপ নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে পাতালে প্রবেশ করেন। সেই অনাদিকাল থেকে কালীমঠ সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত।

কুড়ি বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে মদমহেশ্বরের পথে প্রথম কালীমঠে যাই। সেদিনের কালীমঠ আর এখনকার কালীমঠ তফাৎ অনেক। সেদিন

গুপ্তকাশীতেএসে গৌরীকুণ্ডগামী বাসে চেপে 'জুরানী' এসে নামি। কালীগঙ্গার বুকে কাঠের পুল পেরিয়ে সুগভীর অরণ্য শোভিত পথে ৪ কি.মি. ট্রেক করে কালীমঠ পৌঁছাই। মঠাধীশ নারায়ণ সিং রানা এবং পূজারী রমেশ চন্দ্র ভট সহাস্যে এগিয়ে এসে স্বাগত জানান। মঠাধীশের সহযোগিতায় মন্দির কমিটির ধর্মশালার ঘরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়। পাশেই মুকুন্দ সিংজীর চায়ের দোকান। মুকুন্দর ঘরে রাতে আহারের ব্যবস্থা হয়। মঠাধীশ ও পূজারীকে সাথে নিয়ে রাতের আহার সারি। মঠাধীশের সেদিনের প্রীতিময় সাহচর্য হৃদয়পটে আজিও অম্লান হয়ে আছে। মঠাধীশ নারায়ণ সিং রানা এখন ৮২ বছরের বৃদ্ধ। রমেশ চন্দ্র ভট এখন তিন সন্তানের জনক। দীর্ঘদিন পর মন্দির আঙ্গিনায় পরস্পরের সাক্ষাতে পরস্পরে অভিভূত হয়ে যাই।

এখন কালীমঠ যেতে আর ট্রেকিং করতে হয় না। গুপ্তকাশী থেকে জীপে আধ ঘন্টায় (১০ কি.মি.) কালীমঠ মন্দিরে পৌঁছানো যায়। গুপ্তকাশী থেকে কালীমঠ পর্য্যন্ত পিচ ঢালা রাজপথ। সর্বদাই জীপ মেলে এ পথে। ভাড়া ১০ টাকা। রাজপথ এগিয়ে গেছে কোটমা পর্যন্ত। কালীমঠ বাস স্ট্যাণ্ড থেকে সামান্য এগিয়ে বাঁ হাতে সরস্বতী গঙ্গার বুকে লোহার সেতু। সেতু পেরিয়ে "মহাকালীর" মন্দির এলাকা।

মন্দির এলাকায় প্রবেশ করে কিছুটা অবাক হয়ে যাই। সমগ্র আঙ্গিনা সান বাঁধানো। উঠানের এক প্রান্তে বাঁহাতে পরপর দোকান। প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত কালীমঠ মন্দিরের কোন পরিবর্তন হয় নি। কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী শ্রী সতপালজী ও খাণ্ডুরিজীর প্রচেষ্টায় কালীমঠ মন্দির সংলগ্ন দ্বিতল দুটি আধুনিক মানের ধর্মশালা নির্মিত হয়েছে।

মঠাধীশ নারায়ণ সিং রানা ও পূজারী রমেশ ভটকে দেখে মনে খুবই আনন্দ হয়। সেদিন আমাদের থাকার জন্য কাঠের সুসজ্জিত যে ধর্মশালাটি খুলে দিয়েছিলেন এখন তার কোন চিহ্ন নেই। রানাজীর সেই মিষ্টি হাসি ও আন্তরিক আপ্যায়নের কোনই পরিবর্তন হয় নি। বয়সের ভারে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সময়ের স্বল্পতার মধ্যেও রানাজী আমাকে চা খাওয়াতে ভোলেন নি।

রাণাজী গৃহী সাধক। হিমালয়ের মানুষ। তাঁর বিরাটত্বের মূল্যায়ন করা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। তাঁর সুস্থ, নীরোগ, দীর্ঘায়ু কামনা করি।

রমেশ ভট্ স্মৃতি চারণ করে আমার নাম উদ্ধার করেন। তাঁর চেহারার পরিবর্তন হলেও মনের পরিবর্তন হয় নি। তিনি এখন পূজারী। স্ত্রী, পুত্র ও দুই কন্যা সহ বর্ত্তমান সংসার। কালীমঠ থেকে তিন কিমি দূরে "কপিলঠা" নামক গ্রামে নূতন গৃহ নির্মাণ করেছেন। তিনি এখন শাস্ত্রজ্ঞ, "বেদপাঠী"। সিদ্ধপীঠ কালীমঠ গ্রন্থখানি রচনা করে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর প্রীতি ও প্রেম আমাদের জীবনে অম্লান হয়ে থাকবে।

বর্তমান পাহাড়ে পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। পূর্বে যেখানে ট্রেকিং করে যেতে হত এখন সেখানে গাড়ি চলে যাচ্ছে। পূর্বেই বলেছি কালীমঠের পথ এখন আর দুর্গম নয়। পিচ্ ঢালা রাস্তা হয়েছে কালীমঠ পর্যন্ত। সে পথে সর্বদাই জীপ চলে। উখিমঠ কিম্বা গুপ্তকাশী থেকে যাত্রা করে কালীমঠ বেড়িয়ে দিনে দিনে ফিরে আসা যায়। অথবা কালীমঠের আধ্যাত্ম পরিবেশে নব নির্মিত ধর্মশালার ঘরে একদিন রাত কাটাতে ভালই লাগবে।

হিমালয়ের পথে হিমালয়ের বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায়। হঠাৎই দুই বাঙালী পর্যটক এসে হাজির। মৃণাল গুপ্ত ও মোহন লাল মণ্ডল। হিমালয়ের পথে এই দুই পর্যটকের সাথে দেখা হয়েছে কয়েকবার। এ সবই হিমালয়ের দান বলে মেনে নিই।

কালীমঠ এখন আধুনিকা। তবুও কালীমঠের প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনও মানুষকে মুগ্ধ করে। অহর্নিশ সরস্বতী গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি, জাগ্রত কালী মন্দিরে পূজারীর নৃত্যের তালে আরতি মনকে উদাস করে। সরস্বতী গঙ্গার তীরে গৌরীশঙ্কর যুগল মূর্তি, সিদ্ধেশ্বর মহাদেব, মা লক্ষ্মীর মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ খুবই সুন্দর। নাট মন্দিরে ত্রিযুগীর মতো হোমাগ্নি সর্বক্ষণ প্রজ্বলিত। সান বাঁধানো ঘাট। কালীমঠের পরিবেশ মনকে আকর্ষণ করে। নব নির্মিত বাস স্টেশন রেস্তোরাঁ, হোটেল ও দোকান আছে।

প্রতিবছর মহাষ্টমী তিথিতে কালীমঠে নবরাত্রি উৎসব পালিত হয়।

কালীমঠে নবরাত্রি উৎসব স্থানীয় মানুষের বড়ই প্রিয়। সারারাত ধরে উৎসব চলে। পাহাড়ী মানুষেরা নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে পূজার ডালি সাজিয়ে কালীমঠে আসে। গভীর রাতে মন্দির আঙিনা নিষ্প্রদীপ করা হয়। প্রধান পূজারী দেবীর আসনের নীচ থেকে সারা বছরের জমা ফুল- বেলপাতা ও স্নান বারি পরিষ্কার করেন। ভক্তপ্রাণ পাহাড়ী মানুষ প্রসাদী ফুল-জল সংগ্রহ করে। ঐ মূল্যবান বস্তু সমূহ তাদের সারা বছরের মহৌষধ।

পাকা রাস্তা নির্মিত হওয়ায় কালীমঠের জনপ্রিয়তা বেড়েছে অনেক। কালীমঠে দর্শনার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিচিতি ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। উচ্চতা -১৩১১ মিঃ। নিকটতম শহর-গুপ্তকাশী এবং উখিমঠ। জলবায়ু অতীব মনোরম। নাতিশীতোষ্ণ।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে গৌরীকুণ্ডগামী বাস অথবা জীপে গুপ্তকাশী এসে নামুন। গুপ্তকাশী থেকে জীপে কালীমঠ, ভাড়া মাথা পিছু ১০ টাকা।

কোথায় থাকবেন ঃ রাত্রিবাসের পক্ষে গুপ্তকাশী অতি উত্তম। Hotel Punjab Sindh এবং Hotel Front House-র ব্যবস্থা উন্নত মানের।

কখন যাবেন ঃ মায়ের আঙ্গিনায় সন্তানের যেতে সময়ের কোন বাধা নেই। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর আদর্শ সময়।

কোটিমায়েশ্বরী

গত ১০ই মে শনিবার, ২০০৩। গুপ্তকাশী থেকে কালীমঠ হয়ে পরম - পিতা শঙ্কর ভগবান ও মাতা পরমেশ্বরীর প্রাচীন আঙ্গিনা কোটিমায়েশ্বরী ও রুচ্ মহাদেবের দর্শনে যাই।

পায়ে চলার পথ খুবই সামান্য, জীপ রাস্তা থেকে মাত্র এক কিমি। তবুও সে পথের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও সজীবতা কিশোরী কন্যার চঞ্চলতাকেও হার মানায়।

গুপ্তকাশী থেকে কালীমঠ, কোটমা হয়ে পথ গিয়েছে খুন্নু। খুন্নু থেকে ডানহাতি হাঁটা পথে কোটিমায়েশ্বরী। সোজাপথে জালতল্লা, জালমাল্লা, চৌমাসি, দেউলী, ছিপি, খাডোরা, ধনেজু, বহুজাতীয়া হয়ে কেদারনাথ। এটাই কেদারনাথের প্রাচীন পথ। পাণ্ডবগণ এ পথেই কেদারনাথ যাত্রা করেন।

গুপ্তকাশী থেকে কালীগঙ্গা গিরিপথ (৪৩২০মি) অতিক্রম করে কেদারনাথ। পাহাড় পাগল পর্যটকের নিকট এ পথটি এখনও অনাস্বাদিত। গুপ্তকাশী থেকে অরণ্যশোভিত পথে জীপ ছোটে। পথের সাথে সরস্বতী গঙ্গার মিষ্টি গর্জন মনকে মাতাল করে। পরপারে উখিমঠকে ছবির মত দেখায়। ভাবনার কোন অবকাশ নেই। চোখের নিমেষে ১০ কিমি দৌড়ে জীপ এসে কালীমঠে দাঁড়ায়। জীপে বসেই কালীমঠকে প্রণাম করি, সামান্য বিরতি, স্থানীয় মানুষের ওঠানামা শেষে জীপ আবার চলতে থাকে। পিচ ঢালা পথে ৫ কিমি গিয়ে এক সুপ্রশস্ত ময়দানে জীপ দাঁড়ায়। বাঁ-হাতে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাকা বাড়ি। ডানহাতে দোকান বাজার ও রেস্তোরাঁ। সুন্দর পাহাড়ি জনপদ কোটমা। কোটিমায়ের নামানুসারে গ্রামের নামকরণ। এখানে এসেও মায়ের দেখা নেই, মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই। কোটিমায়ের নাম নিতেই স্থানীয় মানুষ হাত তুলে প্রণাম করে।

কোটমা বেশ বড় গ্রাম। গ্রামে স্কুল, কলেজ, পোষ্ট-অফিস আছে। কোটমা থেকে ১ কিমি গিয়ে এক লালার দোকানের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। এখান

থেকে এক কিমি হাঁটা পথে মায়ের মন্দির। জীপ থেকে নেমেই মায়ের আকর্ষণ অনুভব করি। ডান হাতে উৎরাই পথে সুগভীর অরণ্য। অরণ্য শোভিত অনাড়ম্বর পরিবেশে মায়ের অনতিউচ্চ মন্দির দৃষ্টি কেড়ে নেয়। লালাজী সহাস্যে এগিয়ে এসে স্বাগত জানায়। লালাজীর মিষ্টি ব্যবহারে আন্তরিকতা মিশ্রিত। উনিই কোটিমায়েশ্বরীর পথ দেখিয়ে দেন।

জীপ থেকে যেখানে নেমেছি সেখানে কোন বসতি নজরে পড়ে না। রাস্তা থেকে বেশ উপরে গ্রাম্য মানুষের বাস। গ্রামের নাম খুন্নু। কোটিমায়ের মন্দিরের সেবায়েত ও পূজারিগণ ঐ গ্রামেই বাস করেন। জীপ-স্টেশন থেকে সামান্য এগিয়ে বাঁহাতে জলের ধারা। ডানহাতে উৎরাই পথে ১ কিমি গিয়ে মায়ের মন্দির। পথ যদিও সামান্য তবুও সে পথের সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। শুরু থেকেই মায়ের মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, সঙ্গে দুই নদীর গর্জন। পথ মাঝে মাঝেই বাঁক নেয়, সে সময় মন্দির দৃষ্টির আড়াল হয়। সারা পথই বোল্ডারে বোল্ডারে অলংকৃত। নীচের দিকে কিছুটা মাটির পথ।

আধ কিমি চলার পর ডানহাতে কয়েক ধাপ নীচে সুপ্রশস্ত সমতল প্রান্তর। প্রকৃতি তার নিখুঁত হাতে সেই প্রান্তরে সবুজ গালিচা পেতে রেখেছে। প্রতিদিন অপরাহ্ন বেলায় গ্রামের কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা ঐ প্রান্তরে আসর জমায়। কেউবা আসে গরুর সাথে উলের কাঁটা নিয়ে, আবার কেউবা আসে ঘাসের ঝুড়ি পিঠে নিয়ে, গুন-গুনিয়ে গান শোনাতে। এক সময় আপনিও পৌঁছে যাবেন সেই গালিচা পাতা অঙ্গনে। ওদের সাথে একাত্ম হয়ে নিজেকে ধন্য মনে হবে। পাশেই পানিচাক্কি। গ্রামের মহিলারা আসে দূর থেকে, সঙ্গে কাপড়ে বাঁধা গম। গ্রামে ঐ একটাই পানিচাক্কি। বিকালের আসরটা ওদের ভালই জমে। গোধূলির আলোয় ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে ওরা দল বেঁধে বাড়ি ফেরে। সারাদিনের পরিশ্রমের পরও ওদের মুখে হাসি, ওদের বসন এলোমেলো, ঘর্মাক্ত বদন, রূপের হাটে স্বর্গের অপ্সরাও হার মানে।

গুপ্তগঙ্গা, মধুগঙ্গা ও সরস্বতী গঙ্গার ত্রিবেণী সঙ্গমে বাবা মায়ের প্রাচীন আবাস ভূমি। এ এক অপূর্ব সন্নিবেশ, অপূর্ব পরিবেশ। চতুর্দিকে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, ঠিক যেন ধ্যান মৌন ঋষিগণ পিতৃ ও মাতৃ আরাধনায় মগ্ন। পর্বতগাত্রে অসংখ্য

বনজ-সম্পদ। প্রকৃতির সবুজ অঙ্গে অপূর্ব পুষ্প বিন্যাস, প্রস্ফুটিত পুষ্পকানন, ব্রাঁস, বুরাস, ওক্, রডডেনড্রন, আখরোট, মাল্টা, তিমিলা ইত্যাদি অসংখ্য বৃক্ষ মাতৃ বন্দনায় অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান। প্রকৃতির সুগভীর নির্জনতায় সঙ্গমের তরঙ্গায়িত সুমধুর ধ্বনি অন্তরে এক অব্যক্ত অনুভূতির সঞ্চার করে।

পূজারী বাচ্চিরাম, রাধাকৃষণ, মিত্রানন্দ, ধর্মানন্দের পুষ্প চয়ন, আড়ম্বরহীন দেবার্চনা, মন্দিরের চতুর্দিকে অসংখ্য প্রস্তরময় শিল্যমূর্তিতে জল সিঞ্চন, রন্ধনশালায় অতি নিম্নমানের ভোগ প্রস্তুত ইত্যাদি কোটি মায়ের সংসারে সারাদিনের নির্ঘন্ট।

কোটি মায়ের সংসারে নিত্য পূজারীর সংখ্যা আট। আট পরিবার থেকে আটজন পূজারী। পূজারিগণ সকলেই নিকটস্থ গ্রামের বাসিন্দা। সকলেই নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজ্ঞ ও দশকর্ম বিদ্যায় পারদর্শী। পূজা, যাগ-যজ্ঞ পিণ্ডদান ইত্যাদি তাঁদের প্রধান উপজীবিকা। পূজারিগণ নিজেদের মধ্যে পূজার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন।

প্রতিজনের প্রতি মাসে ৫দিন করে পূজার দায়িত্ব। আট পরিবারের ৮ জন পূজারীর নাম। —

- বাচ্চিরাম ভট্
- রাধাকৃষণ ভট্
- কৃষ্ণানন্দ ভট্
- গয়াদত্ ভট্
- মিত্রানন্দ ভট্
- ধর্মানন্দ ভট্
- চন্দ্রবল্লভ ভট্
- সচ্চিদানন্দ ভট্

ভারপ্রাপ্ত পূজারী প্রতিদিন সকালে এক কি.মি. পায়ে হেঁটে মন্দিরে আসেন। সারাদিন পূজাপাঠ ও ভোগারতি শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

সঙ্গমে সরস্বতীর বুকে মহাদেবের সুবৃহৎ শিলামূর্তি। সামান্য উপরে মায়ের মন্দির। রণচণ্ডী মায়ের রণমূর্তি প্রশমিত করার মানসে বাবার আবির্ভাব।

পুরাণে কথিত আছে মা পার্বতী এক দিনে এক কোটি অসুরকে বধ করে

কোটিমায়েশ্বরী নামে খ্যাত হন। মা একদিনে এক কোটি দেবতার তেজ ও শক্তি লাভ করেন, তাই তিনি কোটিমায়েশ্বরী। মা কোটি সংখ্যক ব্রাহ্মণী প্রভৃতি মাতৃকা গণকে নিজের দেহে বিলীন করেন, তাই তিনি কোটিমায়েশ্বরী। চণ্ডমুণ্ড বিনাশের পর মা মহাদেবকে অসুররাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট প্রেরণ করেন তাই তিনি শিব- দূতী।

মহাশক্তি মহামায়া পরম পিতা পরমেশ্বরের আরাধ্যা, তাই তিনি পরমেশ্বরী নামে ভূষিতা। দেবী পরমেশ্বরী ন্যায়ের প্রতীক, সত্যের প্রতীক, ধর্মের প্রতীক, স্নেহময়ী জগন্মাতা।

মা অন্যায়ের বিভীষিকা, অসুর নাশিনী, মা মহিষাসুরমর্দিনী, মা চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী, মা রণচণ্ডিকা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের মানসে মা ১০৮ বার জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে তিনি আবির্ভূতা। গাড়োয়াল হিমালয়ের (বর্তমানে উত্তরাঞ্চল) কোটমা, কালীমঠ, কালশিলা, বাণসু, ধারী ইত্যাদি এলাকায় মহামায়া পার্বতী কৌষিকী, চামুণ্ডা, চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ, ধূম্রলোচন, রক্তবীজ ইত্যাদি অসুরগণকে বধ করেন। পরবর্তীকালে এই সকল স্থান সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাতি লাভ করে।

মহাতেজ ও মহাশক্তির প্রভাবে মা খুবই অশান্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অসুর বধের তীব্র নেশায় মা খুবই অস্থির হয়ে পড়েন। মায়ের এই অশান্ত ভাবকে শঙ্কর ভগবান মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। মা-কে শান্ত করার মানসে নিজে শান্ত, স্নিগ্ধ ও দয়াময় রূপ নিয়ে আপন ইচ্ছায় (রুচিতে) প্রকট হন।

পরমেশ্বরের মায়াময় রূপে মুগ্ধ হয়ে পরমেশ্বরী আপন দেহ থেকে কিছু শক্তি প্রত্যাহার করেন। সেই সকল শক্তি মহাকালী, মহা সরস্বতী ও মহালক্ষ্মী নামে তিন স্থানে প্রকট হন। এই তিন স্থান যথাক্রমে কালীমঠ, কালশিলা ও ধারীমা নামে খ্যাত।

মা পার্বতী, শান্ত, স্নিগ্ধ, স্নেহময়ী জননী। মা করুণাময়ী, মা অনন্ত নামে ভূষিতা। মা কোটিমায়েশ্বরী নাম নিয়ে কন্যারূপী লিঙ্গ মূর্তি ধারণ করেন।

সঙ্গমে রুচ্ মহাদেবের সুবিশাল শিলাময় মূর্তি। গেরুয়া রঙের সুবৃহৎ

শঙ্কর ভগবানের লিঙ্গমূর্তি। চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না।

স্কন্দপুরাণে, কেদারখণ্ডে সিদ্ধপীঠ কালীমঠের অন্তর্গত কোটিমায়েশ্বরী। এই স্থান অর্দ্ধগয়া, গুপ্তগয়া ও উত্তরগয়া নামে প্রসিদ্ধ। পুরাণে কথিত আছে যিনি শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে কোটিমায়েশ্বরী দর্শন ও পূজা করেন তিনি কাশী-গয়া তীর্থ যাত্রার ফল লাভ করেন। অনেক শ্রদ্ধাবান ও জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্গমে তর্পণ ও পিণ্ডদান করতে আসেন। শক্তি হ্রাসের পর মা কোটিমায়েশ্বরী এখানেই স্থায়ীভাবে আসন পাতেন। মা ক্লান্তি হারিণী, অভীষ্ট প্রদায়িনী, সিদ্ধি দাত্রী। প্রতিটি উপলখণ্ড প্রাণময় শুচিশুভ্র। দেবভূমির স্পর্শে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। মা অকৃপণ ভাবে সন্তানকে করুণাধারা বর্ষণ করেন।

কোটিমায়েশ্বরী সাধনার ও উপাসনার উপযুক্ত স্থান। একান্ত ও নির্জন বাসের ক্ষেত্রে এ স্থানের কোন তুলনা নেই। দেবতার শান্ত , স্নিগ্ধ ও অধ্যাত্ম প্রভাবে প্রকৃতিও মায়াময়, প্রেমময় ও ধ্যানময়।

সেদিন জনমানব শূন্য মহা সঙ্গমে একমাত্র পূজারী বাচ্চিরাম ভট ছাড়া অন্য কেউ আমার সঙ্গে ছিলেন না। মায়ের স্নেহ ও বাবার আশীর্বাদ অপরের সাথে ভাগ করে নিতে হয়নি। প্রাকৃতিক পরিবেশ, অধ্যাত্ম পরিমণ্ডল,ও স্থান মাহাত্ম্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। হিমালয়ের সুগভীর অন্তঃপুরে নিবিড় রাজপুরীতে সঙ্গমের গর্জন ছাড়া আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। ক্ষণেকের দর্শন ও সান্নিধ্যে সুগভীর প্রেমজালে বাঁধা পড়ে যাই। অতীতের অনেক স্মৃতি মনের দর্পণে ভেসে ওঠে। পিতৃ ও মাতৃ স্নেহে সাশ্রু নয়নে ইহ জগতের বিদেহী আত্মার প্রতি প্রণাম, তর্পণ, পিণ্ডদান ও অর্ঘ্য নিবেদন করি।

সেদিনের মহাকর্ষণ ও স্নেহের বাঁধনে পুনরায় রাজপুরীতে ফিরে আসি। এ সত্যিই রাজপুরী। এখানে এলে মনের সকল দুর্বলতা বিলীন হয়ে যায়। এতো রাজ রাজেশ্বরী পরমেশ্বরের আঙ্গিনা। এখানে সবকিছুই পূর্ণ। এখানে দীনতা ও ক্ষুদ্রতার কোন স্থান নেই। রাজার ঘরে রাজার ছেলেই আসে।

পরমারাধ্য গুরুজী শ্রীশ্রী ফলাহারী বাবার আশীর্বাদ ও মন্ত্র সম্বল করে হিমালয় ভ্রমণ করেছি দীর্ঘদিন। দীর্ঘ পরিক্রমা অন্তে আজ রাজবাড়ির দুয়ারে এসে উপস্থিত। গিরিরাজের আঙ্গিনায় প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি জীব, নিষ্ঠাবান ও

সেবাপরায়ণ। সকলেই গিরিরাজের সম্মান রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর। মনের মণিকোঠায় গিরিরাজ শঙ্কর ভগবান ও মাতা পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ দর্শন মেলে কোটিমায়েশ্বরীতে।

সঙ্গমে শঙ্কর ভগবানের শিলাময় সন্ন্যাস মূর্তি, গেরুয়াধারী লিঙ্গমূর্তি। কোন মন্দির নেই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোন ছোঁয়া নেই। প্রকৃতিমায়ের কোলে মধুগঙ্গা ও সরস্বতী গঙ্গার জল সিঞ্চনে বাবা সুখ নিদ্রায় মগ্ন। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে দেবতার শিলামূর্তি মাঝে মাঝেই নিমজ্জিত থাকে। কদাচিৎ মহা সৌভাগ্যবান বাবার দুই একজন সন্তান বাবার স্পর্শ লাভ করেন। প্রকৃতির বুকে রহস্যময় শঙ্কর ভগবানের (রুচ্) এহেন শিলাময় মূর্তি চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

প্রকৃতি মায়ের সাধন পীঠে পুরুষের কোন স্থান নেই। কোটিমায়েশ্বরীতে এলে এ বিভেদ সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। বাবা মায়ের দুই পৃথক আঙ্গিনা। দুই পৃথক প্রবেশ দ্বার। প্রকৃতিরানী উভয়ের কোন ত্রুটি রাখে নি। ভোলা মহেশ্বরের আঙ্গিনায় ধুতুরা পুষ্প ও রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ, মায়ের আঙ্গিনায় গোলাপ ও নানা বর্ণের পুষ্প কানন।

সঙ্গমে শঙ্কর ভগবানের দর্শনের পর মায়ের মন্দিরে আসি। বেলা ১২টা। পূজারী বাচ্চিরাম ভট মাতৃ বন্দনায় ব্যস্ত। মন্দিরের এক কোণে চুপটি করে বসে থাকি। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই।

ইতোমধ্যে মায়ের এক কিশোর ছেলে চা-এনে হাতে দেয়। পরিচয়ে জানতে পারি বাবা মায়ের আদরের নাম 'হরি বিট্রাল', অন্ধ্রের ছেলে। গর্ভধারিণী মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, ঘরের ভোগৈশ্বর্যের বাঁধন কাটিয়ে বিশ্বমায়ের সন্ধানে বেরিয়েছে। এখানে এসে সে তার আরাধ্য মাকে পেয়েছে। আজ সে পূর্ণানন্দ। তার কথায়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে এখানে কেউ আসে না। সে বলে Our entire journy is to crush the ego.

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, উমাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ মনীষিগণ এখানে এসে তৃণ শয্যায় শয়ন করেছেন। তাঁদের সময়ে এখানে কিছুই ছিল না। পথও ছিল খুবই দুর্গম। নদী পারাপারের কোন সেতু ছিল না। পাথর ও গাছের ডালের সাহায্যে স্রোতস্বিনী অতিক্রম করতে হত।

পূর্বে যাতায়াতেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্বামী শিবানন্দের প্রচেষ্টায় দুখানি সেতু, বর্তমান মন্দিরের সংস্কার ও নির্মাণ কাজ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে। মন্দিরে স্বামী শিবানন্দের একটি আলোক চিত্র দেখতে পাই। হরিবিট্টাল দুই একটি কথা বলে চলে যায়।

১৯৭০ সাল। সাধক সন্ন্যাসী স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ হিমালয় পর্যটনে বেরিয়েছেন। উখিমঠ কালীমঠ হয়ে কোটিমায়েশ্বরীর আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত। পথের দুর্গমতা, গুপ্তগঙ্গা ও মধুগঙ্গার ভয়ঙ্কর উত্তাল প্রবাহ অতিক্রম করে তিনি মায়ের দুয়ারে এসে হাজির হন। মাতৃ স্নেহে তিনি আপ্লুত। অধ্যাত্ম প্রেমজালে মুগ্ধ। প্রবীণ সন্ন্যাসী কোটিমায়ের আঙ্গিনায় স্থায়ী আসন পাতেন। দীর্ঘ ১২ বছর তিনি এখানেই কাটান। পথের সংস্কার, মন্দির ও ধর্মশালার পুনর্নির্মাণ এসব তাঁরই অবদান। শ্রীমান যশোরাজ ছাওড়া তদানন্তীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সচিবালয়ের অন্যতম সচিব। তিনি ছিলেন স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্র শিষ্য। গুরুজীর আকর্ষণে তিনিও ঐ সময়ে কোটিমায়েশ্বরী দর্শন করেন।

সাধক কৃষ্ণগিরি মহারাজ ঠিক ঐ সময়ে কোটিমায়েশ্বরী আসেন। শুরু হয় কর্মযজ্ঞ। পর পর দুখানি লোহার সেতু, পথ-ঘাট, জল, বিদ্যুতের আলো, ধর্মশালা এ সবই সেদিনের কীর্তি। কোথাও কোন প্রস্তর ফলক দেখা যায় না। স্বামীজীর মতে — সবই মায়ের কাজ। মা তার ছেলেদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন মাত্র। তাই ব্যক্তিগত নাম লেখার কোন প্রশ্ন আসে না। মন্দির আঙ্গিনায় কোন প্রস্তর ফলক নজরে পড়ে না।

এদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাচ্চিরামের পূজা শেষ হয় না। গর্ভ গৃহে মায়ের কন্যারূপী লিঙ্গ মূর্তি। লিঙ্গ মূর্তির পশ্চাতে তাম্র নির্মিত মা পার্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ইত্যাদি ধ্যানময় মূর্তিসমূহ। পূজারী সকলের কপালে সিঁদুর ও চন্দন পরিয়ে দেন। ত্রিশূলের পাশেই গণেশজী। অকস্মাৎ গণেশ মহারাজের আসন থেকে একটি বিরাট চুঁহা (ইঁদুর) মহারাজ বেরিয়ে মায়ের আসনে প্রবেশ করে। পূজারী সব শেষে গণেশজী ও ত্রিশূল মহারাজের আরতি করেন।

পূজা অন্তে বাচ্চিরাম মায়ের ভোগ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ঘড়িতে দুটো বাজে। তখন পর্যন্ত মধ্যাহ্ন আহারের কথা ভাবিনি। বাচ্চিরাম মায়ের ভোগ

প্রস্তুতের জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করেন।

আমি একাই ঘুরে ঘুরে মহামায়ার ছোট্ট সংসারটা প্রত্যক্ষ করি। গর্ভ মন্দিরে পূজারী ভিন্ন অপরের প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশদ্বারে লৌহ নির্মিত দরজা। মায়ের সম্মুখে অখণ্ড জ্যোতি প্রজ্বলিত। ডান হাতে গণেশজী, পাশেই ত্রিশূল। নাট মন্দিরে দুটি প্রবেশ দ্বার। একটি প্রবেশ দ্বারে ডান হাতে প্রস্তর ফলকে লেখা

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।

শরণ্যে এম্ব্যকে গৌরী নারায়ণি নমহস্তুতে।।

বামহাতে লেখা—

ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশনাং শক্তিভূতে সনাতনি।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

সান বাঁধানো উঠানের এক প্রান্তে দুই কামরার একটি পাকা কুঠিয়া। একটিতে পাকশালা, একটিতে ধর্মশালা। মন্দিরের পশ্চাতে অনেক নাম না জানা দেব দেবীর প্রস্তর নির্মিত মূর্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ। সরস্বতী গঙ্গা ও মধুগঙ্গার অহর্নিশ সঙ্গীতে মুখরিত সঙ্গম, মাঝে মাঝেই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। সজীব বৃক্ষ সমূহ, সবুজ অঙ্গনে শুভ্র পুষ্পরাজি। প্রকৃতির মৌন অভ্যর্থনা দেহ মনের সকল ক্ষুধার অবসান ঘটায়।

পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে গুহা দেখতে পাই। অতীতে ঐ সকল গুহায় মহাত্মাগণ তপস্যা করতেন। ইতোমধ্যে দুই একটি পাখি মন্দির আঙ্গিনায় দেখতে পাই। ওদের প্রাণে কোন ভীতি নেই। আপন মনে আসে আবার আপন মনে চলে যায়।

ওদিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাচ্চিরামের ভোগ নিবেদনের পর্ব শেষ হয়। তিনি আমাকে প্রসাদ নিতে আহ্বান জানান।

দু-জনে বসেছি মধ্যাহ্ন আহারে। বেলা আড়াইটে, প্রসাদ রুটি ও সবজি। তৃপ্তি করে আহার করি। ছেলে মেয়েরা বাপের বাড়ি এলে অভুক্ত থাকে না। কোটিমায়ের প্রসাদ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি।

প্রকৃতি রস ও আধ্যাত্ম রসের সংমিশ্রণ ঘটেছে কোটিমায়েশ্বরীতে। আঙ্গিনায় দু-খানি ধর্মশালা আছে। একটি কোটিমায়ের আঙ্গিনায় অপরটি রুচ্

মহাদেবের দরবারে। এই সব ধর্মশালায় কোন যাত্রী থাকে না। সাধনা, উপাসনা কিম্বা নির্জনবাসের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাঁরা সংসার ছেড়েছেন তাঁরাই এই সব ধর্মশালার ঘরে থাকেন।

কোটিমায়ের আঙ্গিনায় ধর্মশালার একটি ঘরে সৌম্য দর্শন, দীনেশ শাস্ত্রী থাকেন। বর্তমান বয়স ৭২ বছর। দীর্ঘ ১০ বছর আছেন। আহার করেন আলু, শাক, প্যাড়া ও দুধ। সর্বদাই ধ্যান জপে মগ্ন থাকেন। শুদ্ধ জীবন, অবসর প্রাপ্ত সংস্কৃত অধ্যাপক। বয়সের ভারে বৃদ্ধ। মাঝে মাঝে মৌন থাকেন। কোন নেশা নেই। চা-পান করেন না।

রুচ্ মহাদেবের আঙ্গিনায় ধর্মশালাটি দোতলা। নীচের ঘরে থাকেন মহাত্মা নারায়ণগিরি, উপরে থাকেন শীলাগিরি। শীলাগিরি প্রথম জীবনে ছিলেন Engineer, এখন সর্বত্যাগী সাধক। নীচে উপরে মোট চারটি ঘর। কেদারনাথের পাঠ খুললে নারায়ণগিরি কেদারনাথেই থাকেন। দোতলায় একটি ঘরে শীলাগিরি থাকেন, গুজরাট থেকে এসেছেন। অপরটিতে কিশোর ব্রহ্মচারী রণবীরের আস্তানা।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার কিম্বা ঋষিকেশ থেকে বাস, জীপে অথবা ট্যাক্সিতে গুপ্তকাশী। সেখান থেকে জীপ কালীমঠ হয়ে কোটমা। সেখান থেকে ১ কি.মি. হাঁটা পথে কোটিমায়েশ্বরী মায়ের আঙ্গিনা। রাস্তা নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনে জীপ আরও এগিয়ে যাবে। সেদিন সামান্য হাঁটা পথে মায়ের আঙ্গিনায় পৌঁছানো যাবে।

কোন সময়ে যাবেন ঃ বর্ষার পূর্বে অর্থাৎ এপ্রিল, মে, জুন এবং বর্ষার পর সেপ্টেম্বর- অক্টোবর। জুলাই, আগষ্ট এই দুই মাস বর্ষাকাল।

কোথায় থাকবেন ঃ 1) Punjab Sindh Awas, Guptakashi

2) Frontier House, Guptakashi

পরিচিতি ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। উচ্চতা ৬৫০০ ফুট - ৭০০০ ফুট নিকটতম শহর গুপ্তকাশী, উখিমঠ। উষ্ণতা শীতকালে সর্বোচ্চ ২২° সেঃ। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ৩০° সেঃ। জলবায়ু চির বসন্ত।

কালশিলা

সে অনেক যুগের কথা। পুরাণে কথিত আছে বহু প্রাচীনকালে সমগ্র কেদারখণ্ড ছিল অসুরদের স্বর্গরাজ্য। অসুরগণের অত্যাচারে দেবতাগণ পাতালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সমস্ত দেবতা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মার স্তব শুরু করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে মহামায়ার আরাধনা করেন। মহামায়া অসুর নিধনের ব্রত নিয়ে রণচণ্ডী মূর্তিতে আবির্ভূতা হন। একদিনে এক কোটি অসুর নিধন করে মা কোটিমায়েশ্বরী নামে খ্যাত হন।

এক কোটি দেবতা তাঁদের তেজ ও শক্তি মাকে অর্পণ করেন। মা অধিক অশান্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। শঙ্কর ভগবান আপন ইচ্ছায় প্রকট (রুচি) হয়ে মাকে শান্ত করেন। মা তাঁর দেহ থেকে তিন মহাশক্তি মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী অপসারণ করে শান্ত রূপ ধারণ করেন। মা নিজে করুণার অবতার হয়ে কোটিমায়েশ্বরীতে কন্যারূপী শিলা মূর্তিতে প্রকট হন।।

তিন মহাশক্তি তিনটি স্থানে অসুর নিধনে মেতে ওঠেন। কালশিলায় মা 'মহাসরস্বতী' নামে চণ্ডমুণ্ড নামক দুই মহাসুরকে বধ করেন। অসুর বধের পর মা প্রস্তর রূপ নিয়ে পাতালে প্রবেশ করেন।

সুউচ্চ পর্বত শিখরে এক প্রস্তর ফলকের নীচে মা বিরাজমান। ঐ প্রস্তর ফলকের উপর মহামায়া মহাসরস্বতীর, কাল্পনিক রূপ। সেই অনাদিকাল থেকে আজিও পূজিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে ঐ প্রস্তর ফলকের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহযোগিতায় এক আধুনিক মন্দির নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। কালশিলা আসার দুটি ট্রেকিং রুট। দুটি পথই অসাধারণ। প্রথমটি কালীমঠ থেকে ৬ কি.মি. ট্রেক। দ্বিতীয়টি কোটমা থেকে সাড়ে ৭ কি.মি. ট্রেক। কোটমা হয়ে পথ অনেক বেশী প্রাণবন্ত, ছায়াসুশীতল ও মনোমুগ্ধকর। উভয় পথ বিঁউখি গ্রামে গিয়ে মিশেছে। বিঁউখি থেকে কালশিলা ৩ কি.মি.। পথ সবটাই চড়াই। ফেরার পথে কালীমঠে নামাই সুবিধা।

২৫শে মে কালশিলা দর্শনে যাই। হিমালয়ের গোপন অন্তঃপুরে অস্থায়ী

আবাসনে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। গৃহকর্তা জিতার সিং স্নানের গরম জল এনে দেয়। স্নান ও পূজাপাঠ সেরে যাত্রার জন্য তৈরী হই। সকাল ৭টা। যাত্রাকালে মা পার্বতী ও শঙ্কর ভগবানকে প্রণাম করি। মেঘমুক্ত আকাশে তুষারশুভ্র কেদারশৃঙ্গ ও মদমহেশ্বর শৃঙ্গের দর্শন পাই। সঙ্গে আমার নিত্যসঙ্গী ন্যাপ স্যাক, তাতে জলের বোতল ও ছাতা। জিতার সিং-এর হাতে চা-বিস্কুট খেয়ে যাত্রাপথে পা বাড়াই।

কোটমা বাজার এলাকা থেকে সামান্য এগিয়ে ডানহাতি পথ। গভীর জঙ্গল ভেদ করে সে পথ নেমে গেছে সরস্বতীর তীরে। শুনেছি ওটাই কালশিলার পথ। উৎরাই পথে তর তর করে নেমে যাই। সরস্বতীর বুকে ঝুলন্ত সেতু। সেতু পেরিয়ে চড়াই পথ। চড়াই অতিক্রম করে ছায়া সুশীতল গ্রাম্য পথ। অরণ্য শোভিত পথ। বাঁদিক থেকে একটি পথ এসে মূল পথে যুক্ত হয়। কোন পথে যাবো বুঝতে পারি না। এমন সময় পিঠে ঘাসের বোঝা নিয়ে এক কিশোরীকে দেখতে পাই। মা- বলে সম্বোধন করি। নাম জিজ্ঞাসা করি - হেসে বলে মায়েশ্বরী। আমার পথের নিশানা দেখিয়ে দেয়।

এপথ গভীর জঙ্গলে ঢাকা, রোমাঞ্চকর। ঝর্ণার শব্দ, পাখির কূজন, পিঁ....পিঁ....পিঁ.... চিঁ.... চিঁ.... চিঁ.... ইত্যাদি সুর ভেসে আসে। কে যেন মহাশক্তির ভাণ্ড এনে সামনে দাঁড়ায়। মনে কোন সংকোচ নেই, ভয় নেই, মহা উৎসাহে পথ চলেছি। একজনের সাথে কথা বলি- ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়।

হঠাৎই পথের চিহ্ন হারিয়ে যায়। এক কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার শব্দ কানে আসে। কাউকে দেখতে পাই না। 'মহারাজ! মহারাজ!' বলে চিৎকার করি। কাঠুরিয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পথ দেখিয়ে দেয়। আবার চলি।

কালশিলা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘদিনের। আজ সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে। শঙ্কর ভগবান কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেন না। এসবই গুরুজীর কৃপা। হিমালয়ে যার দর্শন পেয়েছি তিনি সর্বদাই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন।

উৎরাই পথে একটা ঝর্ণার বুকে নেমে আসি। পূর্বাহ্ণের সূর্যকিরণে প্রকৃতি উদ্ভাসিত। চলার বিরতি টেনে সামান্য বিশ্রাম নিই। ঝর্ণা পেরিয়ে আবার চড়াই

শুরু। তবে সে চড়াই মোটেই প্রাণান্তকর নয়। অপূর্ব পরিবেশ। সবুজের কার্পেট পাতা একটি বুগিয়ালে এসে দাঁড়াই। প্রকৃতিমায়ের চরণে যেন সবুজের আলপনা। মনে হয় প্রকৃতিমায়ের চরণ দুখানি স্পর্শ করি। সদ্য স্নানান্তে মা যেন অঙ্গ সজ্জায় মগ্ন। সবুজের ঘরে ঝিঁঝির ডাক। অপূর্ব মিষ্টি সুরে কে যেন বাঁশি বাজায়। অসংখ্য পাখির অসংখ্য সুরে প্রকৃতি রসময় হয়ে ওঠে। সবুজের গালিচা পাতা প্রাঙ্গণ। সুবৃহৎ উপলখণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো। সুউচ্চ ব্রাঁস, বুরাস, আখরোট ইত্যাদি বৃক্ষসমূহ প্রকৃতির বুকে নীরব রক্ষক। পথ চলতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় এখানে ২/১ দিন থেকে যাই। এপথে না এলে এ জিনিস প্রত্যক্ষ হত না।

চড়াই পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে এসে গ্রামের দেখা পাই। বিঁউখি গ্রামে গব্বর সিং আসোয়ালের সাথে দেখা। ও জানায় এখনও ৩ কি.মি. পথ বাকি। বিঁউখি থেকে কোটমা সাড়ে ৪ কি.মি., কালীমঠ ৩ কি.মি.।

বিঁউখি এ পথের শেষ গ্রাম, বেশ বড় গ্রাম। ৪০/৫০ টি পরিবারের বাস। গ্রামের মানুষের প্রধান উপজীবিকা চাষ ও পশুপালন। কিছু মানুষ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে পাকা বাড়ি বানিয়েছে। বাড়ির আনাচে-কানাচে দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে কালশিলায়। বাড়ির উঠানে মাল্টা গাছের সারি। ভেড়ার পশম থেকে হাতে সুতা কেটে কম্বল তৈরী এখানকার অন্যতম শিল্প। গ্রামের অনেকেই পশম শিল্পে অভিজ্ঞ। পাহাড়ী মানুষ আধুনিক প্রযুক্তির নাগালের বাইরে। শিল্পের কোন বাজার এরা পায় না, তাই দরিদ্রতা এদের নিত্য সাথী।

বিঁউখি যথেষ্ট সম্ভাবনাময় গ্রাম। পূর্বেই বলেছি গ্রামে তিনটি পথের সমন্বয় ঘটেছে। কালীমঠ, কোটমা ও কালশিলা। আমার মনে হয় আগামী দিনে কালশিলা পর্যটন কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তখন বিঁউখির গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যাবে। সেই বিঁউখি এখন অবহেলিত। বিঁউখিবাসী এখনও স্বাস্থ্য ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। গ্রামে আজও বিদ্যুতের আলো পৌঁছায়নি। পাহাড়ে মেয়েরাই অধিক পরিশ্রমী। বিঁউখি গ্রামে সেই দৃশ্যই অধিক মাত্রায় প্রত্যক্ষ করি।

গ্রামে চাষের কাজে মানুষে টানা লাঙল দেখে অবাক হই। স্বাধীনতার ৫৬ বছর পর মানুষের টানা লাঙ্গলে জমি চাষ হয়, তাও মেয়েরা। এক বয়স্ক

মহিলা লাঙ্গলের পিছন ধরেছে আর এক কিশোরী লাঙ্গল টেনে নিয়ে চলেছে। হিমালয়ের গভীরে না এলে এ সব দৃশ্য নজরে পড়ে না।

বিঁউখি পেরিয়ে চড়াই পথ। পথের দুধারে রডডেনড্রন, বুরাস, ব্রাঁস, ইত্যাদি নাম না জানা অসংখ্য তরুরাজি। ব্রাঁস ফুলের জুস্ তৈরী এখানকার মানুষের এক প্রকার শিল্প। স্থানীয় মানুষের ধারণা এর জুস পানে Heart খুব ভাল থাকে।

পথ বেশ চড়াই। পাথর দিয়ে বাঁধানো পথ। যত যাই পথ ততোই উপরে ওঠে। পথে কোন মনুষ্য প্রাণী দেখিনা। পথের দু ধারে রডডেনড্রন। রডডেনড্রনের ছায়ায় শীতল পরিবেশ। একমাত্র শঙ্কর ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে চলেছি। মধ্যাহ্ন মাথার উপর এসে যায়। পা চলতে চায় না, শরীরে বেশ ক্লান্তি অনুভব করি। পানীয় জলটুকু শেষ করেছি। এ পথে আসতে হলে পানীয় জল অবশ্যই সঙ্গে রাখা চাই। প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে। একমাত্র — নমঃ শিবায় নম ছাড়া গতি নেই। তাঁরই হাত ধরে মাঝে মাঝে বসে পড়ি, আবার তাঁরই হাত ধরে চলতে থাকি। জানি না আর কত পথ বাকি? জিজ্ঞাসা করার কোন সুযোগ নেই। শরীর ক্রমশঃই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বেলা সাড়ে ১১টা। সকাল ৭টায় কোটমা থেকে বেরিয়েছি। একটানা চড়াই ভেঙ্গে চলেছি, একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙ্গে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসি বেলা ১২টা ১৫মিনিটে।

দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার পর কালশিলার দর্শন পাই। প্রাচীন রূপ আমার জানা নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে দেবতার চতুর্দিকে আধুনিকতার ছাপ। অপূর্ব ভঙ্গিতে প্যাগোডা আকৃতিতে নব নির্মিত মন্দির সমাপ্তির পথে। গর্ভমন্দিরে মহাসরস্বতী, মহাকালী, ও গণেশ ভগবানের শিলা মূর্তি। গর্ভমন্দিরের কেন্দ্রস্থল একটি প্রস্তর ফলকে ঢাকা। ঐ ফলকের নীচে মহাসরস্বতীর অদৃশ্য শিলামূর্তি।

এসবই কালশিলাকে পর্যটকের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস মাত্র। মন্দির আঙ্গিনা লোহার রেলিং দিয়ে সাজানোর কাজ এগিয়ে চলেছে। সান বাঁধানো আঙ্গিনায় পর্যটকের বিশ্রামের জন্য সান বাঁধানো আসন।

মন্দিরের পশ্চাতে বর্খাগিরি মহারাজের আশ্রম। মন্দিরে প্রণাম ও ভক্তি নিবেদনের পরে মহাত্মার আশ্রমে যাই। অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশে মহাত্মার

আশ্রম। আশ্রমের প্রবেশ দ্বারে এক ভক্ত স্বাগত জানায়। মহাত্মা আশ্রমেই ছিলেন। জটা- জুটধারী সন্ন্যাসী। আনুমানিক বয়স সত্তরের কম নয়। চেহারায় এখনও যৌবনের তারুণ্য। মহাত্মা তাঁর ভক্তকে চা পরিবেশনের আদেশ দেন। আমি পৌঁছানোর পূর্বেই বিঁউখি গ্রাম থেকে দুজন ভক্ত এসেছিলেন বাবার দর্শনে। সকলেরই মধ্যাহ্ন আহার শেষ হয়েছে। আমাকেও মধ্যাহ্ন আহারে আমন্ত্রণ করেন। আমি অনিচ্ছা প্রকাশ করি। চা ও বিস্কুট দিয়ে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিই।

মহাত্মা আহারের পর ১ ঘন্টা বিশ্রাম নেন। ঐ সুযোগে আশ্রম পরিক্রমা সেরে নিই। লম্বা কুঠিয়া। কুঠিয়াতে পর পর তিনখানি কামরা, প্রথমটিতে বাবা থাকেন, মাঝখানে আগত অতিথি। তৃতীয়টিতে কাঠ ও জিনিসপত্র।

আশ্রম সংলগ্ন উদ্যানে আরুগাছ, আপেল গাছ, নেসপাতি, আখরোট ও নানা ফুলে সুসজ্জিত। বাগানের একদিকে ভাঙ্গ, সরষে, আলু, রাইশাক, দেখতে পাই। যেদিকে তাকাই শুধুই সবুজ আর সবুজ। বিশালাকৃতি গোলাপ ফুল দেখে মুগ্ধ হই।

আশ্রম গণ্ডির বাইরে চন্দ্রপাল সিং ও বীরেন্দ্র সিংয়ের চায়ের দোকান। দু-খানি ঝুপড়ির দোকান। উভয়ের নিকটই রাত কাটানোর ব্যবস্থা আছে। দুই জনই বিঁউখি গ্রামের ছেলে। পূর্বেই বলেছি ৩ কি.মি. নীচে বিঁউখি গ্রাম।

চন্দ্রপালের দোকানে বসে চা পান করি। চা পানের পর চন্দ্র পালের হাতে পাঁচ টাকার একটি মুদ্রা দিই, চন্দ্র পাল ২ টাকা ৫০ পয়সা ফেরৎ দেয়। দশ হাজার ফুট উপরে ২ টাকা ৫০ পয়সায় চা ভাবাই যায় না। আমি চন্দ্র পালকে তিন টাকা নিতে অনুরোধ করি। ওর সরলতা ও আন্তরিকতা মূল্যায়নের ঊর্ধ্বে।

পাহাড়ে মেয়েরা অধিক পরিশ্রমী। দুই মহিলা মাথায় করে চালের বস্তা নিয়ে আসে। এদের সাথে পথেই দেখা। এরা আর কেউ নয় চন্দ্রপাল ও বীরেন্দ্রর স্ত্রী। ছেলেরা বসে দোকান চালায়, দোকানের সামগ্রী মেয়েরা গ্রাম থেকে মাথায় করে নিয়ে আসে। চন্দ্রপালের কাছে ভাত, ডাল, রুটি ও সবজি মেলে। পর্যটক না এলে সারাদিন বসেই কাটাতে হয়। কালশিলায় পর্যটক খুবই কম আসে।

আজ কোথায় রাত্রি যাপন হবে তখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি। চন্দ্রপাল থাকার জন্য অনুরোধ করে, অপর দিকে মহাত্মার আকর্ষণ। চা-পানের পর মহাত্মার আশ্রমে চলে আসি। বিকাল পাঁচটা।

আশ্রম চত্বরে অমসৃণ এক প্রস্তর খন্ডের উপর বসি। ধূসর রঙের অতি চমৎকার কয়েকটি পায়রা। নিজের ইচ্ছামত খাবার সংগ্রহ করে। ভয়-ভীতি কিছু নেই। সুউচ্চ পাহাড়ে সকলেই স্বাধীন। শঙ্কর ভগবানের সংসারে সকলেই সমান। ওদিকে মহাত্মা পদচারণার সাথে ইষ্টনাম জপ করেন। হাতে লাল রংঙের ঝুলি। ডান হাতখানি ঐ ঝুলির ভিতর প্রবেশ করানো আছে। ওটার নাম মালার ঝুলি।

প্রকৃতি স্বচ্ছ সুনির্মল। আঙ্গিনায় বসে তুষার শুভ্র মদমহেশ্বরকে দেখি। মন্দিরের আঙ্গিনা থেকে তুঙ্গনাথ দৃশ্যমান।

সন্ধ্যার পর মহাত্মা আমাকে ঘরেই ডেকে নেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রপালকে ডেকে আহারের ব্যবস্থা করতে বলেন, খিচুড়ি প্রসাদ। মহাত্মা ধুনির আগুনে চা তৈরী করেন। ধুনির একপ্রান্তে মহাত্মা অন্যপ্রান্তে আমি। মহাত্মার হাতে চা পান করে ধন্য হই।

মহাত্মার যেখানে আসন ঠিক তার বামে মহাত্মার বিগ্রহ দত্তাত্রেয়, গণেশজী, মাতা পার্বতী ও অখণ্ড জ্যোতি। সর্বদাই তাঁর আসনের সামনে ধুনি প্রজ্বলিত। ধুনির এক প্রান্তে ত্রিশূল মহারাজ। ত্রিশূলের গলায় ২/৩টি রুদ্রাক্ষ ও ফুলমালা।

তাঁর পোষাকের কোন বালাই নেই। অতি সাধারণ ভাবে থাকেন। চরণ দু-খানি সর্বদাই নগ্ন। পরনে হলুদ রঙের ২/৩ হাত কাপড়। শরীরে ধূসর রঙের একটি চাদর। এছাড়া তার শরীরে আর কিছুই দেখি না।

কালশিলার পূজা করেন বাবা নিজেই। দু-বেলা কালশিলার পূজা সেরে ঘরের দেবতার পূজা করেন।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর হিমালয়ে আছেন। ১২ বছর কেদারনাথে ছিলেন। ২২ বছর কালশিলায় স্থায়ীভাবে আসন পেতেছেন। জন্ম নেপালের গ্রামে। ১১ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়েছেন।

হিমালয়ের দীর্ঘ সান্নিধ্যে বর্খাবাবা এখন উচ্চমানের সাধক। ভৈরবের বাহন দুটি কুকুর ছানা মহাত্মার আশ্রমের স্থায়ী সদস্য। বিকেল থেকে যাদের শিকলে বাঁধা দেখেছি তারা এখন বাবার আসনে ঘুমে অচৈতন্য। ঘুমন্ত শিশুকে যেমন করে মা সরিয়ে দেয় তেমনি করে বাবা ওদের সরিয়ে নিজের বসার জায়গা করে নেন। ওদের জন্য প্রতিদিন দুই কিলোগ্রাম দুধ আসে বিঁউখি গ্রাম থেকে। একমাত্র দুধ ছাড়া অন্য খাবার নিষিদ্ধ। কুকুর দুটি নিরামিষ ভোজী।

বাবার আশ্রমে আর একটি স্থায়ী সদস্য হয়েছে এক জার্মান মেয়ে। বাবার কন্যা রূপে দীর্ঘ ৮ বছর তিনি বাবার কাছেই আছেন। এ অঞ্চলের সকলের কাছেই তিনি বর্খাবাবার কন্যা রূপে পরিচিতা। আগামী ২রা জুন, ২০০৩ থেকে বর্খাবাবা ভাগবত পারায়ণের ব্রত নিয়েছেন। ১১ দিন ধরে চলবে অখণ্ড পাঠ। আশ-পাশের সকল মানুষই আসবেন। তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। ঐ জার্মান মেয়েটি নিজেই কোমর বেঁধে নেমেছে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে। জেলার সর্বত্রই তার নাম শুনেছি। অনুষ্ঠানের খবর জেলার মানুষের কাছে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে।

শঙ্কর ভগবানের আশীর্বাদ না পেলে কোন সাধকই বড় হতে পারে না। বর্খা বাবার সান্নিধ্য পেয়ে খুবই আনন্দ পাই। মহাত্মার কথায় পূর্ব জন্মের সুকৃতি থেকেই সাধক জন্মে।

মহাত্মা কৃপা করে মাঝের ঘরে ধুনির পাশে রাত্রি যাপনের সুযোগ দিয়েছেন। সুউচ্চ পাহাড়ে, নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে, সাধু মহাত্মার সাধন পীঠে, ধুনির পাশে একাকী বসে থাকলে মনে আপনাতেই অধ্যাত্ম ভাব জাগরিত হয়। গভীর ভাবে লক্ষ করেছি, সেদিন সমতলের কোন কথাই মনে আসে নি। একেই বলে হিমালয়ের প্রভাব। সকাল থেকে ৮ কি.মি. চড়াই পথে ট্রেক করেছি, কালশিলায় এসে চারটে বিস্কুট ও চা খেয়েছি, আহারের কথা আদৌ অনুভব করিনি।

বর্খাবাবার কথা, আমি সব কিছু ছেড়ে গুরুকে গ্রহণ করেছি। এ শরীর গুরুকে সমর্পণ করেছি। খানা-পিনা সবকিছু গুরুর জন্য। যিনি নাঙগা তিনি তার দেহ গুরুকে অর্পণ করেন। সংসারী দেহে শুধুই আড়ম্বর। সাধক দেহে

শুধুই কৃচ্ছ্ সাধন। আমাদের তপস্যা সংসারের উদ্ধারের জন্য। নিজের জন্য নয়। হিন্দু ধর্মে বলে —

পাথর পূজনে সে

ভগবান মিলতে হে —

অতি প্রত্যুষে কলিংবেলের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে। কম্বলের ভিতর থেকে মাথাটা বের করে দেখি — অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছি। ঘরে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, কলিং বেলের বালাই নেই, কি করে তার শব্দ শুনি?

দেশলাই দিয়ে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালি। হাতের ঘড়িতে ভোর চারটে। রাতে যে ভাবে শুয়েছি এখনও ঠিক সেই অবস্থা। ধুনির একদিকে আমার বিছানা, সম্মুখে ও বামে আরও দুটি আসন, সেখানেও শোয়া যায়। ডান হাতে দেশলাই, প্রদীপ, ও কিছু কাঠ। বিছানায় বসে গুরুজীকে স্মরণ করি।

অকস্মাৎ বর্থাগিরির ডাক শুনতে পাই। চা-পানের আহ্বান আসে। শয্যা ত্যাগ করে বাইরে আসি। হাত-মুখ ধুয়ে বাবার ঘরে গিয়ে বসি। মহাত্মা আসনে বসেই ধুনির আগুনে চা তৈরী করেন। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে ঘটনার বিবরণ দিই।

মহাত্মা বলেন — এটা সিদ্ধপিঠ। এখানে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে ও অনেক কিছু শোনা যায়। এসবের কোন ব্যাখ্যা মেলে না। রাতে দিনে যে কোন সময় প্রকৃতির গভীর নীরবতা ভঙ্গ হয়। সুমধুর সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে। অবাক হয়ে মহাত্মার কথা শুনি।

এদিকে দিনের আলো ফোটে। মহাত্মার নিকট বিদায় নিই। মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই। ফেরার পথে বিঁউখি গ্রামে এসে সামান্য বিশ্রাম নিই। পূর্বেই বলেছি বিঁউখিতে পথ দ্বিধা-বিভক্ত। ডান-হাতি পথে 'কোটমা', বাঁ-হাতি পথে কালীমঠ। কালীমঠ হয়ে ফেরার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিয়েছি। পথ সঙ্গমে জলের কল। গতকাল কালশিলার পথে যে বিন্দুতে জলের কল দেখেছিলাম, আজ ফেরার পথে ঠিক সেই বিন্দুতে হিমালয়ের কিশোর দেবকান্তিযুক্ত বিঁউখির ছেলে প্রদীপ সিংয়ের দেখা পাই। ৭ম শ্রেণীর ছাত্র, চোখে-মুখে উজ্জ্বল প্রতিভার প্রতিফলন। আমাকে দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে সে তার বাড়ির উঠানে নিয়ে আসে। সান বাঁধানো

উঠান। ঘর থেকে চেয়ার এনে বসতে অনুরোধ করে। তার অনুরোধ এড়াবার সাধ্য আমার নেই। প্রদীপের মিষ্টি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই।

উঠানের এক প্রান্তে এক প্রৌঢ়কে হাতে কম্বল বুনতে দেখি। পরিচয়ে জানতে পারি প্রদীপের পিতৃদেব রাম সিং। রাম সিং সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। অবসর নিয়ে দেশে ফিরে পাকা বাড়ি বানিয়েছে। রাম সিং সেদিনের মত তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করে। পাহাড়ী মানুষের আন্তরিক ব্যবহারের কোন পরিমাপ হয় না।

ইতিমধ্যে প্রদীপের বন্ধুরাও এসে যায়। সকলের হাতেই লজেন্স দিই। মুহূর্তে সকলেই আপন করে নেয়। নির্মল প্রেমানন্দে অবগাহন করি। সকলের একই অভিযোগ, গ্রামে শুধুই প্রাথমিক বিদ্যালয়। সকলকেই কালীমঠ কিম্বা কোঠমার স্কুলে পড়তে যেতে হয়। আজ ওরা যেন আপনজনকে পেয়েছে। মনের দুঃখ উজাড় করে বলতে চায়। মনে মনে ভাবি এদের ভালবাসার বিনিময়ে কিছুই কি পারিনা দিতে? — এ হিমালয়ের ভালবাসা, হিমালয়ের প্রেম, যার কোন মূল্যায়ন হয় না। শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিই। সকলেই অনেকটা পথ আসে — শিশু মন বুঝতে চায় না, অনেক বুঝিয়ে ফেরৎ পাঠাই।

পরিচিতি ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। তহশিল-উখিমঠ, নিকটতম শহর উখিমঠ, গুপ্তকাশী। উচ্চতা -৭৫০০ ফুট।

কিভাবে যাবেন ঃ গুপ্তকাশী থেকে জীপে কালীমঠ অথবা কোটমায় এসে নামুন। কালীমঠ অথবা কোটমা থেকে ট্রেক শুরু।

কোথায় থাকবেন ঃ গুপ্তকাশী, কালীমঠ অথবা উখিমঠ।

গৌরীকুণ্ড

শাস্ত্রে আছে সময় না হলে কিছুই হয় না। বিগত ৪০ বছর ধরে হিমালয়ে যাই, যত দেখেছি তার চেয়ে না দেখার সংখ্যা অনেক বেশী। বাবা কেদারনাথের পথে গৌরীকুণ্ড গিয়েছি অনেকবার। গৌরীকুণ্ডকে জানার চেষ্টা করিনি কোনদিন।

গৌরীকুণ্ডের প্রাকৃতিক ও মায়াময় পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তপ্তকুণ্ডে অবগাহন করে তৃপ্তি ও আনন্দ পাই। পথ চলার ক্লান্তির অবসান হয়। মন্দাকিনীর নৃত্য চপল উল্লাসে হৃদয় মন বিগলিত হয়।

গৌরীকুণ্ডের অধ্যাত্ম রস উদ্ঘাটনের কথা ভাবিনি। গৌরীকুণ্ডের আসল রস তার অধ্যাত্ম জগতে। যে কোন রসাল বস্তুর রস সঞ্চিত থাকে তার অভ্যন্তরে। বহিরাবরণ উন্মোচন করে চর্বণ করলে তবেই রসাস্বাদন হয়।

গৌরীকুণ্ডে কয়েকদিন না কাটালে তার প্রকৃত রূপ নজরে আসে না। যাঁর নামে গৌরীকুণ্ড সেই মা গৌরীকে বাদ দিয়ে গৌরীকুণ্ডকে জানা যায় না। মা গৌরী গৌরীকুণ্ডে বসে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাই এর আর এক নাম তপোস্থলী।

গৌরী অর্থাৎ কুমারী। হিমালয় কন্যা মা গৌরী এখানে বসে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। তাই এর নাম গৌরীকুণ্ড বা "তপোস্থলী"।

মহামায়া সৃষ্টি রক্ষার্থে ও জগতের কল্যাণে বার বার অবতীর্ণ হয়েছেন। দ্বাপর যুগে হিমাচল রাজের ঘরে কন্যা রূপে অবতীর্ণ হন। হিমাচল পর্বতের কন্যা তাই তার নাম হয় পার্বতী। বাবা মা আদর করে তার নাম রাখেন উমা। রাজকন্যা মা গৌরী পরমেশ্বরী। তাঁর হৃদয়ে সর্বদাই পরম পিতা পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। নারদের পরামর্শে তিনি গৌরীকুণ্ডে এসে তপস্যায় বসেন। দুই সখী শীতলা ও মনসা তাঁকে অনুসরণ করেন। তিনজনেই একত্রে স্নান, পূজা ও তপস্যা শুরু করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ শঙ্কর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের আশায় হিমালয়ের নানা প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন। পাণ্ডবগণ ছিলেন ধর্মের প্রতীক,ধর্মরক্ষার্থে

শঙ্কর ভগবান সে সময় খুবই ব্যস্ত ছিলেন।

বাবা থাকেন কেদারখণ্ডে মা আছেন গৌরীকুণ্ডে। নন্দী, ভৃঙ্গি, ভূত, প্রেত ইত্যাদি বাবার গণেরা প্রায়ই মায়ের আশীর্বাদ নিতে ও মায়ের সাথে দেখা করতে গৌরীকুণ্ডে চলে আসতেন। এসব মায়ের মোটেই পছন্দ ছিল না। মায়ের তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

মা তখন দেহের ময়লা (মাস) থেকে একটি পুতুল তৈরী করেন। ঐ পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সৃষ্টি হয় গনেশজী। তাই গৌরীকুণ্ডের আর এক নাম "শ্রী গণেশজীর উৎপত্তিস্থল"। কেউই যেন ঐ এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সেটাই দেখার দায়িত্ব ছিল গণেশজীর উপর।

মা গৌরীর কঠিন তপস্যায় শঙ্কর ভগবান বিচলিত হন। তিনি গৌরীকুণ্ডে প্রকট হন।

গৌরীকুণ্ডে পার্বতীমন্দিরে একদিকে মা- গৌরীর কুমারী রূপ, অন্য দিকে হর-পার্বতী শিলামূর্তি। পার্বতী মন্দিরের ঠিক সম্মুখে উমাপতির মন্দির। অভ্যন্তরে শিলাময় মূর্তি।

এ হেন গৌরীকুণ্ড দীর্ঘ অনাদর ও অবহেলায় শ্রীহীন হয়ে পড়ে। পার্বতী মন্দিরের দিকে পর্যটন কিংবা তীর্থ যাত্রীর তেমন নজর ছিল না। এমন কি স্নানের ঘাট "পীলাকুণ্ড" ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে আসল গৌরীকুণ্ড অর্থাৎ মায়ের তপোস্থলী, গণেশ জন্মভূমি ইত্যাদি সকলের অজানাই থেকে যেত।

অনেকের ধাবণা গৌরীকুণ্ড মানেই গরম জলের কুণ্ড। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। মা-স্নান করতেন "পীলাকুণ্ডে"। উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি অনেক পড়ে।

আজ গৌরীকুণ্ডের কথা বলতে গেলে যার কথা প্রথমেই বলা উচিত তিনি কাশীপুর নিবাসী মায়ের আদরের ছেলে যোগেশ জিণ্ডাল। যোগেশ জিণ্ডাল মহা ভাগ্যবান। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যের ফলে তিনি মা-কে নূতন করে সাজাবার সুযোগ পেয়েছেন। গুরুদেবের কৃপায় তিনি মায়ের মলিন বসন ছাড়িয়ে রাজবেশ পরিয়েছেন।

গৌরীকুণ্ডের আমূল সংস্কার সাধনে তাঁর অবদানের কোন তুলনা নেই।

পার্বতী মন্দির নূতন সাজে সজ্জিতা। মন্দিরের আঙ্গিনা সান বাঁধানো উঠান। গৌরীকুণ্ড আজ নব নির্মিত, নব সাজে সজ্জিত। গৌরীকুণ্ডকে নূতন করে সাজানো হয়েছে। সমগ্র আঙ্গিনা শুভ্র প্রস্তর ফলকে বাঁধানো। মা গৌরীর স্নান-স্থল " পীলাকুণ্ডের উপর সুন্দর ছাউনি। পূজা, তর্পণ ও পিণ্ডদানের সুন্দর ব্যবস্থা।

গৌরীকুণ্ড থেকে গরম কুণ্ডের পথ এখন সান বাঁধানো। গরমকুণ্ডে প্রবেশ দ্বারে ডানহাতে নব নির্মিত আধুনিক মানের শৌচালয়। গৌরীকুণ্ডের নবতম রূপ দানে যার অবদান সর্বাধিক তিনি আমাদের পশ্চিম বঙ্গের গৌরব যোগী মদন অধিকারী, যিনি কেদারখণ্ডে বাঙালী বাবা নামে পরিচিত। নূতন গৌরীকুণ্ড সৃষ্টিতে বাঙালী বাবার একমাত্র মন্ত্র শিষ্য ভক্তপ্রাণ যোগেশ জিণ্ডাল। যোগেশ জিণ্ডাল বাঙালী বাবার কৃপাধন্য। তিনি গুরুজীকে গুরুদক্ষিণা দিতে কৃত সংকল্প।

বাঙালীবাবা এখন হিমালয়ের মানুষ, হিমালয়ের মতই উদার। তাঁর উদারতা, মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব পরিমাপের ঊর্ধ্বে।

তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় শিষ্যকে তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের স্মৃতিতে গৌরীকুণ্ডকে নূতন সাজে সাজিয়ে দিতে আদেশ করেন। গুরুজীর আদেশ যোগেশ জিণ্ডাল মাথা পেতে গ্রহণ করেন। মহামায়া মা গৌরীর কৃপায় যোগেশ গৌরীকুণ্ডের আমূল সংস্কার সাধন করেন। সংস্কার সাধনে তিনি আনুমানিক এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। গৌরীকুণ্ডের গায়ে প্রস্তর ফলকে লেখা পর্যটকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।—

মাতা স্বর্গতা বিনোদ দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে বাঙালী বাবার স্নেহধন্য পুত্র শ্রীমান যোগেশ জিণ্ডাল গৌরীকুণ্ডের তিনটি কুণ্ডেরই সংস্কার সাধন করেন। গরম কুণ্ড, পীলা কুণ্ড ও ভোগ কুণ্ড। প্রস্তর ফলকে মাতৃদেবী ও গুরুজীর নাম লিখে তিনি গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার কিংবা ঋষিকেশ থেকে সরাসরি বাস যায়। গৌরীকুণ্ড যন্ত্রযানের প্রান্তিক স্টেশন। গৌরীকুণ্ড বাবা কেদার নাথের ১৪ কিমি হাঁটাপথের শুরু।

ধারী মা

শুনেছি উত্তরাঞ্চলে 'ধারী মা' খুবই জাগ্রত দেবী। স্থানীয় মানুষের মনে 'ধারীমা'র আসন সবার উপর। যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধারীমার আশীর্বাদ সর্বাগ্রে। নবদম্পতি ধারীমার আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে প্রবেশ করেন। ধারীমা বর্তমানকালের প্রাণময় মূর্তি। সন্তানের ইচ্ছা পূরণে তাঁর কোন কৃপণতা নেই। প্রত্যহ তিনবার তিনি রূপ বদল করেন। প্রভাতে কন্যারূপ, মধ্যাহ্নে যৌবনের প্রতীক, সায়াহ্নে বৃদ্ধা। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

দেবীর তিন রূপের বর্ণনা শুনি পূজারীর মুখে —
প্রাতঃস্য কুমারী কুসুম কলিকায়, জপ্য মালায় জপন্তি।
মধ্যাহ্নেন যুবারূপাম বিকশিত বদনাম্ বার নেত্রা নিশায়।
সন্ধ্যায় বৃদ্ধরূপা গলিত কুচ্‌যুগাম মুণ্ডমালাম ধারন্তি।

শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগের পথে, ১৪ কি.মি. দূরে কালসোর নামক স্থানে, অলোকানন্দার তীরে ধারীমার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময় মূর্তি। কথিত আছে দ্বাপরে অসুর নিধনের জন্য মহামায়ার এক বিশেষ শক্তি 'মহালক্ষ্মী' নামে এখানে প্রকট হন। মা এখানে চণ্ডমুণ্ড নিধন করেন। অসুর বধের পর মহালক্ষ্মী কন্যারূপী লিঙ্গমূর্তি ধারণ করেন।

অলোকানন্দা নদীর পূর্বপারে ধারী নামে একটি গ্রাম ছিল, এখনও আছে। অতীতে এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। তাঁরাই প্রথমে ঐ বিশালকায় মূর্তির সন্ধান পান। গ্রামের নামানুসারে মূর্তির নাম হয় ধারী মা।

কেদারনাথ বদ্রীনাথের পথে জাতীয় সড়কের উপর ধারীমায়ের প্রবেশ দ্বার। বহুবার গিয়েছি এপথে, কোনদিন ধারী মা দর্শনের ইচ্ছা জাগে নি। পূর্বেই বলেছি সময় না হলে কোন কিছুই হয় না।

গত ১৯শে মে, ২০০৩ সোমবার। ধারীমায়ের ইচ্ছাতেই ধারী মা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। অনেক সময় অনেক অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়। সেগুলিকে আমরা দেবতার কৃপা বা অলৌকিক বলে ব্যাখ্যা করি।

অতি প্রত্যুষে অনসূয়া মাতার দর্শন নিয়ে মণ্ডল হয়ে গোপেশ্বরে এসে নেমেছি, সকাল সাড়ে ১০টা। গোপেশ্বর Main Post Office এ সর্বেন্দ্র সিং বাতোয়ালের সাথে দেখা করি। প্রয়োজনীয় কিছু কাজ মিটিয়ে ডেরাদুনগামী একটি জীপে উঠে বসি। জীপ ছোটে মনও ছোটে। হরিদ্বার, হৃষিকেশ, ডেরাদুন কোথায় যাই কিছুই স্থির করতে পারি না। অবশেষে ড্রাইভারকে ধারীমায়ের দুয়ারে নামিয়ে দিতে বলি। আমার বিশ্বাস মায়ের কাছে ছেলে সর্বদাই গ্রহণযোগ্য।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে 'কালসোর' ১৯ কি.মি.। বেলা আড়াইটে। কালসোর এসে জীপ দাঁড়ায়। জীপ থেকে মালপত্র নামিয়ে নিই। জীপ চলে যায়। যেখানে নেমেছি ঠিক তার বিপরীতে অনতি উচ্চ একটি তোরণ। তোরণের গায়ে লেখা- 'ধারীমা প্রবেশ দ্বার'। পথের উভয় পার্শ্বে মায়ের পূজার সামগ্রী বিক্রয়ের কয়েকটি দোকান। চায়ের দোকান ও খাবারের দোকান। হোটেল কিম্বা লজের কোন চিহ্ন নেই। ধারীমায়ের দর্শন নিয়ে অনেকেই শ্রীনগর কিংবা রুদ্রপ্রয়াগ এসে রাত্রিবাস করেন।

কোন কিছু চিন্তা না করে মায়ের মন্দিরের দিকে রওনা দিই। তোরণ ভেদ করে উৎরাই পথ। সান বাঁধানো পথ, মাঝে মাঝে সিঁড়ি। পথের পাশে রেলিং। পিঠে স্যাক, হাতে ব্যাগ নিয়ে নামতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাই ধারীমায়ের মন্দিরে। মন্দির অঙ্গনের অপূর্ব পরিবেশ। অলোকানন্দার গর্জন, সান বাঁধানো চত্বর, আধুনিক কালের আধুনিক রুচিতে নব নির্মিত মন্দির। প্রাচীন পাহাড় ও প্রাচীন মূর্তি দর্শনে দেহ হিম শীতল হয়ে যায়। এমন প্রাণবন্ত মূর্তি আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

অনেক ভক্ত এসেছেন পূজা দিতে। পূজারী সর্বক্ষণ ব্যস্ত। নিজেই দেখতে পাই মন্দিরে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। পূজার স্থান, মায়ের মূর্তি লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। মায়ের দেহে অনেক মূল্যবান গহনা। মাথায় বহুমূল্য রৌপ্য মুকুট ও রৌপ্য নির্মিত ছত্র। সামান্যতম সুযোগ পেয়ে পুজারীর কাছে রাত্রিবাসের কথা বলি।

সন্ধ্যারতির পর পূজারিগণ সকলেই বাড়ি চলে যান। একমাত্র চৌকিদার থাকেন। পূজারী বিনা দ্বিধায় চৌকিদারের সাথে মন্দিরে থাকার অনুমতি দেন।

মনে মনে ভাবি এ ধারীমায়ের কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিমেষে বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়। ধারীমা মহামায়া, পরমেশ্বরী। তাঁর চরণে মাথা রেখে রাত কাটানোর সুযোগ পাব ভাবতেই পারিনি। দেবতার কৃপা হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

পূজারী জগদম্বা প্রসাদ পাণ্ডে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। মায়ের খুবই প্রিয় ছেলে। সহৃদয় পূজারী আমার মনের অবস্থা জানতে পারেন। বার বার আমাকে সান্ত্বনা দেন। ভয়ের কোন কারণ নেই। চৌকিদারকে ডেকে সবকিছু বলে যান। সন্ধ্যারতির জন্য লক্ষ্মীপ্রসাদ পাণ্ডে আসেন। লক্ষ্মীপ্রসাদ পাণ্ডে জগদম্বা প্রসাদের ছোট ভাই। জগদম্বা প্রসাদ যাত্রাকালে আমার বিষয়ে লক্ষ্মী প্রসাদকে বলে যান।

লক্ষ্মীপ্রসাদ পাণ্ডে ধারীমা ট্রাষ্ট কমিটির প্রধান প্রবন্ধক। লক্ষ্মীপ্রসাদের কথাই শেষ কথা। তবুও বড় ভাইয়ের কথা কেউই অমান্য করে না। লক্ষ্মীপ্রসাদ আরও বেশী সহজ ও সরল। শাস্ত্র বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য।

পিতা ছিলেন ভক্তরাম পাণ্ডে। আজীবন ধারীমার পূজা করেছেন। ধারীমায়ের কৃপায় তিনি ছিলেন ছয় পুত্রের জনক। দেহান্তরের পূর্বে তিনি ছয় পুত্রকেই ধারীমা-ট্রাষ্ট কমিটির সদস্য করে যান। ছয় পুত্রই এখন মন্দিরের পূজারী।

জগদম্বা প্রসাদ সকলের বড়। ভগবতী প্রসাদ দ্বিতীয়। লক্ষ্মী প্রসাদ তৃতীয়। রমেশ প্রসাদ চতুর্থ। রামপ্রসাদ পঞ্চম। রাজেন্দ্র প্রসাদ ষষ্ঠ।

লক্ষ্মীপ্রসাদের সাথে কথা বলে খুবই আনন্দ পাই। তাঁর কথায় ধারীমায়ের রূপ প্রতিদিন তিনবার বদল হয়। প্রতিদিন তিনবার পূজা ও বসন পাল্টানো হয়। ধারীমার মন্দিরে থেকে মাকে মনের মণিকোঠায় বসিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে মায়ের তিন রূপ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রভাতে দেবীর বালিকা রূপ, মধ্যাহ্নে-যুবা মূর্তি, সায়াহ্নে-বৃদ্ধা। লক্ষ্মী প্রসাদ ধারী মায়ের সংকল্প স্তোত্র পাঠ করেন।

হিম পর্বত দেশে —

বদ্রী কেদারখণ্ডে, অলোকানন্দা বাম কূলে।

শ্রী কল্যাণী ছত্রে কালিয়াসোর গ্রামে

শ্রী দক্ষিণ কালিকা স্থলে উপনাম শ্রীধারী দেবী (বিশেষ) ধারী গ্রাম কারণ।

লক্ষ্মী প্রসাদ নাচের ভঙ্গিতে আরতি করেন। আরতির পর উপস্থিত

সকলের কপালে প্রসাদী টিপ পরিয়ে দেন এবং মায়ের বিশ্রামের আয়োজন করেন। রৌপ্যছত্র, মাথার মুকুট ইত্যাদি মূল্যবান গহনা খুলে পাশের ঘরে রাখেন। সেখানে লোহার গেটে তালা পড়ে। যাত্রাকালে উন্মুক্ত গর্ভমন্দিরের লোহার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন।

মায়ের মাথার উপর অনতিউচ্চ পাহাড়ের বর্ধিত অংশ। তার উপর লোহার রেলিং। সাবধানতার কোন ত্রুটি নেই। মায়ের ফটো তোলা নিষিদ্ধ। অতী তে যারা ফটো তুলেছেন তারা সকলেই বিপদে পড়েছেন।

আরতির পর লক্ষ্মীপ্রসাদ সদর গেটে তালা লাগিয়ে চলে যান। লক্ষ্মীপ্রসাদের সাথে চৌকিদার কুলদীপ সিং প্রস্থান করেন। তার ফিরতে দেরী হবে জানিয়ে দেয়। রাতে আহারের জন্য কুলদীপকে দুধের কথা বলি।

রাত ১০টায় কুলদীপ গরম দুধ নিয়ে ফিরে আসে। মন্দিরের মেঝেতে ম্যাট্রেস পেতে বসেছি। মন্দির আলোয় আলোময়। লক্ষ্মীপ্রসাদের কথাগুলি বার বার রোমন্থন করি। অতীতে মহাপ্লাবনে দেবী মূর্তি লুপ্ত হয়ে যায়, গ্রামের মানুষ নতুন মূর্তি তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করেন। স্বপ্নাদেশে আসল মূর্তির সন্ধান মেলে। অলোকানন্দার মাটির নীচ থেকে আসল মূর্তি উদ্ধার করে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। আসল মূর্তির পাশে মানুষের তৈরী মূর্তিটিও শোভা পায়। কুলদীপ ঘুমিয়ে পড়ে।

রাত ১১টা,গভীর রাতে মায়ের সম্মুখে যেতে আর সাহস পাই না। মনে মনে ভাবি এমন অপূর্ব প্রাণময় মূর্তি ভারতের আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। চোখে ঘুম নেই, দেহে ক্লান্তি নেই। অতি সন্তর্পণে চুপি চুপি মায়ের সম্মুখে গিয়ে বসি। আমার সামনে লোহার রেলিং-এর ব্যারিকেট। চারিদিক নিস্তব্ধ। মায়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। মনের অজান্তে আমার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ চোখ খুলে মায়ের হাসিমুখ দেখে চমকে উঠি। একটু নড়ে-চড়ে বসি — স্বপ্ন নয়, মাতৃময়ী প্রাণময় শিলামূর্তির মুখে হাসি। নিমেষে দেহ ভারী হয়ে যায়। সেই স্থান দ্রুত পরিত্যাগ করি। কুলদীপের পাশে গিয়ে বসে পড়ি। ওর গায়ে হাত রেখে ওকে জাগাবার চেষ্টা করি, আমার চেষ্টায় কোন ফল হয় না, ও তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

কুলদীপের পাশে বসে কিছু সময় কাটে। কিছুতেই চোখে ঘুম আসে না। অনুসন্ধিৎসু মন বারবার গর্ভমন্দিরে ছুটে যায়। ধ্যান, জপ, পূজা, তর্পণ কিছুই জানা নেই। কোন কিছুই বুঝতে পারি না। শিলা মূর্তির মুখে হাসি — বিশ্বাস করতেও ভয় হয়। ইতিমধ্যে অনেকটা শক্তি ফিরে পাই।

কিছু সময় পর আবার মায়ের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াই। মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। মন্দিরের ঘড়িতে রাত দুটোর ঘন্টা বাজে। মায়ের রক্তবর্ণ ঠোঁট দুটি আবার কাঁপতে থাকে, মা যেন কথা বলতে চায়, তাঁর ভাষা বুঝতে পারি না। দেহ ঘর্মাক্ত হয়, হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়, ক্ষণেকের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলি। পাথরের মূর্তি হাসে, কথা বলে এ দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সেই মুহূর্তে মায়ের দিকে তাকিয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি।

মায়ের মন্দিরে থাকা নিষিদ্ধ। একমাত্র চৌকিদার থাকে। পূজারী আমাকে মন্দিরে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। নানা কথা মনে জাগে। ভাবতে ভাবতে ভোর হয়।

অতি প্রত্যুষে কুলদীপ জেগে যায়, ঘড়িতে চারটে। অলোকানন্দার তীরে গভীর জঙ্গলে সে নিত্যকর্ম সেরে আসে। আমিও অনুসরণ করি। নিত্যকর্মের পর কুলদীপ মন্দিরের কাজে মনোনিবেশ করে। জল আনা, মন্দিরের পরিচ্ছন্নতা, ঠাকুরের বাসন মাজা, গেটের তালা লাগানো, খোলা এসব কুলদীপের নিত্যকাজ। এই সব কাজের ফাঁকে সে একটি চায়ের দোকান চালায়।

মায়ের শৃঙ্গার (স্নান)।

ইতিমধ্যে পূজারী লক্ষ্মীপ্রসাদ পাণ্ডে এসে যায়। পূজারী এসে নিজের হাতে মন্দিরের তালা খুলে মায়ের ঘরে প্রবেশ করেন। শুদ্ধ দেহে কলসি মাথায় অলোকানন্দা থেকে মায়ের স্নানের বারি সংগ্রহ করে আনেন। শুরু হয় মায়ের স্নান অনুষ্ঠান। সে দৃশ্য চোখে না দেখলে অনুভব করা যাবে না। পূজার সামগ্রী নিয়ে দুই ভক্ত এসে হাজির। আমরা সকলেই মায়ের সম্মুখে রেলিংয়ের বাইরে বসে থাকি।

পূজারী প্রথমেই লাল কাপড় দিয়ে আমাদের আড়াল করে। তারপর একে একে মায়ের সকল পোষাক খুলে রাখেন। মায়ের কোমরের নীচের অংশ অদৃশ্য।

মায়ের পোষাক উন্মুক্ত করার পর যে রূপ দেখেছি তার বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। শুধু বলতে পারি প্রাণময় একটি কুমারী কন্যা। পূজারী ঘটিতে জল নিয়ে মায়ের মাথায় ঢালেন। ছোট শিশুকে যেমন করে স্নান করানো হয় ঠিক তেমনি করেই পূজারী মায়ের স্নান পর্ব সম্পন্ন করেন। স্নানের পর শুকনো কাপড় দিয়ে মাকে মোছানো হয়। তারপর রক্তবর্ণ পোষাক পরিয়ে মাকে সাজিয়ে দেন। ঘৃত, মধু, চন্দনে মাকে সাজানো হয়। পূজারী একে একে গয়নাগুলি পরিয়ে দেন। মায়ের কপালে আতপ চালের টিপ পরানো হল। তারপর নিত্য পূজা ও আরতি। পূজার উপকরণের সাথে নারিকেল অন্যতম। মন্দিরে রাত্রিবাস না করলে এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হত না।

পরিচিতি ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা পৌরী, উচ্চতা -৫৮০ মিঃ। কেদার-বদ্রীর পথে অবস্থিত। নিকটতম শহর শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ।

কিভাবে যাবেন ঃ ঋষিকেশ থেকে বাস অথবা জীপে শ্রীনগর হয়ে কালসোর এসে নামুন। বাস রাস্তা থেকে আধ কিমি পায়ে হাঁটা দূরত্বে অলোকানন্দার তীরে মন্দিরের অবস্থিতি।

কোথায় থাকবেন ঃ ধারীমায়ের দর্শন নিয়ে শ্রীনগর অথবা রুদ্রপ্রয়াগ এসে রাত্রিবাস করাই সুবিধা।

কখন যাবেন ঃ সারা বছরই ধারীমা দর্শনে যাওয়া যেতে পারে।

চন্দ্রবদনী

উত্তরাঞ্চল, জেলা-টেহ্‌রী। চন্দ্রকুট পাহাড়ের মাথায় মন্দিরের অবস্থিতি। উচ্চতা ৮৫০০ ফুট। মন্দিরের বিগ্রহ্ দেবী চন্দ্রবদনী অর্থাৎ মা পরমেশ্বরী পার্বতী। সিদ্ধ পীঠ। আদিগুরু শঙ্কারাচার্য সুরঙ্গ পথে এসে প্রথম মায়ের দর্শন লাভ করেন। মা খুবই জাগ্রত। অনেকেই মায়ের দুয়ারে এসে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। পূজারীর ভাষায় মায়ের আবেশ (ভর) হয়েছে। সতীর দেহত্যাগের পর সতীর বদন পড়ে চন্দ্রকুট পর্বতে। — সেই থেকে নাম হয় চন্দ্রবদনী।

উত্তরাঞ্চলের পথঘাট এখন অনেক উন্নত। আগেকার দিনের দুর্গমতা আর নেই। পথ ঘাটের অভাবে মানুষ যেখানে পৌঁছাতে পারত না, এখন সেখানে জীপ চলে যাচ্ছে। চন্দ্রবদনী এখন ভক্তপ্রাণ মানুষের নিকট খুবই সুগম।

দেবপ্রয়াগ থেকে ৫৫ কিমি দূরে চন্দ্রকুট পর্বত। পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে জীপ দাঁড়ায়। সেখানে বসেছে পূজার প্রসাদের দোকান। প্রতিটি ডালিতে নারিকেল। বিভিন্ন মূল্যে পূজার ডালি বিক্রয় হয়। জীপ বা ট্যাক্সি থেকে নেমে পূজার ডালি হাতে নিয়ে সান বাঁধানো পথে ১ কিমি ট্রেক। অপূর্ব বনশোভা, সামান্য দূরত্বে পথের এক প্রান্তে লোহার রেলিং। মাঝে মাঝে পানীয় জল ও বসার ব্যবস্থা। রডোডেনড্রন ও নাম না জানা বৃক্ষ সমূহ পথের শোভা বর্ধন করে। দেবপ্রয়াগ টুরিষ্ট রেষ্ট হাউস থেকে "চিড়াকোট হিণ্ডোলা" খাল হয়ে জীপ যাচ্ছে চন্দ্রবদনী। তিন কিমি পথ এখনও কাঁচা। নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ। পাহাড়ের গায়ে সবুজের কার্পেট পাতা। সেই কার্পেটে শুভ্র গোলাপের নক্সা কাটা। সকাল ৯টায় আমাদের গাড়ী পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ায়।

চন্দ্রবদনীর পথে পথ প্রদর্শক সচ্চিদানন্দ মহারাজ। কিশোর বয়সে সংসার ছেড়ে হিমালয়ে শঙ্কর ভগবানের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অবিস্মরণীয় ত্যাগ ও নিষ্ঠা। হিমালয়ের পথে সচ্চিদানন্দের সান্নিধ্য হিমালয়েরই দান। তাঁর

প্রেরণা পাথেয়। মাত্র ১৫ বছর বয়েসে সমতলের মায়া কাটিয়ে হিমালয়ে শয্যা পেতেছেন, এখন তিনি ৩২ বছরের যুবা। দীর্ঘ ১৭ বছরে হিমালয়ের আধ্যাত্ম জগতের সাথে অনেকটাই পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে অবাক হয়ে যাই। গাড়ী থেকে নেমে সচ্চিদানন্দ ৫১ টাকার পূজার ডালি কেনেন। সম্মুখে চন্দ্রবনীর প্রবেশ দ্বার। তোরণ ভেদ করে সিমেন্ট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বনকুসুমের সমারোহ। মাঝে মাঝে সান বাঁধানো বসার ব্যবস্থা। মন্দির পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১৭৩ টি সোপান পার হতে হয়।

মন্দির আঙ্গিনায় অপূর্ব পরিবেশ। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে সান বাঁধানো উদ্যান। বাঁ হাতে পানীয় জলের কল। পাশেই 'বিষ্ট জলপান ও চাউমিন সেন্টার'। কীর্তি সিং বিষ্টের অনেক দিনের দোকান। কীর্তি সিংয়ের পর তাঁর ছেলে রিম সিং বর্তমানে দোকান চালায়। রিম সিং-য়ের হাতের পাকৌড়া ও সিঙ্গাড়া পর্যটকদের খুবই প্রিয়।

মন্দিরের বিগ্রহ শিশু কন্যা রূপে মা পার্বতীর শিলামূর্তি। মন্দিরের পশ্চাতে পূজারী শ্রী দাতারাম ভটের কুঠিয়া। অতি চমৎকার এক কামরার আবাসন। শয়ন কক্ষের সাথেই রন্ধনশালা, স্নানাগার ও শৌচালয়। ১৯৮৪ সালে বর্তমান মন্দিরের সংস্কার ও পূজারীর আবাসন তৈরী হয়। আদিগুরু শঙ্করাচার্য সুড়ঙ্গ পথে এই গুহায় আসেন। তিনিই প্রথমে সতীর বদন দেখতে পান। চন্দ্রকুট পাহাড়ে সতীর বদন তাই নাম রাখেন চন্দ্রবদনী। "মা" চন্দ্রবদনী যেখানে অবস্থান করেন সেই গুহার নির্মাণ কার্য তিনিই সম্পন্ন করেন।

পূজারী দাতারাম ভট দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ। মন্দিরের আধুনিকীকরণ তাঁরই অবদান। তিনিই মন্দির কমিটির অধ্যক্ষ। ১৯৮৪ থেকে তিনি এখানেই আছেন। পূর্বে ৬ কিমি দূরে পূজারগাঁও নামক গ্রামে বাস করতেন। সমগ্র চন্দ্রবদনীর জলসরবরাহ, বিদ্যুৎ, আবাসন, রাস্তা, ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ দাতারামের অবদান।

পূজারী দাতারামের মিষ্টি ব্যবহার, আন্তরিক সাহচর্য মনে দাগ কাটে। আমাকে সাথে নিয়ে সমগ্র আঙ্গিনা প্রদক্ষিণ করেন। মন্দিরের নিষিদ্ধ স্থানগুলি

আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখান। সামান্য দুরে পাহাড়ের মাথায় সুদৃশ্য একটি জলাধার নির্মিত হয়েছে। সেখান থেকে সমগ্র চন্দ্রবদনী এলাকায় জল সরবরাহ হয়।

মন্দির সংলগ্ন যাত্রী নিবাসটিও চমৎকার। যাত্রীদের থাকার জন্য কয়েকটি সুদৃশ্য কামরা নজর কাড়ে। ২/১ দিন থাকার কোন অসুবিধা নেই। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে চন্দ্রবদনীতে মেলা হয়। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তপ্রাণ মানুষ আসে মায়ের আঙ্গিনায়। সারা বছর পর্যটকদের ভিড়ে মায়ের আঙ্গিনা মুখর থাকে। চন্দ্রবদনীতে টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অখণ্ডানানন্দজী কোন এক সময় চন্দ্রবদনী আসেন। একরাত এখানেই ছিলেন। তাঁর লেখায় চন্দ্রবদনী সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

মাকে প্রণাম, পূজারীকে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই।

ঠিকানা ঃ তহশীল - দেবপ্রয়াগ

জেলা ঃ টেহরী গাড়োয়াল

গ্রাম ঃ চন্দ্রবদনী, উত্তরাঞ্চল।

পরিচিতি ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা টেহরী, উচ্চতা ৮৫০০ ফুট। নিকটতম শহর দেবপ্রয়াগ।

কিভাবে যাবেন ঃ দেবপ্রয়াগ থেকে চন্দ্রবদনী বেড়িয়ে নিতে পারেন। ট্যাক্সি বা জীপ মেলে দেবপ্রয়াগ থেকে। দিনে দিনে ঘুরে আসাই সুবিধা হবে।

কোথায় থাকবেন ঃ দেবপ্রয়াগ GMVN'S টুরিষ্ট লজ।

কখন যাবেন ঃ সারা বছরই চন্দ্রবদনী দর্শনে যাওয়া যেতে পারে।

মাতা অনসূয়া

ত্যাগ, তপস্যা, ও নিষ্ঠা এই তিনের শক্তিতে যিনি স্বর্গের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে পুত্র রূপে লাভ করেন, যাঁর সতীত্বের কাছে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পার্বতী লজ্জা পায়, তিনিই অত্রিমুনির ধর্মপত্নী মাতা অনসূয়া।

গত ১৮ই মে রবিবার, ২০০৩। মাতা অনসূয়ার (৬৫০০ফুট) দর্শনে যাত্রা। সকাল ৬-৪৫ মিঃ উখিমঠের বাসে চেপে ৯-৪৫ মিঃ মণ্ডলে এসে নামি। গোপেশ্বর গামী বাস সকাল ৬টায় গুপ্তকাশী থেকে ছেড়ে উখিমঠ, চোপ্তা, মণ্ডল হয়ে গোপেশ্বর যায়। মণ্ডল থেকে মাতা অনসূয়ার পথে ৫কিমি ট্রেক। বাসের ড্রাইভার চোপতায় ২০মিঃ চা-পানের বিরতি দেয়। উখিমঠ থেকে চোপতা ২৯ কিমি, বাস ভাড়া ১৭ টাকা। চোপতা থেকে মণ্ডল ২৬ কিমি, বাস ভাড়া ১৬ টাকা। মণ্ডল থেকে গোপেশ্বর ১৩ কিমি, জীপ ভাড়া ১০ টাকা।

আজ চোপতায় মঙ্গল সিংজীর সাথে দেখা হয়। ওর কাছেই চা-পান করি। মঙ্গল সিং পূর্ব পরিচিত। মঙ্গল সিং খুবই প্রাচীন। ২০ বছর পূর্বে প্রথম তুঙ্গনাথের পথে চোপতায় এসে মঙ্গল সিংয়ের ঝুপড়িতে রাত কাটাই। চোপতা তুঙ্গনাথের প্রবেশদ্বার। যতবার এপথে এসেছি ততবার মঙ্গল সিংয়ের সাথে সাক্ষাতে আনন্দ পেয়েছি। চোপতায় নেমে চৌখাম্বার সাথে দৃষ্টি বিনিময় কম ভাগ্যের কথা নয়।

চা পানের বিরতি শেষ, ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে। ড্রাইভারকে পূর্বেই আমাদের গন্তব্য স্থানের কথা বলে রেখেছি। আমাদের বাস দ্রুত এগিয়ে চলে। এ পথের সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। পথের দু ধারে মান্টা গাছগুলি আজও হাত তুলে স্বাগত জানায়। ঘড়িতে ৯-৪৫ মিঃ গাড়ি এসে মণ্ডলে দাঁড়ায়। আমিও বাস থেকে নেমে পড়ি।

বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে গোপেশ্বর চলে যায়। বাস থেকে যেখানে নেমেছি ঠিক সেখানেই অনতি উচ্চ একটি তোরণ। তোরণের মাথায় লেখা - 'শ্রীমাতা অনসূয়া মন্দির মার্গ'। পথের ডান হাতে ভগৎ সিংয়ের চায়ের দোকান।

দোকানের দোতলায় রাত্রিবাসের জন্য 'লজ'। ভকত সিংয়ের কথা চোপতায় মঙ্গল সিংয়ের কাছেই শুনেছি। ভকত খুবই হাসি খুশি, মিষ্টি চেহারার যুবক। ব্যবহারে আন্তরিকতা স্পষ্ট। ভকতকে চায়ের কথা বলে ওর লজ দেখে আসি। দোতলায় তিনটি ঘরে লজ বানিয়েছে। অনসূয়া কিম্বা তুঙ্গনাথের পথে মণ্ডলে নেমে ভকতের নিকট রাত্রিবাস করা যায়। মণ্ডলে নেমে অনসূয়া হয়ে রুদ্রনাথেও যাওয়া যায়। রাত্রিবাসের জন্য ভকত যথেষ্ট পরিমাণ লেপ কম্বল রেখেছে। সামান্য বিশ্রাম ও চা-পানের পর ভকতের কাছে বিদায় নিই। যাত্রাপথে ভকত সকল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। মাতা অনসূয়ার পথে মণ্ডল থেকে পোর্টারও মেলে। অথবা ভকতের কাছে মালপত্র রেখেও অনসূয়া দর্শনে যাওয়া যেতে পারে।

আমাদের যাত্রা শুরু সকাল ১০টা। তোরণ পেরিয়ে পাথর দিয়ে বাঁধানো পথ। পথের দুপাশে পাকা বাড়ি, মণ্ডল গ্রামের বসতি। গ্রাম হলেও শহরের সকল সুযোগ সুবিধাই মণ্ডলের হাতের মুঠোয়। কেদার বদ্রীর সংক্ষিপ্ত পথ এটাই। জেলা শহর অতি নিকটে। সর্বদাই জীপ চলে। পাকা রাস্তার উপর অবস্থিত। যাতায়াতের অনেক সুবিধা, অনেক বাস, ও জীপ। পোর্টার, যানবাহন ও মালবাহক, পাকা বাড়ি, দোকানবাজার, লজ সব কিছুই আছে। আধঘন্টায় জেলা শহর গোপেশ্বরে , বিদ্যুতের আলো, টেলিফোন প্রভৃতি মণ্ডলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গ্রাম ছাড়িয়ে শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। মণ্ডল থেকে ১ কিমি উপরে 'শিরোলী' গ্রাম। গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্মিত বাড়িটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাকা বাড়ির দেওয়ালে নানা তথ্য ও নির্দেশাবলী লেখা আছে। গ্রামে প্রবেশের মুখে পথ দ্বিধা বিভক্ত। বাঁহাতের পথ গ্রামের বাইরে দিয়ে ডান হাতের পথ গ্রামের আনাচে কানাচে উঠান পেরিয়ে। গ্রাম ছাড়িয়ে দুটি পথ একত্রে মিলিত হয়। আমরা ডান হাতের পথ দিয়ে এগিয়ে যাই।

পঞ্চায়েত ভবন পেরিয়ে বৃদ্ধ ভজিরামের সাথে দেখা। ভজিরামের কাঠের দোতলা বাড়ি। ভজিরাম বাড়ির উঠানে বসে ছেলের বৌ-কে সাথে নিয়ে গমের আঁটি তৈরী কবতে ব্যস্ত। ভজিরামের সাথে দু একটি কথা বলে আনন্দ পাই।

গ্রামে ১৫০ জনের মত লোকের বাস। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ ও পশুপালনের (গরু ও মহিষ) উপর নির্ভরশীল। দুধ প্রতিদিন গোপেশ্বরের বাজারে চালান যায়। খাঁটি দুধ প্রতি লিটার ১২ টাকা। ভজিরামের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে থাকে শ্বশুর বাড়ি। তিন বৌ, তিন নাতি, এক নাতনি নিয়ে ভজিরামের সংসার। ভজিরামকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এগিয়ে যাই।

শিরোলী পেরিয়ে সামান্য চড়াই পথে এগিয়ে চলেছি। পথে আমরাই তিনজন। মণ্ডল থেকে যাত্রাকালে এক নেপালী কিশোর মনবাহাদুরকে সঙ্গে নিই। মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি হাসি, সুমধুর ব্যবহার। কল্পনা মিত্র বাঙ্গালী মহিলা দমদম থেকে একাই বেরিয়েছেন হিমালয় ভ্রমণে। উখিমঠ থেকে একাই চলেছেন মাতা অনসূয়ার দর্শনে।

পথের চেহারা অতি চমৎকার। প্রকৃতিও শুচিস্মিতা। ডান হাতে সাইনবোর্ডে লেখা-সতী শিরোমণি মাতা অনসূয়া কি জয় হৌ। পাশেই সান বাঁধানো বেঞ্চিতে বিশ্রামের ব্যবস্থা। সুপ্রশস্ত সান বাঁধানো পথ। শ্যামায়মান প্রকৃতি। মাথার উপর বৃক্ষবাটিকার ছত্রছায়া। তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নের তীব্রতা অনুভব হয় না।

পথের মাঝে চার বাঙালী পর্যটকের সাথে দেখা। সকলেই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরছে, সকলেই আমার গ্রন্থের পাঠক। পরস্পরের দর্শনে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি। আমার লেখা পঞ্চকেদার পরিক্রমার পাঠক। শ্যামনগরের চার দামাল ছেলে— অনুপ, শ্যামল, মদন ও প্রশান্ত হিমালয় পরিক্রমায় বেরিয়েছে। মাতা অনসূয়ার অঙ্গনে সাক্ষাত। পূর্বেই বলেছি - পাঠক আমার দেবতা, হিমালয়ের পথে সেই দেবতার সাক্ষাৎ দর্শন। আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই। হিমালয়কে সাক্ষী রেখে, পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যে যার পথে চলে যাই।

সামান্য এগিয়ে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর বুকে লোহার সেতু। সেতু পেরিয়ে ডান হাতে বিশ্রামস্থল। লোহার ফ্রেমে টিনের দো-চালা আচ্ছাদন। নীচে সান বাঁধানো বেঞ্চ। সুন্দর ব্যবস্থা দেখে মাতা বৈষ্ণোদেবীর কথা মনে পড়ে।

মায়ের আঙ্গিনার প্রবেশ পথ, এত সুন্দর, এত স্নিগ্ধ, এত প্রাণময় সেটা সামান্য পূর্বেও ভাবতে পারিনি। পথের পাশে আবার একটি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি

বিশ্রাম স্থল দেখে থমকে দাঁড়াই। পাশেই পানীয় জলের উৎস। প্রাকৃতিক পরিবেশ এতই মনোমুগ্ধকর যেটা এপথে না এলে বিশ্বাস হবে না। পাখির সুমিষ্ট ডাক শুনে পাগল হয়ে যাই।

প্রকৃতি প্রতি মুহুর্তে বসন বদলায়, সবুজ শাড়ির ঘোমটা মাথায় সূর্য দেবকে সর্বদাই আড়াল করে। মসৃণ পথে, পথ চলার কোন কষ্টই নেই। মধ্যাহ্নের সূর্যদেব প্রকৃতির কাছে হার মানে। প্রকৃতির বুকে সুগভীর আনন্দধারা ও রসধারা আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা মিটাই।

সান বাঁধানো কলের ধারে মনবাহাদুর পিঠের বোঝা নামায়। মনে হয় সকলেই বেশ ক্ষুধার্ত। কেউ কিছু না বল্লেও নিজেকে দিয়ে সকলের খিদেটা অনুভব করি। ছাতুর সরবত করে তিনজনে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিই। যখনই ছাতুর সরবৎ তৈরী করি তখনই ক্যাপ্টেনের কথা মনে পড়ে। বাড়ি থেকে যাত্রাকালে ক্যাপ্টেনের দেওয়া লেবু আর লবণ খুবই কাজে লাগে। আহারের পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু।

অপরাহ্ন বেলায় স্থানীয় এক পরিবারের সাথে দেখা। মায়ের পূজা দিয়ে মণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে। সময় হাতে থাকলে একই দিনে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নীচে নেমে আসা যায়।

অকস্মাৎ সমতল পথে নেমে আসি। ডান হাতে জলের কল, সম্মুখে গণেশ ভগবানের প্রস্তরময় মূর্তি। অপূর্ব মূর্তি। মন্দির গাত্রে লেখা নমঃ গণেশায় নম। পথ বাঁ হাতে বাঁক নেয়।

পথের নিশানা ধরে এগিয়ে যাই, দূর থেকে গভীর অরণ্য ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না। চলার গতি মন্থর হয়। দুটি বাঁক নিয়ে মন্দিরের চূড়া দেখতে পাই। বাঁহাতে তেওয়ারি লজের সাইনবোর্ড নজর কাড়ে। সম্মুখে মন্দির আঙ্গিনায় প্রবেশ দ্বারে জুতা খোলার নির্দেশ। জুতো খুলে মন্দির আঙ্গিনায় প্রবেশ করি।

অপূর্ব পরিবেশ। প্রবেশ দ্বারে তোরণে সুবৃহৎ তিনখানি দোদুল্যমান ঘন্টা। ঘন্টা ধ্বনি করে মাকে নিজের উপস্থিতি জানাই। সান বাঁধানো উঠান। মন্দিরের শীর্ষদেশ প্যাগোডা আকৃতি। নাট মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে লোহার গেট।

গর্ভ মন্দিরে মাতা অনসূয়াদেবী এবং রৌপ্য নির্মিত মূর্তি। মূল মন্দিরের পশ্চাতে ভোগমন্দির। ভোগ মন্দির গাত্রে সংস্কৃত হরফে লেখা —

নম দৈব্যৈ মহা দৈব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।

নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাস্মতাম্।

ভোগমন্দির পশ্চাতে বহু প্রাচীন কালের একটি পাইন বৃক্ষ দেখতে পাই। বৃদ্ধ বৃক্ষটি জটাজুট সমাযুক্ত। মন্দির আঙ্গিনা থেকে চৌখাম্বা দৃশ্যমান। আঙিনার উচ্চতা ৬৫০০ ফুট। পাহাড়ের নাম কংচ পর্বত। লোকশ্রুতি পাণ্ডবগণ এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করেন। মন্দির গাত্রে বাইরের দেওয়ালে বভ্রু বাহনের মূর্তি দেখা যায়।

শ্রীমদভাগবতে অত্রিমুনি ও অনসূয়া সমন্ধে সুন্দর কাহিনী পাওয়া যায়। মাতা অনসূয়া দেবীর মন্দিরে তিনজন পূজারী। শ্রী শিলামনি সেমুয়েল, শ্রী দয়ানন্দজী সেমুয়েল ও শ্রী কৃষ্ণমনি সেমুয়েল। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে মায়ের পূজা ও ভোগ হয়। পূজারী সায়ংকালে মায়ের আরতি ও প্রসাদ নিবেদন করেন।

প্রতি বছর অঘ্রান মাসে চতুর্দশী ও পূর্ণমাসী তিথিতে দত্তাত্রেয় জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ঐ সময় মায়ের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়। ঐ সময় মায়ের মন্দিরে মেলা বসে।

আশেপাশের গ্রাম থেকে ভক্তপ্রাণ পাহাড়ী মানুষ মায়ের মন্দিরে পূজা দিতে আসে। অনেকেই এই মেলায় অংশগ্রহণ করে।

সত্যযুগে ঋষি অত্রি ছিলেন মহা তপস্বী। তিনি হিমালয়ের এই অঞ্চলে আসেন। মাতাকে আশ্রমে রেখে নিকটস্থ একটি গুহায় বসে তপস্যা করতেন।

মাতা আশ্রমে বসে সর্বদাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের উপাসনা করতেন। তাঁর ইচ্ছা এই সকল দেবতা পুত্ররূপে তাঁর ঘরে আসুক। দেবতা ভক্তের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন না, একদিন তিন দেবতা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আশ্রমে উপস্থিত। মায়ের নিষ্ঠা ও সতীত্বের পরীক্ষা মানসে মায়ের কোলে স্থান পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মা তিন অতিথিকে অনুরোধ জানিয়ে ঋষি অত্রির শরণাপন্ন হন। ঋষি তাঁর তপস্যা বারি মাকে প্রদান করেন। ঐ বারি তিন ব্রাহ্মণের দেহে ছিটিয়ে দিতে আদেশ করেন। মা ফিরে এসে ঋষির আদেশ পালন করেন।

—"শিশু ভব" মন্ত্রে তিন ব্রাহ্মণের মাথায় জল ছিটিয়ে দেন। তিন ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ শিশুরূপ ধারণ করেন। মাতা অনসূয়া তিন সদ্যজাত শিশুকে কোলে তুলে আদর করেন।

মাতা অনসূয়ার সতীত্বের নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হার মানেন।

কিভাবে যাবেন মাতার আশ্রমে ঃ ট্রেনে হরিদ্বার, ঋষিকেশ অথবা ডেরাদুন এসে নামুন। সেখান থেকে বাস, ট্যাক্সি অথবা জীপে নিকটস্থ শহর গোপেশ্বর, গুপ্তকাশী এবং উখিমঠ। গৌরীকুণ্ড থেকে উখিমঠ হয়ে বদ্রীনাথের পথে মণ্ডল। মণ্ডল থেকে ৫ কিমি হাঁটা পথে মায়ের মন্দির। মায়ের নামানুসারে এ স্থানের নাম, মাতা অনসূয়া।

কোথায় থাকবেন ঃ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হলেই তেওয়ারী লজের সাইনবোর্ড দেখা যায়। দোতলা কাঠের বাড়ি। সোজা পথে মন্দিরের তোরণ। বাঁ হাতি পথ গিয়েছে তেওয়ারী লজের উঠানে। গ্রামের ছেলে প্রকাশ, চাকরী না পেয়ে অর্থবান কাকার লজের দায়িত্ব নিয়েছে। লজের পর্যটন প্রিয়তা বৃদ্ধির দিকে তার যথেষ্ট লক্ষ। অনসূয়া দর্শনার্থীর থাকা, খাওয়া ও সেবার দিকে দায়িত্ব পালনে প্রকাশের কোনও ত্রুটি নেই। রন্ধনশালার দায়িত্ব নিয়েছে প্রকাশের স্ত্রী স্বয়ং। চা, জল গরম, দুধ গরম, ভাত, ডাল, রুটি, সবজি কোনটাই তার অজানা নয়।

গতকাল অনসূয়ায় এসে প্রকাশের লজে আশ্রয় নিই। প্রকাশের আদর, আপ্যায়ন, সব কিছুতেই আন্তরিকতা লক্ষ করেছি। আজ যাত্রাকালে সকলকে বিদায় জানাতে বেদনা অনুভব করি। প্রকাশের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে ফেরার পথে পা পাড়াই।

সকলের জয় হোক, মাতা অনসূয়াদেবীর জয় হোক।

অত্রিমুনি

মাতা অনসূয়ার কথা পূর্বেই লিখেছি। সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই মাতৃজাতির সম্মান সর্বাগ্রে। মাতাজীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পিতাজীর আঙ্গিনা। অনসূয়া মায়ের আঙ্গিনা থেকে ঋষির তপোস্থলী অনধিক ১ কিমি। অত্রিমুনির তপোস্থলীর আর এক নাম অমৃতকুণ্ড। যে গুহায় বসে ঋষি তপস্যা করতেন তার সম্মুখে অমৃতগঙ্গা লাফিয়ে নামে। নীচে পড়ে ঐ গঙ্গা এক কুণ্ডের আকৃতি নিয়েছে। তাই এর আর এক নাম অমৃতকুণ্ড।

হিমালয়ের সুগভীর অন্দর মহলে ঋষি অত্রির সাধন পীঠ। অপূর্ব এক গিরি-গুহা-কন্দরে তাঁর ধ্যানাসন। পথ মোটেই সুগম নয়। সাধারণের পক্ষে গুহায় প্রবেশ মোটেই সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতির দুর্গম ব্যবস্থাপনায় গুহাঙ্গন পরিবেষ্টিত। তপোস্থলীর সিংহদ্বারে দুলিগাড(নদীর নাম গাড) ও অমৃত গঙ্গা - প্রপাত সৈনিকের মত দণ্ডায়মান।

১৮ই মে, রবিবার, ২০০৩। ঋষির সাধন পীঠ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাতা অনসূয়া দেবীর আঙ্গিনায় পৌঁছাই। ঐ দিন অপরাহ্ণ বেলায় অত্রিমুনির সাধন পীঠের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাই।

অনসূয়া মাতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে অনসূয়া গ্রাম, সামান্য কয়েকটি পরিবারের বাস। বেশীর ভাগ পরিবার মন্দিরের পূজারী। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে বাঁ-হাতে সামান্য উপরে তেওয়ারী লজ। ওদের সাইনবোর্ড দেখে ওদের ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিই।

তেওয়ারী লজের সামনে দিয়ে অনসূয়াদেবীর মন্দিরকে ডান হাতে রেখে পথ গিয়েছে ঋষির তপোস্থলীতে। সুগভীর অরণ্যশোভিত পথ। কিছুটা গিয়ে পথ দ্বিধাবিভক্ত। উপরের পথে বাবা-রুদ্রনাথ ডানহাতি উৎরাই পথে ঋষি অত্রিমুনি। উৎরাই শেষ হয় না। সর্পিল গতিতে পথ নীচে নামতে থাকে। যত নামি পথের চেহারা ততই দুর্গম হয়। পথ গিয়ে দুলিগাডে বিলীন হয়। দুলিগাডের ধারা দ্বিধাবিভক্ত। দুলিগাডের বুকে একটির পর একটি গাছের গুঁড়ি

শায়িত। ঐ গুঁড়িতে পা রেখে সাবধানে পর পর দু-খানি ধারা পার হই। পূজারী সুরেশানন্দ তেওয়ারী (৭৮) ও সাথী মনবাহাদুর (১৮) পথ দেখায়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুরেশানন্দজী একদা শ্রদ্ধেয় অগ্রজ উমাপ্রসাদ মুখার্জীকেও পথ দেখিয়ে ছিলেন। সুরেশানন্দজীর কথায় হিমালয় পথিক উমাপ্রসাদ মুখার্জীর কথা মনের কোণে ভেসে ওঠে।

দুলিগাড পেরিয়ে সানান্য চড়াই অতিক্রম করে পূজারী জুতা ও পিঠের স্যাক নামিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। পাহাড়ে এমন নির্দেশে অকস্মাৎ অবাক হই। কারণটা প্রথমে বোধগম্য হয় না। কয়েক পা এগিয়ে কিছুটা বুঝতে পারি। পাহাড়ের গায়ে একটি লোহার শিকল দেখতে পাই। পূজারী ও মনবাহাদুর ঐ শিকলের সাহায্যে দেওয়ালের মাথায় ওঠে, আমিও অনুসরণ করি।

জুতা খোলার কারণ বুঝতে পারি। হাওয়াই চপ্পল ও ভারী জুতা পরে পাহাড়ের গা-বেয়ে ওঠা অসুবিধা। সেকারণেই জুতা খুলে রাখার নির্দেশ।

দেওয়ালের মাথায় দাঁড়িয়ে আরও মুস্কিল হয়। সম্মুখে উপর নীচে দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। বসা কিম্বা দাঁড়াবার উপায় নেই। শুয়ে শুয়ে, বুকে হেঁটে, সর্পিল গতিতে প্রায় দশ ফুট দীর্ঘ পথ পার হতে হয়।

প্রথমে পূজারী, তারপর মনবাহাদুর শেষে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে সর্পিল গতিতে দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে ঐ স্থানটুকু নির্বিঘ্নে পার হই। মাথা তুললে ওপরের পাথরে মাথা ঠেকে যায়। ডানদিকে তাকালে ভয় হয়, নীচে গভীর কুন্ড। পিছলে পড়লে অমৃত কুণ্ডের শীতল জলে আশ্রয় নিতে হবে। একবার শুয়ে পড়লে আর ভয় থাকে না। মনে হয় কে যেন ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঐ সংকীর্ণ স্থানটুকু পার হয়ে উঠে দাঁড়ানো যায়। কয়েক পা এগিয়ে বাঁ হাতে পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব সুন্দর গুহা, এটাই অত্রিমুনির তপোস্থলী।

গুহার সম্মুখে বাঁহাতে পাহাড়ের কোলে ঋষি অত্রিমুনির প্রস্তরময় মূর্তি। এ মূর্তি আধুনিক কালের। মূর্তির সম্মুখে রয়েছে ধূপকাঠি, চন্দন তিলক। পূজারী ঐ মূর্তির পূজা করেন। আমিও পূজারীর সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করি। পূজা অন্তে পূজারী কপালে তিলক পরিয়ে দেন। মনের গভীরে কি যেন অনুভব করি। হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য শিলামূর্তিতে নিবেদন করি। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়।

চোখদুটি মুছে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যাই।

পূজারীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যাই। সুবিশাল গুহার প্রবেশ দ্বারে এসে থমকে যাই। এটাই অত্রিমুনির তপোস্থলী। গুহার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মহা আনন্দে হৃদয় মন ভরে যায়। ডান হাতে পাহাড়ের মাথা থেকে অমৃতগঙ্গা লাফিয়ে নামে। অমৃত গঙ্গার সে রূপ বর্ণনার অতীত। কালবিলম্ব না করে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। অসাধারণ পরিবেশ। সুন্দর ভাবে রাত্রি যাপন করা যায়। ৪/৫ জন অনায়াসে শুতে পারে। গুহার কেন্দ্রস্থলে যজ্ঞ ভূমি। যজ্ঞের ভস্ম কপালে লাগিয়ে এক অনবদ্য আনন্দ লাভ করি। মনে আপনা থেকেই ধ্যানের ভাব জাগে। যে আসনে বসে ঋষি অত্রি ধ্যান করতেন সে আসন মহা জাগ্রত, পরম পবিত্র। তার সান্নিধ্য, তাঁর স্পর্শে ধন্য হয়ে যাই। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য না থাকলে এভূমির স্পর্শ হয় না। ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যাই। পূজারীর ডাকে জেগে উঠি। পূজারীর ডাকে সাড়া দিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই। বিনম্র চিত্তে ঋষিকে স্মরণ করি। প্রণতি জানাই।

কার্তিকস্বামী

দেবতার ঘরে জন্ম নিয়েও দেবতার সন্মান থেকে বঞ্চিত। কে সেই দেবকান্তি দৃষ্টি নন্দন দেব শিশু? - দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিভুনেশ্বর, যিনি সর্বত্র অর্চিত। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন যজ্ঞই সফল হয় না। অথচ তাঁরই জ্যেষ্ঠ নন্দন পরম যোদ্ধা সৌম্য দর্শন কার্তিকেয় মর্ত্যবাসীর পূজা থেকে বঞ্চিত । দেবতার আসনে তাঁর কোন ঠাঁই নেই। কোন গৃহেই গৃহদেবতা বা ইষ্ট দেবতার আসনে তাঁর কোন স্থান নেই। তারকারাক্ষসী বধের পর ক্রৌঞ্চ পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে যিনি স্থায়ী আসন পাতেন তিনিই কার্তিকস্বামী।

সত্যযুগে মহামায়া রাজা দক্ষ প্রজাপতির ঘরে কন্যা রূপে আবির্ভূতা হন। বাবা মা আদর করে নাম রাখেন সতী। শৈশব থেকেই সতী ছিলেন ভয়ঙ্কর জেদী ও তেজস্বিনী। বাবা মায়ের অমতে তিনি ভোলামহেশ্বরকে পতি রূপে বরণ করেন। রাজা দক্ষ কিছুতেই ভস্মমাখা ভোলামহেশ্বরকে রাজ-জামাতা হিসাবে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি নানা ভাবে মহেশ্বরকে অপমানিত করেন। স্বামীর অপমানে আহত সতী দেহ ত্যাগ করেন।

দ্বাপর যুগে মহামায়া হিমাচল রাজের ঘরে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিমাচল পর্বতের কন্যা তাই নাম হয় পার্বতী। বাবা মায়ের আদরের মেয়ে উমা। উমা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তেজরাশি দ্বারা সৃষ্টি, তাই তিনি মহা শক্তির আধার। তাঁর উপাস্য দেবতা শঙ্কর ভগবান। এখানেও তিনি পরমেশ্বরকে পতিরূপে বরণ করেন। তাই পরমেশ্বরী। শঙ্কর ভগবান মাকে জগন্মাতার আসনে বসিয়ে বিশ্বমায়ের সন্মান দেন। উমা দ্বাপরে শিবকে নিয়ে সংসার করতে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। সত্যযুগে যেটা সম্ভব হয়নি, দ্বাপরে সেটাই চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শিবপ্রাণা। শিবও মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। তিনিও মায়ের হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান।

পরমেশ্বরী পরমেশ্বরের নিকট সন্তান প্রার্থনা করেন। তাঁর যুক্তি সন্তানের মা না হলে বিশ্বমায়ের মর্যাদা তিনি কী করে রাখবেন?

বাবাও রাজি হন সর্ত সাপেক্ষে।

সন্তান পাবেন কিন্তু সন্তান পালনের দায়িত্ব পাবেন না। একজনের প্রতি মনোনিবেশ করলে জগতের প্রতি অবিচার হবে। নবজাতকের পালনের দায়িত্ব থাকবে সন্তানহীনা রমণীর উপর।

অপরদিকে সন্তানহীনা রমণিগণ সন্তান লাভের আশায় শঙ্কর ভগবানের শরণাপন্ন হন। তাঁদের প্রার্থনায় খুশি হয়ে শিবজী তাঁদের বর প্রদান করেন। শঙ্কর ভগবানের পুত্র সন্তানহীনা রমণিগণকে মা বলে ডাকবেন। কার্তিকের জন্মের মাধ্যমে সেই অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেন।

সেই কার্তিকস্বামী দর্শনের বাসনা নিয়ে উত্তরাঞ্চল রাজ্যের রুদ্রপ্রয়াগ জেলা শহরে হাজির হই, গত ৭ই মে, ২০০৩ সালে। কার্তিক স্বামী (৩০৪৮মি) রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবস্থিত।

কার্তিক স্বামী ছিলেন সুদর্শন ও যোদ্ধা। কথিত আছে তিনিই তারকাসুরকে বধ করেন। তারকাসুরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ক্রোঞ্চ। তারকাসুর বধের পর ক্রোঞ্চ কার্তিক স্বামীর তপস্যায় বসেন। কার্তিকজী ক্রোঞ্চের তপস্যায় খুশি হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সেনাপতি ক্রোঞ্চের প্রার্থনা, আপনি জগতের প্রভু অর্থাৎ স্বামী হয়ে আমার নিকটে থাকবেন। কার্তিকজী ক্রোঞ্চের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। সেই থেকে ঐ পর্বতের নাম হয় ক্রোঞ্চ পর্বত এবং কার্তিকজী কার্তিকস্বামী নাম নিয়ে ঐ পর্বতে অনাদিকাল থেকে পূজিত হয়ে আসছেন।

জেলা শহর 'রুদ্রপ্রয়াগ' থেকে পখরিগামী বাসে চেপে ৩৫ কিমি দূরে কনকচুরি এসে নামতে হয়। এ পথে বাস খুব কম! রুদ্রপ্রয়াগ থেকে প্রথম গাড়ি ছাড়ে সকাল ৮টায়, ডাকগাড়ী। সকাল ৮টায় ডাক গাড়ীতে চেপে কার্তিকস্বামী দর্শনে যাত্রা ৮ই মে, ২০০৩। হিমালয়ের পথে কুড়িয়ে পাওয়া এক সন্ন্যাসী স্বামী সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী আমার সফর সঙ্গী। এবার হিমালয় ভ্রমণে সচ্চিদানন্দকে পেয়েছি আপন করে আন্তরিক ভাবে। হিমালয়ের পথে কুড়িয়ে পাওয়া সঙ্গী হিমালয়ের মতই উদার ও অভ্রান্ত।

গতকাল রুদ্রপ্রয়াগে এসে কালীকম্‌লী ধর্মশালার নূতন বাড়ীতে আশ্রয় নিই। আজ সকালে অর্থাৎ ৮ই মে স্নান ও প্রাতঃকৃত সেরে হাঁটাপথে নূতন বাস

স্ট্যাণ্ডে আসি। স্ট্যাণ্ডে পখরিগামী বাসে উঠে সিট দখল করি। ছোট গাড়ী। গাড়ী ধীরে ধীরে ভরে যায়। অনেকেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্থানীয় যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়ে। সেতেরা খাল, মাইকুঠি, দুর্গাধার, চোপতা, খরপোতা, ঘিমতোলি, হয়ে গাড়ি আসে। পথে চোপতায় চা-পানের বিরতি টানে। চোপতা থেকে কনকচুরি ১৪ কিমি। চোপতায় চা- দুটাকা, সিঙ্গারা- দুটাকা, জিলাপি- ৫ টাকায় শতগ্রাম। বেলা ঠিক সাড়ে ১০ টায় গাড়ী এসে দাঁড়ায়, আমরাও নেমে পড়ি।

আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে যায় পখরির পথে। বাস থেকে যেখানে নামি সেখানেই দীনেশ নেগীর পোষাক ও ক্যামেরার দোকান। দোকানের সামনে দৈনিক 'জন জাগরণ' পত্রিকার সাইনবোর্ড। দীনেশের সাথে কথা বলে আনন্দ পাই। দীনেশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কার্তিকস্বামীর যাত্রী দেখলে ওরাও আনন্দ প্রকাশ করে। কার্তিকস্বামী দর্শনে বহিরাগত পর্যটকের সংখ্যা খুবই কম। স্থানীয় যাত্রীর সংখ্যাই বেশী। কার্তিকস্বামী স্থানীয় মানুষের আরাধ্য দেবতা। নিকট ও দূরের পাহাড়ী গ্রামের মানুষ সকলেই আসেন কার্তিকস্বামীর আশীর্বাদ নিতে। যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কার্তিকস্বামীর আশীর্বাদ অপরিহার্য্য। জমি থেকে যে কোন ফসল উঠলেই প্রথমে কার্তিকস্বামীকে নিবেদন। তারপর নিজেরা ভক্ষণ করেন।

আমাদের যাত্রা শুরু সকাল সাড়ে দশটা। দীনেশ নেগীর দোকান থেকে কয়েকপা এগিয়ে বাঁহাতি পায়ে চলা ট্রেকিং রুট। সামান্য চড়াই পথ। পূর্বেই বলেছি চার কিমি ট্রেক। অতি আরামদায়ক ছায়া সুশীতল পথ। পথের উভয় পার্শ্বে রডোডেনড্রন, ব্রাঁস, বুরাস ও নাম না জানা বৃক্ষসমুহ। দ্রুত পা চালিয়ে চলেছি। স্বামী সচ্চিদানন্দ ও রাজেন্দ্র সিং নেগী আজ আমার চলার পথের সাথী। রাজেন্দ্র সিং অবসর প্রাপ্ত সেনা বাহিনীর কর্মী। রাজেন্দ্র আমার মালবাহক ও পথ প্রদর্শক। কার্তিকস্বামীর দর্শনে চলেছি, তিনজনের মনেই আনন্দ। পথের সৌন্দর্যও অপরিসীম।

দেড় ঘন্টা পথ চলার পর আমরা একটা চত্বরে এসে উপস্থিত হই। চত্বরে দাঁড়িয়ে কার্তিকস্বামীর মন্দির দেখতে পাই। চত্বরে লক্ষ্মণ সিং নেগীর ছবির

দোকান। দোকানে পূজার সামগ্রীও বিক্রী হয়। ছবির দোকানের সাথে লক্ষ্মণ সিং চায়ের দোকানও করেছে। চায়ের সাথে সুস্বাদু সিদ্ধ ছোলাও পাওয়া যায়, পাঁচ টাকা ডিস্। চা-পান করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই। লক্ষ্মণ সিং নেগীর দোকান থেকে কার্তিকস্বামীর মন্দির অনধিক এক কিমি। লক্ষ্মণ সিং নেগীর দোকান থেকে মন্দিরের দিকে কিছুটা এগিয়ে পূজারীর আবাসন ও আবাসন সংলগ্ন সান বাঁধানো উঠান। উঠান পেরিয়ে আরও কিছুটা গিয়ে এক বাঙালী পরিবারের সাথে দেখা, সাথে কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী। সকলেই কার্তিকস্বামীর পূজা দিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। সকলেই ঘিমতোলির অধিবাসী। পশ্চিম বঙ্গের মূর্তি উজ্জ্বল বিশ্বাস, স্ত্রী বর্ণালী ও কন্যা অঞ্জলিকে নিয়ে ঘিমতোলিতে স্থায়ীভাবে সংসার পেতেছে। ঘিমতোলিতে সে একটি ঔষধের দোকান করেছে।

এখন গমের মরশুম, — নূতন গমে হবে নবান্ন। কার্তিকস্বামীকে নিবেদন করে তবেই নিজেদের সেবা।

সমতল শেষ করে চড়াই পথের শুরু। সান বাঁধানো পথ, ৭২টি ধাপ ভেঙ্গে মন্দির আঙ্গিনা। মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। মন্দির আঙ্গিনায় এসে পথের ক্লান্তি ভুলে যাই। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের গায়ে তুষার শুভ্র চৌখাম্বা, মদমহেশ্বর প্রভৃতি শৃঙ্গগুলি ছবির মতো দেখায়। মন্দির আঙ্গিনার সর্বত্র আধুনিকীকরণের চিহ্ন বর্তমান। সুপ্রশস্ত সান বাঁধানো গোলাকৃতি চাতাল। চাতালের মধ্যমণি "কার্তিক মহারাজ"। মন্দিরে অনেকেই এসেছেন পূজা দিতে, পূজারী সকলকেই পূজার মন্ত্র পাঠ করান। মন্ত্র পাঠের সাথে ঢাক, ঢোল, সানাই ইত্যাদিও চলেছে সমান তালে।

পূজা অন্তে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজারী শ্রী ফতেপুরীর সাথে কথা বলার সুযোগ পাই। পূজারী জানান প্রতিবছর জুন মাসে কার্তিকস্বামীতে বিরাট মেলা বসে। দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে বহু মানুষ মেলায় অংশগ্রহণ করে। পূজারীর মুখে স্কন্দপুরাণের কাহিনী শুনি। ত্রেতাযুগে কার্তিক মহারাজ শঙ্কর ভগবানের সৃষ্টি। দ্বাপরে মা গৌরীর নিজের হাতের সৃষ্টি গণেশজী। মা তাঁর শক্তি গণেশের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। ছোট ছেলে গণেশজী মায়ের বড় আদরের। গণেশ পূজা করলেই মা খুশি হন। সকল কাজে সিদ্ধি

লাভ হয়। তাই গণেশকে বলা হয় Lord of success। গণেশ শান্ত স্বভাবের। কার্তিক যোদ্ধা, সৈনিক। কার্তিক চিরকুমার।

বিশ্বকর্মার কন্যা ঋদ্ধি ও সিদ্ধির সাথে গণেশের বিবাহ হয়।

তারকাসুর বধের পর কার্তিকজী তপস্যায় বসেন। ক্রৌঞ্চ পর্বত কার্তিক স্বামীর তপোস্থলী। কার্তিকজী দীর্ঘ তপস্যায় প্রস্তর রূপ ধারণ করেন। পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে মন্দির।

উত্তরাঞ্চল সরকার কার্তিকস্বামীকে কেন্দ্র করে একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী দিনে কার্তিকস্বামীর আকর্ষণ আরও বাড়বে। কার্তিকস্বামী সাধারণ পর্যটকের নিকট তেমন পরিচিত নন। কার্তিকস্বামীতে আগত পর্যটকের সংখ্যা খুবই কম। কনকচুরি থেকে ক্রৌঞ্চ পর্বত পর্যন্ত চার কিমি ট্রেকিং পথের তুলনা নেই। পূর্বেই বলেছি অরণ্য শোভিত ছায়া সুশীতল পথ। সরকারী প্রচেষ্টায় সংস্কারের কাজ এগিয়ে চলেছে।

কিভাবে যাবেন ঃ কেদারনাথ - বদ্রীনাথের পথে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বাস অথবা জীপে কনকচুরি এসে নামুন। কনকচুরি থেকে ৪ কিমি পথ ট্রেক। পথে কোন দোকান বা লোকালয় নেই। জলের কোন উৎস নেই। চলার পথে পানীয় জল ও কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে অবশ্যই নেবেন। সঙ্গে বর্ষাতি নেবেন।

রুদ্রপ্রয়াগ ফেরার শেষ বাস বিকাল ৩টে। উপরে থাকার তেমন ব্যবস্থা নেই। রুদ্রপ্রয়াগ ফিরে আসাই উচিত হবে। কার্তিকস্বামীর দর্শন নিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে এসে রাত্রে বিশ্রাম।

নীলকণ্ঠ

বর্তমান যুগকে বলা হয় কলিযুগ। ভাগবতের কথায় এ যুগের মানুষের আয়ু কম, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি সব কিছুই সীমিত। অবিশ্বাস, হিংসা, প্রতিহিংসা, পরচর্চা প্রভৃতি দুষণ থেকে কলিযুগের মানুষ মুক্ত নয়। সব কিছুর ভাল মন্দ দুটি দিক আছে। এযুগে মন্দ দিকটাই আমরা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করি। জানার বা শোনার ধৈর্য আমাদের খুব কম। তবুও বেঁচে থাকার তাগিদে সব কিছুই জানতে হয়, শুনতে হয়।

এযুগের ভাল দিকটাও অনেক বেশী প্রশংসার দাবি রাখে। কলিযুগে মানুষ অতি অল্প সময়ে সফলতা অর্জন করে । এ যুগের মানুষ অনেক বেশী স্বাধীন। এযুগে অল্প দিনের সাধনা ও তপস্যায় মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। সমাজ জীবনে একজন নারীকে একাধিক পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হয়না। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের চাপে সমাজকে বিব্রত হতে হয়না। সকল নির্যাস থেকে সৃষ্টি 'শাস্ত্র'। শাস্ত্রে র অনুশাসন মেনে চললেই যথেষ্ট। এ যুগে গণতন্ত্র অনেক বেশী সক্রিয়। শাস্ত্রের অনুশাসনকে তোয়াক্কা না করে — মানুষ ইচ্ছামত সব কিছুই করতে পারে।

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে আমরা আনন্দ পাই। অতীতের সূত্র ধরে নূতন পথের সন্ধান পাই। অতীতকে পাথেয় করে নবদিগন্তের উন্মেষ হয়।

অনেক অনেক প্রাচীন কালের কথা। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা মহাসমূদ্রে জলমগ্ন ছিল। ভগবান বিষ্ণু সেই মহাসমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর নাভিদেশ থেকে নাল সমেত একটি পদ্ম উত্থিত হয়। ঐ পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন ভগবান ব্রহ্মা। নিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে উদ্ভূত মধু ও কৈটব নামে দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হন। তখন ব্রহ্মা কোনরূপ উপায় না দেখে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের ইচ্ছায় স্তব শুরু করেন। (শ্রীশ্রী চণ্ডী ১ম অধ্যায়)

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।। ১।৬৬

অর্দ্ধ মাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা।। ৬৭

এই সব কাহিনী বর্তমান যুগে রূপ কথা। আমাদের পূর্বপুরুষগণকে আমরা দেখিনি। তাঁদের কথা শুনেছি মাত্র। তাঁরাও কি রূপকথার কলাকুশলী? এই সব রূপকথাকে নির্ভর করেই ডুবুরিগণ মণিমানিক্যের সন্ধানে মহাসমুদ্রে ডুব দেয়। এসব কাহিনী রূপকথা হলেও একেই বিশ্বাস করে এগিয়ে যেতে হয়। সেই বিশ্বাসকে সম্বল করেই নূতন পথের সন্ধান মেলে। প্রাচীন তথ্যকে বিশ্বাস করেই নীলকন্ঠ মহাদেবের দুয়ারে হানা দিই।

কথিত আছে মহাপ্রলয় কালে দেবতা ও দানবগণ সমুদ্র মন্থন করেন। নাগবাসুকী ছিলেন রজ্জু। মন্থনের ফলে সমুদ্র থেকে প্রথমে হলাহল ও পরে অমৃত উত্থিত হয়। শঙ্কর ভগবান ঐ হলাহল পান করেন। ঐ হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তিনি নীলকন্ঠ হন। বিষের জ্বালা সকলকেই ভোগ করতে হয়। বিষের জ্বালায় শঙ্কর ভগবান অস্থিরতা অনুভব করেন। অনতিদুরে তিনটি বৃক্ষ দেখতে পান। ঐ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় তাঁর জ্বালা নির্বাপিত হয়। তিনি ধ্যানমগ্ন হন। ঐ তিনটি বৃক্ষ পিপুল, বহেড়া ও আম্র যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। ঐ তিনটি বৃক্ষ দেবতা জ্ঞানে আজিও পূজিত হয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে ৬০ হাজার বছর কেটে যায়। শঙ্কর ভগবান যখন ধ্যানমগ্ন তখন মাতা ভুবনেশ্বরী অন্য এক পাহাড়ে শঙ্করের উপাসনায় মগ্ন হন। শঙ্কর ভগবান ধ্যানে সবকিছুই উপলব্ধি করেন। তিনি মায়ের অভিপ্রায় জানতে চান। মায়ের একটাই ইচ্ছা তিনি ভোলা মহেশ্বরকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে যাবেন। মায়ের ইচ্ছা অনুসারে যাত্রাকালে শঙ্কর ভগবান তাঁর নীলবর্ণ কণ্ঠ হিমালয়ে রেখে যান। মা সেখানে পিণ্ড দান করেন।

পরবর্তীকালে ঐ বৃক্ষ তিনটিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে সুন্দর মন্দির। ঐ মন্দির নীলকন্ঠ নামে খ্যাত। গর্ভ মন্দিরে ভগবান শঙ্করের প্রস্তরময় কণ্ঠ। সান বাঁধানো উঠান, মন্দিরের বহিরঙ্গে শোভিত সমুদ্র মন্থনের ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা। উঠানের উভয় দিকে দেবতার পূজার সামগ্রী ও ছবির দোকান। পরিবেশ শান্ত, স্নিগ্ধ ও প্রাণময়। বাইরে পথের উভয় পার্শ্বে খাবার দোকান চা ও পাকৌড়া।

কিভাবে যাবেন ঃ- নীলকণ্ঠ পৌরী জেলায় অবস্থিত। ঋষিকেশ থেকে দূরত্ব ২২ কিমি। পিচ ঢালা পথে জীপ মেলে সর্বক্ষণ।

ঋষিকেশের পরপার স্বর্গাশ্রম। রামঝুলা পেরিয়ে স্বর্গাশ্রম শুরু। ব্রীজ পেরিয়ে ডানহাতে স্বর্গাশ্রমের সান বাঁধানো ঘাট। বাঁ হাতে কয়েক পা এগিয়ে পথ দ্বিধা বিভক্ত। ডান হাতে স্বর্গাশ্রম, গীতাভবন, পরমার্থ নিকেতন, বাজার এলাকা ইত্যাদি। সোজা পথে চুটিওয়ালা, স্টেষ্ট ব্যাঙ্ক, কালীকমলী ইত্যাদি। সামান্য এগিয়ে হোটেল রাজদীপের সামনে জীপ আড্ডা।

জীপ ছাড়ার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যাত্রী পেলেই জীপ ছাড়ে, ভাড়া জনাপ্রতি যাতায়াত ৭০ টাকা। এক পিঠের চল্লিশ টাকা।

স্বর্গাশ্রম থেকে লক্ষ্মণঝুলা পেরিয়ে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীর ধরে পিচ্‌ঢালা পথে জীপ ছোটে। বাঁ হাতে ভাগীরথী ডান হাতে পাহাড়। ১৭ কিমি গিয়ে পথ ডান হাতে ঘুরে যায়। ৫ কিমি পথে নীলকণ্ঠ ভ্যালী। বিষ্ণুকুট, ব্রহ্মকুট ও মণিকুট তিনটি চারণ ভূমির সমন্বয় ঘটেছে এখানে। অতীত যুগের মহাপ্রলয়ের স্মৃতি বুকে করে এখনও বেঁচে আছে। জীপ গিয়ে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ায়। একত্রিশটি সোপান ভেঙে নীচে নেমে গরম পাকৌড়ার দোকান। ডাইনে বাঁয়ে প্রসাদের দোকান ও ছবির দোকান। সাজানো পূজার ডালি নানা মূল্যে বিক্রয় হয়। । অতি চমৎকার ভাবে সাজানো। প্রতিটি ডালায় একটি শিবলিঙ , একটি বাঁধানো শঙ্কর ভগবানের মূর্তি, একটি পিতলের ত্রিশূল ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী। সামান্য এগিয়ে বাঁ হাতে শৌচালয়। কয়েকটি সোপান ভেঙ্গে মন্দির আঙ্গিনা। অতি চমৎকার পরিবেশ। তৃপ্তিতে মন ভরে যায়। কতযুগের সিদ্ধ পীঠ কেউ জানে না। তাদের যত্ন ও আধুনিক সংস্কারের ফলে নীলকণ্ঠ মহাদেব পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। থাকার জন্য মন্দির কমিটির ধর্মশালার ঘর মেলে। তবে অধিকাংশ যাত্রী ঋষিকেশ কিম্বা হরিদ্বারে ফিরে গিয়ে রাত্রিবাস করেন।

বুড়াকেদার

বুড়া অর্থাৎ প্রাচীন, অভিজ্ঞ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে দক্ষ ও বৃদ্ধ। কেদার শব্দের অর্থ হিমালয়ের দল দলে নরম জমি। যে সকল স্থানে শঙ্কর ভগবান সহজেই পাতালে প্রবেশ করেন।

বুড়া কেদার টেহরী গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত পঞ্চ পর্বতের পাদদেশে বালগঙ্গা ও ধর্মগঙ্গা সঙ্গমে অবস্থিত। সঙ্গমের অপর নাম ধর্মপ্রয়াগ। পঞ্চ পর্বতের নাম যথাক্রমে ১) ভৃগু পর্বত ২) সিদ্ধপীঠ ৩) মহাপীঠ ৪) স্বর্গারোহিণী ও ৫) উত্তরারোহিনী।

কথিত আছে রাজা দুর্যোধন পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে সঙ্গমে তর্পণ করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ শঙ্কর ভগবানের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় হিমালয় পরিভ্রমণ করেন। ভৃগু পর্বতে বালখিল্য ঋষির দর্শন পান। ঋষির পরামর্শ মত পাণ্ডবগণ সঙ্গমের তীরে আসেন। সেখানে এক প্রাচীন ব্যক্তির পরিবর্তে দীর্ঘদেহী শিবলিঙ্গের সাক্ষাৎ পান। ঋষির উপদেশ মত পাণ্ডবগণ ঐ শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করেন।

ঐ শিবলিঙ্গ কৃপাময় বুড়াকেদারের প্রস্তরময় রূপ। শঙ্কর ভগবান এইখানে পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ দর্শন দেন। পাণ্ডবদের প্রত্যেকের আলিঙ্গন গ্রহণ করেন। সুবৃহৎ লিঙ্গের গাত্রে আলিঙ্গনের চিহ্ন আজিও বর্তমান।

শিবলিঙ্গের সুবৃহৎ গাত্রে যে সকল মূর্তি আমি দেখেছি তার তালিকা এখানে তুলে দিলাম।

১ম ঃ ত্রিশূল, ডমরু ও ঝুলি হাতে ভগবান কেদারনাথজী।

২য় ঃ গণেশজী	৬ষ্ঠ ঃ যুধিষ্ঠির
৩য় ঃ মাতা পার্বতী	৭ম ঃ নকুলজী
৪র্থ ঃ দ্রৌপদী	৮ম ঃ সহদেবজী
৫ম ঃ নন্দীজী	৯ম ঃ অর্জুনজী
	১০ম ঃ ভীমজী

এমন প্রাণময় মূর্তি আমার নজরে দ্বিতীয়টি পড়েনি।

বর্তমান মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে দুঃখ পাই। মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গ্রাম। গ্রামের নাম বুড়াকেদার। অথচ বুড়া কেদারের তেমন আদর নেই। সংসারেও মানুষ বৃদ্ধ হলে তার আদর কমে যায়। উত্তরাঞ্চল সরকার মন্দির সংস্কারে ব্রতী হয়েছে। অনেক শ্রমিক সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছে। মন্দিরের সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শিল্পিগণ একটার পর একটা পাথর কেটে পাথরের স্তূপ বানিয়েছে।

পতিরাম মিস্ত্রি ও তার সহকর্মীদের সাথে কথা বলে খুবই ভাল লাগে। যে ভাবে কাজ এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় বুড়াবাবা শীঘ্রই তাঁর গৌরব ফিরে পাবেন। গর্ভ মন্দিরে শিব লিঙ্গের ডাইনে অপর মন্দিরে মাতা অষ্টভুজা দুর্গা মূর্তি। ডাইনে কালভৈরব, গরুড়জী ও সোমনাথের গদি। পূজারী প্রভুনাথ সাথে নিয়ে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে দেন।

দেবতার নামানুসারে গ্রামের নাম বুড়াকেদার। গ্রামে এখন পাঁচশত লোকের বাস। গ্রামে সবরকম দোকান আছে। STD Booth নজর কাড়ে। বাস স্ট্যাণ্ডের উপর পুরণ সিং এর খাবার ও চায়ের দোকান। থাকার জন্য নিম্ন মানের হোটেল ও লজ আছে।

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাল গঙ্গার বুকে লোহার পুল পেরিয়ে বুড়াকেদার গ্রাম। পথের বাঁ হাতে আব্দুল হাকিমের সবজির দোকান। দোকানের সামনে দিয়ে পথ গিয়েছে মন্দিরে। ডান হাতে কুন্দন সিং রাউতের দোকান। দোকানে সবকিছুই মেলে। জয়দীপ জেনারেল স্টোরের গায়ে STD Booth।

বুড়া কেদারের সাথে জেলা শহরের সড়ক পথে যোগাযোগ আছে। ঋষিকেশ থেকে প্রতিদিন সকাল ৯টায় বুড়াকেদারের বাস ছাড়ে। ঐ গাড়ী বিকাল ৫টায় বুড়াকেদার পৌছায়।

বুড়া কেদার মন্দিরে এখন দুইজন পূজারী। পূজারী প্রভুনাথজী ও পূজারী অমরনাথজী। বুড়াকেদার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী ধীরেন্দ্র নটিয়াল এর সাথেও আলাপ হয়।খুবই সজ্জন ব্যক্তি। গ্রামের উন্নয়নে তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। বুড়াকেদার থেকে বেলক ৭ কিমি হাঁটা পথ। বুড়াকেদার থেকে ভাটোয়ারী ২২ কিমি, উত্তরকাশী থেকে ভাটোয়ারী হয়ে, বেলক হয়ে বুড়াকেদার আসা যায়। এ

পথের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এ পথে জীপ চলাচল করবে। যানবাহনের সুবিধা হলে এ পথে অনেক পর্যটকের সমাগম হবে।

উত্তরাঞ্চল সরকারের শুভ প্রচেষ্টায় অনেক অজানা স্থানের উন্নয়ন হতে চলেছে। এই সকল শুভ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের জন্য উত্তরাঞ্চল সরকারকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না।

কিভাবে যাবেন ঃ ঋষিকেশ থেকে সরাসরি বাসে বুড়াকেদার আসতে পারেন। অথবা দেবপ্রয়াগ থেকে রিজার্ভ ট্যাক্সি নিয়ে বুড়াকেদার বেড়িয়ে নেওয়া যায়। এসব পথে রিজার্ভ গাড়ি থাকলে অনেক সুবিধা। আমি শ্রীনগরে হল্ট করি। শ্রীনগর থেকে রিজার্ভ গাড়ি নিই, ভাড়া ২৮০০ টাকা। একই দিনে চন্দ্রবদনী ও বুড়াকেদার দর্শন করে শ্রীনগরে ফিরে আসি। শ্রীনগর থেকে দেবপ্রয়াগ ৩২ কিমি। দেবপ্রয়াগ থেকে চন্দ্রবদনী ৩৫ কিমি। আমাদের গাড়ির চালক সুরেন্দ্র সিং। সুরেন্দ্রর মিষ্টি চেহারা ও মিষ্টি ব্যবহার মনে রাখার মতো। পথ-ঘাট ওর ভালই জানা।

কোথায় থাকবেন ঃ বুড়াকেদারে থাকার তেমন ব্যবস্থা নেই। নিজের পছন্দের জায়গায় ফিরে রাত্রি বাস করাই শ্রেয়।

কমলেশ্বর মহাদেব

গাড়োয়াল হিমালয় শিব ও পার্বতীর দেশ। বর্তমানে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালকে নিয়ে নূতন উত্তরাঞ্চল রাজ্য গঠিত হয়েছে। নব গঠিত রাজ্যে মোট বারোটি জেলা। দেরাদুন, পৌরী, রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলী, টেহরী, উত্তরকাশী নিয়ে গাড়োয়াল। নৈনিতাল, আলমোড়া, পিথোরাগড়, বাগেশ্বর, উধমসিং নগর ও চম্পাবতকে নিয়ে কুমায়ুন।

অলোকানন্দার তীরে প্রাচীন গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল শ্রীনগর। রাজধানীর গৌরব না থাকলেও শিক্ষা সংস্কৃতির ঐতিহ্য এখনও শ্রীনগরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পৌরী জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর জেলার প্রাণকেন্দ্র। কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির শ্রীনগর।

শ্রীনগর প্রশাসনিক ভবন পেরিয়ে শ্রীনগর হেমবতী নন্দীন বহুগুনা গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক তার পাশেই কমলেশ্বর মন্দিরের সুউচ্চ প্রবেশ দ্বার। প্রবেশদ্বার ভেদ করে সোজা পথ এগিয়ে গেছে মন্দির আঙ্গিনায়। অলোকানন্দার তীরে মন্দিরের অবস্থিতি।

ত্রেতাযুগের কথা, স্বয়ং রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য এইখানে বসে শঙ্কর ভগবানের তপস্যা করেছিলেন। তিনি শিবজীকে ১০৮ টি পদ্মফুল প্রদানের সংকল্প গ্রহণ করেন। শিবজী শ্রী রামচন্দ্রের নিষ্ঠার পরীক্ষা করেন। তিনি একটি পদ্মফুল লুকিয়ে রাখেন। রামচন্দ্র সংকল্পের একটি পদ্ম না পেয়ে তার চোখের মণি উপড়ে সংকল্প পূরণ করেন। শঙ্কর ভগবান রামচন্দ্রের নিষ্ঠায় প্রীত হয়ে তাকে মৃত্যুবাণ উপহার দেন। সেই থেকে রামচন্দ্রের নাম হয় "কমল নয়ন" রামচন্দ্র শিবজীর মূর্তি তৈরী করেন। নাম রাখেন কমলেশ্বর মহাদেব।

বর্তমানে মন্দিরের গর্ভগৃহে কমলেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ মূর্তি। সম্মুখে কার্তিকজী ও গণেশজী। পাশেই মাতা পার্বতীর মূর্তি। বাহিরে সুবৃহৎ নন্দী মহারাজ।

স্থানীয় মানুষের নিকট কমলেশ্বর মহাদেব খুবই জাগ্রত। প্রতিদিন ভক্তপ্রাণ রমণিগণ এসে বাবার মাথায় জল সিঞ্চন করেন। মন্দিরের একপ্রান্তে সর্বক্ষণ

অখণ্ড জ্যোতি প্রজ্বলিত। সকলেই প্রদীপে তেল ও সলতে প্রদান করেন।

কমলেশ্বর মন্দিরের পূজারী শ্রী আশুতোষ পুরী। সুদর্শন পূজারীর মিষ্টি ব্যবহার। তার কথা, একমাত্র কমলেশ্বর মন্দিরে গণেশজী পদ্মাসনে উপবিষ্ট।

মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ নন্দী মহারাজ অষ্ট ধাতুর তৈরী। শুধু তাই নয় ১৯১২ সালে মন্দিরের ভোগ রান্নার সুবৃহৎ হাণ্ডাটি অষ্টধাতু দিয়ে তৈরী হয়। ৪০ কেজি রৌপ্য দিয়ে নির্মিত অনিন্দ্য সুন্দর মহাদেব মূর্তি অন্দর মহলে সুরক্ষিত থাকে। কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষ, চতুর্দশী তিথিতে বাবার উৎসব হয়। ঐ দিন সকলেই ঐ মূর্তির দর্শন লাভ করেন।

সত্যযুগে কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ভগবান বিষ্ণু চক্র লাভ করেন।

কলিযুগে সন্তানহীন রমণিগণ সন্তান লাভের আশায় কমলেশ্বর মন্দিরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে সারারাত প্রদীপ জ্বেলে শঙ্কর ভগবানের উপাসনা করেন।

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রজী রাবণ বধের জন্য শঙ্কর ভগবানের তপস্যা করেন। শিবজী সন্তুষ্ট হয়ে মৃত্যুবাণ প্রদান করেন।

পরম পিতা ছিলেন আত্মভোলা। তাই তার এক নাম ভোলামহেশ্বর। তাঁকে ডাকলে তিনি অতি সহজেই সাড়া দেন। সন্তানহীনা মায়েরা কার্তিকের নত সন্তান পেয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসকে মাথায় নিয়ে আজও উক্ত তিথিতে কমলেশ্বর মন্দিরে উৎসব পালিত হয়। মেয়েরা সন্তান লাভের জন্য সারারাত প্রদীপ জ্বেলে শিবের পূজা করেন।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার কিম্বা ঋষিকেশ থেকে বাস, ট্যাক্সি, অথবা জীপে শ্রীনগর। শ্রীনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে মন্দিরের অবস্থিতি। থাকার জন্য শ্রীনগরে হোটেল, লজ, ধর্মশালার কোন অভাব নেই।

কোথায় থাকবেন ঃ কালীকমলী ধর্মশালা, GMVN' Tourist Lodge, Private Hotel & Lodges.

গুপ্তকাশী

আমরা চার কাশীর নাম শুনেছি। অনেকের ভাগ্যেই চার কাশী দর্শনের সুযোগ ঘটেছে। কাশী, ব্যাসকাশী, উত্তরকাশী ও গুপ্তকাশী। আমিও তিন কাশী গিয়েছি অনেকবার। একজনের কথা বলতে গেলে অপর দুই জনের কথা বলা দরকার। কাশীর আর এক নাম বারাণসী।

বারাণসী / কাশী প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষা সংস্কৃতির পথিকৃৎ। অধ্যাত্ম সাধনা ও হিন্দু ধর্মের রূপকার। আকাশে বাতাসে ও প্রতিটি ধূলিকণায় বাবা বিশ্বনাথ (শঙ্কর ভগবান) এবং মা অন্নপূর্ণার (পরমেশ্বরী) প্রভাবে সঞ্জীবিত।

উত্তরকাশী এবং গুপ্তকাশী উত্তরাঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তরকাশী জেলা সদর শহর। গঙ্গোত্রী ও গোমুখের পথে সকলকেই উত্তরকাশী হয়ে যেতে হয়। পর্যটন প্রিয় হিমালয় প্রেমী মানুষের কাছে উত্তরকাশীর অবদানের কোন তুলনা নেই। হিমালয় দর্শন ১ম খণ্ডে উত্তরকাশী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উত্তরকাশীতে বাবা বিশ্বনাথ ত্রিশূল ফেলে মহিষ রূপ নিয়ে পালিয়ে যান। উত্তরকাশী মন্দিরে বাবার ত্রিশূল একটি দর্শনীয় বস্তু। ত্রিশূল নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক।

আমাদের আলোচ্য বিষয় গুপ্তকাশী। হরিদ্বার কিম্বা ঋষিকেশ থেকে কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশী। গুপ্তকাশীর জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল অতি চমৎকার। বহু বহু প্রাচীন কালের কথা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের দর্শন দিতে অনিচ্ছুক মহাদেব গুপ্তকাশীতে এসে আত্মগোপন করেন। গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে শঙ্কর ভগবানের লিঙ্গ মূর্তি। বিশ্বনাথ মন্দিরের বামে অর্ধ নরেশ্বর মন্দির। বিশ্বনাথ মন্দিরের সম্মুখে মণিকর্ণিকা কুণ্ড। শঙ্কর ভগবানকে দেখতে না পেয়ে মাতা পার্বতী খুবই চিন্তিত হন। পার্বতীর অহেতুক বেদনার লাঘব ঘটাতে বাবা বিশ্বনাথ অর্থাৎ মহাদেব অর্দ্ধনরেশ্বর রূপ নিয়ে পার্বতীর সম্মুখে আর্বিভূতহন। গুপ্তকাশীর মন্দিরে মহাদেবের শুভ্র প্রস্তরময় মূর্তির কোন

তুলনা নেই। ডাইনে বাবা বিশ্বনাথ বামে মাতা পার্বতী।

একদিকে নন্দী মহারাজ, অপর দিকে সিংহ মহারাজ। একই আঙ্গিনার পাশাপাশি দুইটি মন্দির। সান বাঁধানো আঙ্গিনা। আঙ্গিনায় মণিকার্ণিকা কুণ্ড। কুণ্ডে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম। গোমুখ থেকে আগতা গঙ্গা যমুনা। গঙ্গা ধাতু নির্মিত গরুর মুখ দিয়ে নির্গতা, যমুনা হস্তীমুখ নিয়ে নির্গতা। উভয়ের জলই পানীয় রূপে ব্যবহৃত।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বাঁ হাতে সবজি মণ্ডির পাশ দিয়ে পথ গিয়েছে মন্দির আঙিনায়। মন্দির সংলগ্ন নবনির্মিত ধর্মশালায় রাত্রিবাস করা যায়। গুপ্তকাশী এখন গৌরীকুন্ডের প্রবেশ দ্বার। গুপ্তকাশী থেকে সর্বদাই গৌরীকুণ্ডের পথে জীপ বা ট্যাক্সি মেলে। অনেকেই কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশীতে যাত্রার বিরতি টানে। গুপ্তকাশীতে থাকার জন্য হোটেল, লজ ও ধর্মশালা আছে। গুপ্তকাশী থেকে উখিমঠ, কালীমঠ, কোটিমায়েশ্বরী, রুচ্ মহাদেব, গৌরীকুণ্ড যাতায়াতের জন্য সর্বদাই জীপ মেলে।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার কিম্বা ঋষিকেশ থেকে গৌরীকুণ্ডগামী যে কোন বাসে চেপে গুপ্তকাশী এসে নামতে হয়।

কোথায় থাকবেন ঃ দুই একদিন বিশ্রামের পক্ষে গুপ্তকাশীর কোন তুলনা নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম। রাত্রিবাসের জন্য পাঞ্জাব সিন্ধ্ ও Frontier Lodge- এর ব্যবস্থা চমৎকার।

কখন যাবেনঃ সারা বছর গুপ্তকাশীর দ্বার পর্যটকের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

প্রাচীন পথে কেদারনাথ

১লা মে, ২০০৩। কেদারনাথের ডুলিযাত্রায় অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উখিমঠে এসে উপস্থিত হই। পরদিন অর্থাৎ ২রা মে ডুলিযাত্রায় অংশ নিয়ে গুপ্তকাশী হয়ে কালীমঠ যাই। প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত কালীমঠ। ৮২ বছরের বর্তমান মঠাধীশ শ্রী নারায়ণ সিং রানাকে চিনতে ভুল হয় না। ২০ বছর পূর্বের তরুণ পূজারী রমেশ চন্দ্র ভট্ এখন মন্দিরের প্রধান পূজারী। পূজারীর স্মৃতির দর্পণে আমাকে চিনতে ভুল করেন না। দীর্ঘদিন পর আত্মীয় প্রাপ্তির আনন্দে পূজারীজী আমাকে বুকে টেনে নেন। কালীমঠের আঙ্গিনায় মায়ের বুকে সন্তানের আলিঙ্গন। এসবই মহামায়ার পরম করুণার প্রতিফলন মাত্র। মঠাধীশ চা-পানে আপ্যায়ন করেন। পূজারী ঘরে নিয়ে মিষ্টি মুখ করান।

পূজারীজী কালীমঠ দর্শনের পর কোটিমায়েশ্বরী ও রুচ্ মহাদেবের দর্শনের পরামর্শ দেন। কালীমঠ থেকে কোটমা ৫ কিমি। সর্বদাই জীপ মেলে এপথে। কোটমা থেকে দেড় কিমি হাঁটা পথে মায়ের আঙ্গিনা। সেই মুহূর্তে হৃদয়ে আকর্ষণ অনুভব করি। কালীমঠ থেকে ছুটে যাই কোটমা। কোটমা পাহাড়ি জনপদ। জীপ স্টেশনে একটি মাত্র চায়ের দোকান। দোকানে মনিহারি জিনিষপত্রও মেলে। জীপ থেকে নেমে লালাজীর নিকট কোটিমায়েশ্বরী ও রুচ্‌মহাদেবের পথ আর একবার জেনে নিই। লালাজীর কথায় সোজা গেলেই মায়ের মন্দির দেখা যায়। এটাই কেদারনাথের প্রাচীন পথ। পাণ্ডবগণ এপথেই গিয়েছিলেন কেদারখণ্ডে। সে পথ এখন পরিত্যক্ত। ও পথে কেদারনাথে পৌছাতে ২/৩ দিন সময় লাগে।

কালবিলম্ব না করে বাবা ও মায়ের প্রাচীন আঙ্গিনার দিকে অগ্রসর হই। সুন্দর পথ, মাঝে মাঝে জীপ চলে এ পথে। কতদূর জীপ যায়? মানুষ যায় না কেন এ পথে? কি আছে এ পথে? কত দিন সময় লাগে? ইত্যাদি প্রশ্ন মানের গভীরে দানা বাঁধে।

সামান্য পথ গিয়েই ডান হাতে পাহাড়ের গায়ে সুগভীর অরণ্যে ঘেরা

এক অনাড়ম্বর মন্দির দেখতে পাই। মনের গভীরে আনন্দ অনুভব করি। আরও কিছুটা গিয়ে রাস্তার উপর এক লালাজীর দোকান দেখি। ঘড়িতে বেলা ১টা। সহৃদয় লালাজীর সুপরামর্শে মনেও শান্তি পাই। সেই মুহূর্তে মন্দিরের পূজারী বৃদ্ধ বাচ্চিরাম ভট্ উপস্থিত। লালাজীর পরামর্শ মত পূজারী পূজার সামগ্রী নিয়ে আমাকে সঙ্গদান করেন। লালাজীর দোকান থেকে অনধিক ১ কিমি দূরত্বে মন্দিরের অবস্থান।

এ অঞ্চলে কোটিমায়েশ্বরী ও রুচ্ মহাদেব মানুষের অন্তরে খুবই জাগ্রত দেবতা। মায়ের পূজা ও বাবার মাথায় জল দিয়ে আমিও প্রাচীন পথে অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবদের চরণ স্পর্শে পবিত্র পথে বাবা কেদারনাথ দর্শনের সংকল্প গ্রহণ করি। এটা আমার স্বপ্ন নয়, এটা আমার জেদ।

সেই দিনই লালাজীর দোকানে বসে প্রাচীন পথে কেদার যাত্রার সংকল্পের কথা ঘোষণা করি। লালাজী সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। স্থায়ী বেস ক্যাম্প স্থাপনের জন্য লালাজীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। লালাজী অব্যবহৃত ঘরটি দিতে রাজি হন। অর্থাৎ ঘরের ভাড়া বাবদ ফেরার খরচটুকু রেখে বাকী অর্থ লালাজীর হাতে তুলে দেই।

মধুগঙ্গা ও সরস্বতী গঙ্গার সঙ্গমে, কোটিমায়েশ্বরী ও রুচ্ মহাদেবের পবিত্র আঙ্গিনায়, অরণ্য শোভিত হিমালয়ের নির্জন কোলে স্থাপিত হয় প্রাচীন পথে কেদারনাথ যাত্রাব বেসক্যাম্প।

বেসক্যাম্প—দেউলী

কলকাতায় ফিরে মনটা বড়ই চঞ্চল হয়। কলকাতার বাড়িতে কিছুতেই মন বসাতে পারি না। ইতিমধ্যে বর্ষা এসে যায়। সেপ্টেম্বরে রূপকুন্ড দর্শনে যাই। রূপকুন্ড থেকে কলকাতায় ফিরে চিন্তা আরও বেড়ে যায়। শীত এসে গেলে এবছরে আর গাড়োয়ালে যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং যা করার অক্টোবরের মধ্যেই করে ফেলা উচিত। মা ভৈঃ বলে ৭ই অক্টোবর ডুন এক্সপ্রেসে রিজারভেশন করে নিই। অবশ্য ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টার মাষ্টারের কোনই আপত্তি ছিল না। বরং তাদের দিক থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। তাদের

উৎসাহ না পেলে আমার পঞ্চ পাণ্ডবের পথে কেদার দর্শন হত না।

৭ই অক্টোবর ২০০৩ পঞ্চপাণ্ডবের পথে কেদারনাথ যাত্রা। হাওড়া স্টেশনে বিদায় জানাতে আসে কোয়ার্টারমাষ্টার ও রানা। ট্রেন ছাড়তে অধিক বিলম্ব হয়। কোয়ার্টারমাষ্টার বুড়ো মানুষের জন্য অধিক দুঃশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফেরে।

১০ই অক্টোবর অপরাহ্ন বেলায় প্রাচীন পথে কেদারনাথ যাত্রার বেস ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হই। লালাজী শুকদেব এবং উপস্থিত সকলের উষ্ণ অভ্যর্থনায় ধন্য হই। স্থানীয় যুবক প্রকাশ ও লালাজীর পুত্র রাজ এসে স্বাগত জানায়। মুহূর্তে পঞ্চপাণ্ডবের পথে কেদারনাথ যাত্রার খবর ছড়িয়ে পড়ে। পথের অভিজ্ঞ গাইড রচপাল সিং ও মহিপাল এসে অভিনন্দন জানায়। রচপাল যাত্রার সকল দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। রচপাল ও মহিপাল দুজনেই আমার পথ সঙ্গী হবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ওদের পেয়ে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করি।

রচপাল পূর্ব পরিচিত। বেসক্যাম্প স্থাপনের পরই রচপালের সাথে কথা হয়। রচপাল তরুণ, সাহসী ও নির্ভরশীল যুবক। মহিপাল মিতভাষী ও সেবাপরায়ণ যুবক। আমার সকল চিন্তা দুজনে ভাগ করে নেয়। গ্রামের প্রথানুসারে শনিবার যাত্রা নিষেধ। রবিবার অর্থাৎ ১২ই অক্টোবর যাত্রার দিন ধার্য হয়।

১২ই অক্টোবর ২০০৩। শুভমুহূর্তে শুভ যাত্রা। রচ্‌পাল মহিপাল যথা সময়ে এসে হাজির। মালপত্র দুজনে ভাগ করে নেয়।

শুকদেব সিং, গুরুং সিং লালাজী, পূজারীজী সকলেই জয় কেদারনাথজী, জয় পঞ্চপাণ্ডব ধ্বনি দিয়ে যাত্রার শুভ সূচনা করে। ঘড়িতে সকাল সাড়ে ৭টা।

রচ্‌পাল সামনে, আমি মাঝে, মহিপাল পশ্চাতে। পঞ্চপাণ্ডবদের পথে তিন পাণ্ডব এগিয়ে চলে। বেসক্যাম্প ছাড়িয়ে বাঁ-হাতে জলের ধারা। সামান্য কয়েক পা এগিয়ে বাঁ-হাতে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ চলার চিহ্ন। জীপ রাস্তাকে বিদায় জানিয়ে পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠতে থাকি।

অক্টোবর মাস প্রকৃতি স্বচ্ছ, নির্মল, হাস্যোজ্বল। হেমন্তের হৈমন্তিক স্নিগ্ধতায় ধরণী প্রাণময় রূপময়। পাহাড়ি জনপদের বুক চিড়ে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে রচ্‌পালের পিছনে এগিয়ে চলেছি। রচ্‌পালের কথায় এপথে

৩/৪ কিমি পথ কমে যাবে। অপূর্ব ট্রেকিং ট্রাক। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই, আবার মাঝে মাঝে রক ক্লাইম্বিং করে চলতে হচ্ছে। জালতল্লা, জালমল্লা, দুটি গ্রাম অনেক পিছনে ফেলে এসেছি।

একটা চড়াই শেষ করে একটা অপরিসর সমতল প্রান্তর পাই। ছোট্ট একটি খেলার মাঠ। সামান্য নীচে একটা লম্বা টিনের ঘর দেখি। রচ্‌পাল জানায় ওটি জুনিয়র হাই স্কুল। জলমাল্লা, তল্লা, চিলোন, চৌমাসি প্রভৃতি গ্রামের ছেলেমেয়ে এই স্কুলেই পড়তে আসে। স্কুল বাড়িটি পাথর সাজিয়ে তৈরী উপরে টিনের ছাদ।

সকাল সাড়ে ৭টায় বেসক্যাম্প ছেড়েছি। ঘড়িতে সাড়ে ৮টা। এক ঘন্টা পাকদন্ডির পথে হেঁটেছি। খেলার মাঠ ডান হাতে রেখে পাহাড়ের মাথায় উঠে যাই। মাঝে মাঝে পাকা বাড়ি দেখতে পাই। রচ্‌পাল জানায় গ্রামের নাম জাল-তল্লা। লালাজীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে এই গ্রামে। লালাজী রচ্‌পালের হাতে মেয়ের জন্য চিনি পাঠায়। আমার সাথে মেয়ের পরিচয় হয়নি। রচ্‌পাল মেয়েকে ডেকে চিনির প্যাকেট হাতে দেয়। মেয়ে রচপালের মুখে আমার কথা শুনে আন্তরিকভাবে গৃহে আহ্বান জানায়। ট্রেকিং পথ। এমন অভ্যর্থনা পাব ভাবতেই পারিনি।

মেয়ের বাড়ি ডান হাতে রেখে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে যাই। কিছুটা গিয়ে পথ গিয়ে জীপ রাস্তায় মেশে। নূতন পথ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। এ পথে জীপ আসতে কতদিন লাগবে সেটা কেউ বলতে পারে না। যারা কোনদিন শহরে যায়নি, যারা জীপ গাড়ি দেখেনি—তাদের গ্রামে পাহাড় কেটে রাস্তা হয়েছে, গ্রামে জীপ গাড়ি আসবে। তারা শহরের মানুষ হবে-এসব তাদের স্বপ্ন।

নূতন তৈরি পথে শুধুই বোল্ডার, পথ চলা খুবই কষ্টসাধ্য। কিছুটা চলার পর তুষার শুভ্র পর্বত শৃঙ্গ দেখতে পাই। ঐ শৃঙ্গকে সামনে নিয়ে চলেছি। এখন আর সুন্দর পথ নেই। পথের চেহারা মোটেই ভাল নয়। প্রথম অবস্থায় যা হয় - পাথরে বোল্ডারে ভাঙা পাহাড়ের গা বেয়ে পথ চলাই শক্ত। ঘড়িতে সাড়ে ৯টা। লোয়ার চৌমাসি গ্রামের প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছাই। গ্রামের প্রবেশের পূর্বেই নূতন রাস্তা শেষ। সকাল থেকে আমরা সময়ের হিসাব মত ৬ কিমি পথ

অতিক্রম করেছি।

আমরা এখন যে পথে চলেছি সেখান থেকে গ্রামের বাড়িঘর অনেকটাই উপরে। গ্রামে বাড়ি ঘরের সংখ্যা অতি অল্প। দেখতে দেখতে একটা বাড়ির উঠানে চলে আসি। উঠানে রামদানা, সোয়াবিন, রাজমা দেখে ভালো লাগে। যে দিকে তাকাই শুধুই কাঁচালঙ্কা ও মিষ্টি কুমড়ো দেখতে পাই। ঠিক যেন মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কাঁচা সবজি, পাকা সবজি কোন কিছুর অভাব নেই গ্রামে। শুধু অভাব অর্থের। চৌমাসিতে আলুর ফলন খুব বেশী।

রাস্তাঘাট না থাকায় গাড়ি ঘোড়ার কোন চলন নেই। এক মাত্র ঘোড়ার পিঠে অথবা মানুষের পিঠে মালপত্র যায় শহরে। গ্রামে কোন দোকানপাট নজরে পড়ে না। পশুপালন অন্যতম উপজীবিকা। গ্রামের শেষে একমাত্র মন্দির 'জাগ'। জুলাই-অগাষ্ট মাসে সেখানে মেলা বসে। বছরে অন্য সময় প্রদীপ জ্বলে না। মন্দিরের নিকটে এসে রচ্পাল ও মহিপাল পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেয়।

মন্দির পেরিয়ে চড়াই পথ। পাহাড়ের মাথায় উঠে আবার নীচে নামি। সামান্য এগিয়ে নির্মিত সিমেন্টের সেতু। সেতু পেরিয়ে চড়াই পথে সামান্য এগিয়ে গিয়ে তারপর চৌমাসি। গ্রামের প্রথম বাড়িটি গ্রামের প্রধানের। প্রধানের দেখা না পেলেও প্রধানের মায়ের দেখা পাই। মায়ের মুখে প্রধানের নাম শুনি। নন্দন সিং। মা কৌশল্যা দেবীর ব্যবহার অতি চমৎকার। ঘরে বসিয়ে চা-পানের অনুরোধ করেন। উঠানে রামদানা দেখি। কিছুটা রামদানা উপহার দেন। আমি নাতি-নাতনিদের হাতে লজেন্স দিয়ে এগিয়ে যাই।

গ্রামের শেষে জগত সিংয়ের বাড়ি, গ্রামের কম বেশী ১০০ জন লোকের বাস। গ্রামের উচ্চতা কম বেশী ৬,০০০ ফুট। জগত সিং-এর বাড়ি পেরিয়ে উৎরাই পথে গ্রামের শেষ সীমায় নেমে আসি। শেষ সীমায় শের সিংয়ের দোতলা বাড়ি। শের সিং বাড়িতে সোলার লাইট বসিয়েছে। চাষবাস ও পশুপালন গ্রামের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। রচ্পাল শের সিংয়ের বাড়ি থেকে পথের জন্য কিছুটা আলু সংগ্রহ করে। চৌমাসিতে প্রতি বাড়িতেই আলুর চাষ। শের সিং জমি থেকে আলু তুলে আনে।

আর চৌমাসির কথা নয়। পথের কথায় ফিরে আসি। চৌমাসির পর

থেকেই শুরু হয় জঙ্গলের পথ, চৌমাসি থেকে ২০ মিনিট পথ চলেছি। ঘড়িতে ১১-২০ মিঃ। সুন্দর বুগিয়াল পেয়ে রচ্‌পাল পিঠের বোঝা নামায়। স্থানের নাম "খুরমু"।

রচ্‌পাল মধ্যাহ্ন আহারের জন্য রুটি ও আখের গুড় সঙ্গে এনেছে। মহিপাল ও রচ্‌পাল মধ্যাহ্ন আহার সেরে নেয়। আমিও আপেল খেয়ে Lunch সেরে নিই। খুরমুর পরিবেশ অতি চমৎকার। চারিদিকে জঙ্গলের প্রাচীর। মাঝখানে বুগিয়াল। বুগিয়ালে সুউচ্চ বৃক্ষ সমূহ। মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্যকিরণ ছায়া বিস্তার করে। চতুর্দিকে অসংখ্য রডডেনড্রন। নির্জন প্রকৃতির বুকে তিন অনাহুত পর্যটকের আগমনে হয়তো বনদেবীর নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

রচ্‌পাল অধিক সময় দিতে মোটেই রাজি নয়। আহার সেরে নিয়ে মালের বোঝা পিঠে তুলে নেয়, আবার চলা শুরু।

পথ বেশ চড়াই। সুগভীর অরণ্য শোভিত পথ। বনের গভীরতায় সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। এ পথে কোন মনুষ্য প্রাণী আসে কিনা আমার জানা নেই। দীর্ঘদিন পর মানুষের সাড়া পেয়ে বনের বনবাসী সকল ছুটে পালায়। পথ ক্রমশ উচুর দিকে ওঠে। চড়াই পথে উপরে উঠতে উঠতে এক নার্শারি পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়াই। নার্শারি ক্লাইম্ব করেছি দীর্ঘদিন পূর্বে। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নার্শারী রক অতিক্রম করি।

সুগভীর অরণ্যময় প্রকৃতি। মধ্যাহ্নে উজ্জ্বল প্রকৃতির বুকে বিন্দুমাত্র সূর্য-রশ্মি প্রবেশ করে না। দীর্ঘদিন পর অভ্যস্ত জীবনে অনভ্যস্ত অতিথির আগমনে বনবাসী অসংখ্য বানর সপরিবারে দলে দলে ছুটে পালায়।

ক্রমাগত চড়াই পথে এগিয়ে চলেছি। সুগভীর নীরবতায় জঙ্গলের প্রাচীর ভেদ করে নদীর গর্জন কানে আসে। রচ্‌পালের কথায় "খাম নদী"। খাম গ্লেসিয়ার থেকে নেমে এসেছে। যাকে আমরা এতদিন মধুগঙ্গা বলে সম্বোধন করে থাকি।

প্রচণ্ড চড়াই অতিক্রম করে অপরিসর সুন্দর একটি বুগিয়ালে এসে দাঁড়াই। স্থানের নাম কালাচৌরী। রৌদ্র ঝলমল প্রকৃতি। ২ কিমি এসেছি।

পথের চেহারা মোটেই ভাল নয়। উপলখন্ড বিছানো পথ। সুন্দর বুগিয়াল থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে ঐ পথেই উঠতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হই, মনে

হয় এযেন অসভ্যের মত চড়াই।

প্রচন্ড চড়াই ভেঙ্গে উঠতে হচ্ছে। একে পথ বলা যায় না, পথের কোন চিহ্ন নেই, পাহাড়ের গায়ে হাত লাগিয়ে পর্বতারোহণের ভঙ্গিতে উঠতে হচ্ছে। পা ও দেহ দুটোই ক্লান্ত। পাহাড়ের মাথায় এসে বসেছি। ক্ষণেকের বিশ্রাম। বনের গভীরতা পরিমাপের উর্ধ্বে। ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে নদী-গর্জন কানে আসে। জঙ্গলের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সূর্যদেবকে দেখতে পাচ্ছি। আমরা যেখানে বসে বিশ্রাম নিই, সেখানে সূর্যদেব নিষিদ্ধ। মাঝে মাঝে পাখির ডাক কানে আসে। সুমিষ্ট সুরে সে তার উপস্থিতি জানায়। বিহঙ্গকুল মধ্যাহ্নে বনদেবীর পূজার ঘন্টা বাজায়।

রচ্পালের কাছে পূর্বেই শুনেছি এ পথে ছানি আছে। ডোডিতালের পথে ছানিতে বসে দুধ ও মাখন খেয়েছি। সেই থেকে ছানির প্রতি আমার দুর্বলতা। রচ্পালও আমার দুর্বলতার কথা জেনেছে।

রচ্পাল হঠাৎই বাঁ-হাতে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠে। পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলে ঢাকা ছানি দেখতে পাই। তিন জনেই ছানিতে গিয়ে বসি। ছানির মালিক রচ্পালের পূর্ব পরিচিত। বাড়ি চৌমাসি। নাম শিব সিং। শিব সিং অল্প বয়সী যুবক। সপরিবারে ছানিতেই থাকে। শিব সিংয়ের দুই মেয়ে। শিব সিংকে জিজ্ঞাসা করি আউর লেরকা চাইয়ে? শিব সিং হেসে বলে -নেহি চাইয়ে ভাইয়া লেড়কি ভি ঠিক হ্যায়। সে পরিবার পরিচালনায় অংশ নিয়েছে। আর বাচ্চা হলে কি খাওয়াবে? শিব সিংয়ের সচেতনাবোধ দেখে খুবই আনন্দ হয়।

দুটি খচ্চর, দুটি মহিষ, দুটি গাই, দুটি বলদ ও দুটি কুকুর এই নিয়ে শিব সিংয়ের ছানির সংসার। দীপাবলীর পর ছানি গুটিয়ে সে তার দেশের বাড়ি চৌমাসিতে চলে যাবে। সেটাও সে আমাদের জানিয়ে দেয়। পাহাড়ি মানুষ ঘোল পছন্দ করে। শিব সিংয়ের নিজের হাতে তৈরী ঘোল সরবৎ দিয়ে রচ্পাল ও মহিপালকে আপ্যায়ন করে। আমার জন্য মাখন ও গরম দুধ। পর্যটকের সম্বল লজেন্স, বিস্কুট। শিব সিংয়ের মেয়ের হাতে বিস্কুটের প্যাকেট ভেঙ্গে দিই। উপস্থিত সকলকেই বিস্কুট দিয়ে শুভেচ্ছা জানাই। এ সবেও শিব সিংয়ের মন ভরে না। শহরের মানুষকে চা না দিলে আপ্যায়ন হয় না। তাই চা-না-খাইয়ে

সে কিছুতেই ছাড়বে না। ৭/৮ হাজার ফুট উচ্চতায় ছানিতে বসে চা পাব ভাবতেই পারিনি। শিব সিংয়ের ছানি থেকে সামান্য উপরে আর একটি ছানি। সেটি শিব সিংয়ের কাকিমার। বিধবা কাকিমা শিব সিংয়ের ভরসাতেই দুই শিশু-পুত্রকে নিয়ে পাশেই ছানিতে আশ্রয় নিয়েছে।

পাহাড়ি মানুষের শেষ সম্বল প্রকৃতি। জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে তারা প্রকৃতির গভীর অন্তঃপুরে থাকতে ভালবাসে। প্রকৃতি ভগবান সর্বদাই তাদের জন্য ব্যস্ত থাকেন। শোকে, দুঃখে, বিপদে আনন্দে প্রকৃতি ভগবানের আশীর্বাদ তাঁদের মহৌষধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদের নাগালের বাইরে তারা প্রকৃতির নিয়মেই বেচে থাকতে চায়।

শিব সিংয়ের হাতে চা-খেয়ে আবার চলা শুরু। আমি ও মহিপাল এগিয়ে যাই। রচ্‌পাল উপরের ছানিতে কথা বলতে গিয়ে দেরী করে। আমরা সামান্য একটু পথ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। পথ দ্বিধা বিভক্ত। দুদিকেই গভীর জঙ্গল, পূর্বেই বলেছি এ পথে পথ প্রদর্শক অপরিহার্য। রচ্‌পাল এপথে পূর্বেও এসেছে। সে এপথে অভিজ্ঞ গাইড। ইতিমধ্যে রচ্‌পাল আসে। আমরাও এগিয়ে চলি।

ছানির পর থেকে পথের চেহারা আরও খারাপ হয়। প্রতি মুহূর্তে হাত ও পা কাজে লাগিয়ে পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। এ পথে সাধারণ মানুষ চলে না। প্রকৃতি বিরূপ থাকলে ও পথে আসা মোটেই সম্ভব নয়। প্রতি পদে বিপদের ঝুঁকি। রক ক্লাইম্বিং-এর অভিজ্ঞতা না থাকলে এ পথে আসা উচিত নয়। চৌমাসি থেকে ছিপি সারা পথেই অসংখ্য গাছের শিকড়ে পথ অবরোধ। মাঝে মাঝে 'অসভ্য পথ' বলে গালাগালি দিই। আবার পরক্ষণেই অনুশোচনায় চোখে জল আসে। এপথ পরম পবিত্র। এ পথেই একদিন পঞ্চপাণ্ডব শঙ্কর ভগবানের দর্শনে এসেছিলেন। সে যুগে পথের অবস্থা কেমন ছিল, সেটা আমার জানা নেই। অরণ্যের চেহারা দেখে মনে হয় এ বহু প্রাচীন কালের। অসংখ্য সুদীর্ঘ প্রাচীন বৃক্ষ বয়সের ভারে ধরাশায়ী। যে সকল প্রাচীন বৃক্ষ এখনও দাঁড়িয়ে আছে তাদের অভ্যন্তরে সুগভীর সুড়ঙ্গ। বহিঃরঙ্গের পরিকাঠামো নিয়ে শেষ দিনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। তাদের বংশধরগণ এখন অরণ্যের শোভা বর্জন করে। প্রাণময় সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে মন আনন্দে ভরে যায়।

গুরুদেবের কৃপাধন্য মনে করুণাময় শঙ্করের অকৃপণ স্নেহ। প্রকৃতি ভগবানের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা না থাকলে এ পথে আসার সাহস হত না।

পথ-ক্লান্ত পর্যটকের মনে বিষাদের মধ্যেও আনন্দ জাগে। যুগের পরিবর্তনের সাথে পঞ্চপাণ্ডবের কাহিনী এখন অতল গহ্বরে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবির্ভাবে দেব-শক্তি এখন ভূলুণ্ঠিত। কলিযুগে মানুষ ধৈর্যহীন আয়ু সীমিত, চিন্তা শক্তি অতি দুর্বল, স্মৃতি শক্তি নগণ্য। অতীত ইতিহাস এ যুগের মানুষের নিকট গল্পের কাহিনী মাত্র।

সুগভীর অরণ্যে সীমাহীন স্তব্ধতায় পথ চলতে নানা কথা মনে হয়। এ পথে খচ্চর চলে না। শীত আগত। ছানির সংসার গুটিয়ে সকলেই নীচে নেমে গেছে। আমার মতে পাহাড়ে আসার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। সবুজ প্রকৃতি কুমারীর বেশে সূর্যালোকে তার বাসর ঘর সাজিয়ে রেখেছে। নির্মল নীল আকাশ। আকাশের গায়ে মেঘের লেশমাত্র নেই। মাঝে মাঝে মিষ্টি রৌদ্র পেয়ে পথ চলার সকল ক্লান্তির অবসান হয়।

ঘড়িতে সাড়ে ৩টে। সেই সাত সকালে পথে নেমেছি। পথের সাথে লড়াই করে এক অপরিসর বুগিয়ালে এসে দাঁড়াই। অপরাহ্নের মিষ্টি রৌদ্রকিরণ। রচপাল ও মহিপাল পিঠের বোঝা নামায়। চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গলের প্রাচীর। এ অঞ্চলের সবকিছু রচ্পালের জানা। জলের উৎস নিকটেই। স্থানের নাম দেউলী। উচ্চতা অনধিক সাড়ে ৮ হাজার ফুট।

মুহূর্তে "দেউলীর" প্রেমে পড়ে যাই। দেউলীকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। দেউলীতে শিবির স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করি। রচ্পালের ইচ্ছাও সেটাই।

রচ্পাল ও মহিপাল মালপত্র রেখে কাষ্ঠারহণে যায়। অরুণমালীর শেষ স্পর্শটুকু কাজে লাগিয়ে শিবির স্থাপন করি। তাঁবুতে তিন জনকেই থাকতে হয়।

মহিপাল ও রচ্পাল কাঠ নিয়ে ফিরে আসে। কাঠের আগুনে চা-তৈরী হয়। ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাষ্টারের অভাব মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়।

রচ্পাল কাঠের আগুনে রুটি তৈরী করে। বাড়িতে কত কিছু লাগে, এখানে একটি পাতলা উপলখন্ড আগুনে বসিয়ে দেয়, চাটুর বিকল্প। হাতে রুটি তৈরী করে ঐ চাটুতে সেঁকে নেয়। তারপর অগ্নিসংযোগ।

আহারের পর সামান্য গল্প, তারপর নিদ্রা।

দেউলী - খাদোরা - ধনেজু

আজ ১৩ই অক্টোবর। অতি প্রত্যুষে দেউলীর অস্থায়ী শিবিরে ঘুম ভাঙে। ঘড়িতে ভোর চারটে। রচ্পাল, মহিপাল তখনও ঘুমিয়ে। স্লিপিং ব্যাগে বসেই গুরুজীকে স্মরণ করি।

দেউলী বুগিয়াল বেসিনের তলায়। সকাল ৮টার পূর্বে রোদ আসে না। সুতরাং আজ যাত্রার বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। গতকাল দেউলীকে ভাল করে দেখার সুযোগ পাইনি। আজ যাত্রাকালে সেইটুকু পুষিয়ে নিতে হবে।

পাণ্ডবরা এখানে রাত্রিবাস করেছিল কিনা সেটা আমার জানা নেই। তবে দেউলীতে রাত্রিবাসের সুবিধা অনেক। বাতাস কম লাগে। নিকটেই জলের উৎস। জঙ্গলে যথেষ্ট পরিমাণ কাঠ মেলে। সারা রাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সুগভীর জঙ্গলে বন্য জানোয়ার থাকাই স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা অনেকটাই ঘুরে গেছে। পূর্ব দিগন্ত রক্তিম আভায় আলোকিত। রচ্পাল ও মহিপালকে ডেকে দিই। ওরা আগুনে কাঠ দিয়ে আগুনটাকে জাগিয়ে দেয়। ঐ আগুনে চা হয়। আগুনের পাশে বসে তিনজন চা পান করি। চায়ের আসরে বসেই রচ্পাল রুটি তৈরী করে। ওদের সকাল, দুপুর ও বিকালের খাবারে রুটি। আজ আমিও চায়ের সাথে গরম রুটি দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিই।

এদিকে সূর্যের আলোয় গোটা দেউলী ঝলমল করে। মহিপালকে সাথে নিয়ে তাঁবু গুটিয়ে নিই। আমার স্যাকও রেডি করে নিই। রচ্পাল ওদের গরম জামা কাপড় পুরে স্যাক বেঁধে নেয়। সকলেই প্রাতরাশ সেরে নিয়েছে। ঘড়িতে সকাল ৮টা। রচ্পাল যাত্রার সূচনা করে। আমি তার পশ্চাতে। বেসিনের কানায় উঠে আসি। এটাই বুঝি পাণ্ডবদের যাত্রাপথ। প্রকৃতির অসাধারণ রূপ লাবণ্য দেখে অবাক হয়ে যাই। ডাইনে বাঁয়ে কয়েকটি গুহা দেখতে পাই। হয়তো পাণ্ডবদের রাত্রিবাসের জন্য ঐ গুহাগুলি তৈরী হয়েছিল। সে যুগের ইতিহাস আমার জানা

নেই। তবে প্রাচীন নিদর্শন থেকে এ সব ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

দেউলীর পর থেকে প্রকৃতির রূপ বিন্যাসের কোন তুলনা নেই। তারই মাঝে কাকের কা-কা রব, পাখির কূজন, শান্ত প্রকৃতির অব্যক্ত সুগভীর অরণ্যের তরঙ্গায়িত সুর শুনতে পাই। গতকাল পথ চলার যে বিরক্ত ভাব অনুভব করি আজ ততটাই আনন্দ পাই। এত সুন্দর, এত স্বচ্ছ, এত নির্মল প্রকৃতির রূপ জীবনে দেখিনি। এখানে প্রকৃতি কথা বলে। সে ভাষা মনের মণিকোঠায় বসিয়ে শুনতে হয়। দেবতাত্মা হিমালয়ের এ পথে কেবলমাত্র দেবতারাই আসবে, তাই এত পবিত্র, এত স্নিগ্ধ, এত মায়াময়।

এ পথে বিজ্ঞান আসেনি, প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। মানুষ দূষিত করেনি, বনদেবী, পশুপাখি, পরিব্রাজকের স্পর্শ পায়নি। তাই মাঝে মাঝেই পাখি ডেকে ওঠে। জন্তু-জানোয়ারের চিৎকার কানে আসে।

আজ সূর্যদেব অতি সুপ্রসন্ন, ধ্যানমৌন শিশির সিক্ত প্রকৃতির বুকে কিরণমালা ঢেলে দিয়েছে। সুগভীর নিস্তব্ধতার মাঝে খাম গঙ্গার মিষ্টি মধুর নূপুর ধ্বনি কানে আসে। সুপ্রাচীন বৃক্ষসমূহ অন্তিম মুহূর্তে ধরাশায়ী হয়ে পথ অবরোধ করে। গুঁড়িতে ভর দিয়ে দেহটা উচু করে বাধা অতিক্রম করি। প্রকৃতির সুখ সান্নিধ্যে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ি। দূরে শোনা যায় কালীগঙ্গার গর্জন। প্রকৃতির মিষ্টি আদর ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। বনের পাখি ডেকে বলে — আজ তুই থেকে যা! ওরে প্রেমিক! দোঁহে প্রথম দেখা, প্রথম মিলন — আজ তুই থেকে যা! আবার ডাকে টি-টি-টি-টি প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পারি না।— আনন্দে চোখে জল আসে। হঠাৎ পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি দেয় ইয়ানবুক শৃঙ্গ (৫৯৫৩ মিঃ)। সকল ক্লান্তির অবসান। মন আনন্দে নেচে ওঠে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

দীর্ঘ অপেক্ষার সুযোগ নেই, আবার চলা শুরু। ট্রেকিং-এর সাথে রক ক্লাইম্বিং। একটার পর একটা রক ক্লাইম্বিং করতে হচ্ছে। শুশুনিয়ার রক ক্লাইম্বিং কোর্সের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আনন্দ পাচ্ছি। এপথে রক ক্লাইম্বিং-এর অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল। আর পাণ্ডবগণ যখন এপথে গিয়েছিলেন তখন তাদের কিছুই দরকার হয়নি। তাঁরা ছিলেন দেবতার অংশ। সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে।

সামান্য ক্লাইম্বিং করে পাহাড়ের মাথায় এসে উঠেছি। সম্মুখে ছোট্ট একটি Trench। Trench এর উপরটা পাথরের পাটাতন দিয়ে ঢাকা। দুই মুখ খোলা। মাঝখানে পার্টিশন। রচ্পাল বলে— এটা বাঘ শিকারের খাঁচা। সুন্দর সহজ টেকনোলজি। একটিতে ভেড়া রেখে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অপর মুখ খোলা থাকে। ভেড়া শিকারের লোভে বাঘ এসে ঐ খোলা মুখ দিয়ে খাঁচায় প্রবেশ করে। বাঘ প্রবেশের পর ঐ খোলা মুখ বন্ধ হয়ে যায়। বাঘের আর বেরিয়ে আসার সুযোগ থাকে না। ২/১ দিন পর শিকারী আসে। বাঘ ও ভেড়াকে অক্ষত অবস্থায় পায়। যেদিকে বাঘ থাকে সেদিকের উপরের ঢাকনায় একটি বড় আকারের ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্র দিয়ে অস্ত্র ঢুকিয়ে বাঘটিকে বধ করে। মৃত বাঘটিকে বাইরে এনে ব্যাঘ্র চর্ম সংগ্রহ করে। ব্যাঘ্র চর্ম উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। এই স্থানের নাম "পিঞ্জর"। পিঞ্জরে বসে প্রায় আধ ঘন্টা বিশ্রাম নেই।

পিঞ্জর থেকে সামান্য পথ এগিয়ে অপূর্ব এক বুগিয়াল। রচ্পাল জানায় এ বুগিয়ালের বর্তমান নাম 'ছিপি'। এখানে আছে বিশ্রাম ঘর। আরও সামান্য এগিয়ে আবার বুগিয়াল। দুটোই শিবির স্থাপনের উপযুক্ত। আপার বুগিয়ালে রচ্পাল ও মহিপাল পিঠের বোঝা নামায়। ঘড়িতে সাড়ে ১১টা। গতকাল এখানেই রাত্রিবাসের কথা ছিল। রচ্পাল ও মহিপাল আপার বুগিয়ালে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নেয়। গতকাল রাতের দেউলীতে হাতে তৈরী রুটি সঙ্গে এনেছে। প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন আহারের কোন অসুবিধা নেই। আমিও সঙ্গের শুকনো খাবার দিয়ে দুপুরের আহার সেরে নিই। বুগিয়ালের স্থানীয় নাম লেনেওয়ারা। লেনেওয়ারায় শিবির স্থাপনের জন্য জল, কাঠ কোন কিছুর অভাব নেই। পরিবেশ অতি চমৎকার। মাঝে মাঝেই পাখির ডাক শোনা যায়। এখানে বহুল পরিমাণ বনৌষধি মেলে। দূরের গ্রাম থেকে মানুষ বনৌষধি সংগ্রহ করতে আসে। এখানে যারা আসে সকলেই নিতে আসে। সেই থেকে নাম হয়ে যায় লেনেওয়ান। সংক্ষেপে লেনোয়ারা। অপূর্ব পরিবেশ। প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে কালীগঙ্গা। উত্তরে ইয়ানবুক শৃঙ্গ। সামনেই 'সুমেরু-র (৬৩৩১ মিঃ) হাতছানি।

(ছিপি) লেনোয়ারা থেকে বেলা ১১-৫০ মিনিটে যাত্রা। এখন আর একটানা চড়াই নেই। উৎরাই পথে অনেকটাই এগিয়ে যাই। সারা পথ জঙ্গ

লাকীর্ণ। কত যুগের প্রাচীন অরণ্য তার খবর কেউ রাখে না। জঙ্গল যেন শেষ হতে চায় না। কত যুগ যুগান্তের প্রাচীন বৃক্ষসমূহ অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের নদীর গর্জন কানে আসে। অকস্মাৎ জঙ্গল শেষ হয়, অপূর্ব অপরিসর, সবুজ বুগিয়ালে এসে দাঁড়াই। মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। তাই ডাইনে উত্তাল মধুগঙ্গা। সুবিশাল সুমসৃণ এক শিলাখণ্ড দেখতে পাই। অপূর্ব বিশ্রামস্থল। পাণ্ডবরা হয়তো এখানে বসে বিশ্রাম নিতে ভুল করেনি।

সম্মুখে নদীসৈকত। মধ্যাহ্নে মিষ্টি রৌদ্রকিরণ ছেড়ে যেতে মন চায় না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে তুষারশুভ্র গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান। সাথীরা পিঠের বোঝা নামিয়ে নদীতটে নেমে যায়। আমি সেই সময় একটু ডাইরি লিখি; রচ্‌পাল ফিরে এসে বলে এ স্থানের নাম থুমিয়র দেউলিয়া।

রচ্‌পাল মহিপাল ফিরে এসে মালের বোঝা তুলে নেয়। আবার চলা শুরু। থুমিয়রে Tree line শেষ। লতাগুল্ম বিশিষ্ট উপত্যকা দিয়ে চলেছি। কিছুটা চলার পর সম্মুখে খাম পর্বতমালা দেখতে পাই। খাম থেকে নির্গতা স্রোতোস্বিনীর চপল উচ্ছ্বাস। অতি চমৎকার পরিবেশ। রচ্‌পাল জানায় এ স্থানের নাম খেণ্ডারা। খেণ্ডারাতে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু।

স্রোতস্বিনীর তীর বেয়ে চলেছি। অসাধারণ পরিবেশ। একের পর এক বুগিয়াল। এ সবই খেণ্ডারার অন্তর্গত। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। পথ চলতে আর ইচ্ছা হয় না। দেহ ও পা দুটোই ক্লান্ত। রচ্‌পালকে বারবার শিবির স্থাপনের কথা বলি। স্রোতস্বিনীর অপূর্ব এক চারণ ভূমি দেখে রচ্‌পাল পিঠের বোঝা নামায়। সম্মুখে খাম পর্বতমালা অর্ধ মুণ্ডিত মস্তকে দণ্ডায়মান। অপরাহ্নের মিষ্টি রৌদ্রকিরণে শিবির স্থাপন করি। স্থানের নাম ধনেজু (১২,৫০০ ফুট)। Tree line অনেক আগেই ছেড়ে এসেছি। গোধূলির রক্তরাগে প্রকৃতি সুস্মিতা।

শিবির স্থাপনের পর দুজনেই কাষ্ঠাহারণে বেরিয়ে পড়ে। জলের উৎস নিকটেই দেখতে পাই। অনেক দূর থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হয়। এ পথে স্টোভ অবশ্যই সঙ্গে থাকা উচিত। প্রকৃতির বাতাবরণ অসাধারণ। রান্নার ব্যবস্থা সঙ্গে থাকলে ক্যাম্পিংয়ের আনন্দের কোন তুলনা হয় না। আজ কুঁয়ারীর পথে খুলারার কথা মনে পড়ে। ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাষ্টার সঙ্গে থাকলে আনন্দ

আরও প্রাণময় হতো। রচ্পাল ও মহিপাল অনেক দূর থেকে কাঠ সংগ্রহ করে আনে। কাঠের আগুনে চা হয়। মেসটিনে আলুর সবজি। ওদিকে পাহাড়ের মাথায় অস্তায়মান সূর্যদেবকে দেখতে পাচ্ছি। গোধূলির রক্তরাগে শুভ্র পর্বত শিখর উদ্ভাসিত।

প্রথম জীবনে শিবির স্থাপনের অনেক ইচ্ছা ছিল। প্রকৃতি ভগবান সকল ইচ্ছাই পূরণ করেছেন। প্রকৃতির রূপ অপরের সাথে ভাগ করে না নিলে আনন্দের পূর্ণতা আসে না। রচ্পালের কথায় আমাদের পশ্চাতে যে পাহাড় ঠিক তাঁর পেছনেই গরুড় চটি দেখা যায়। আমাদের পথ সোজাই কেদারনাথ।

দিনের আলো থাকতেই আমরা রাতেব আহার সেরে নিই। তিন পর্যটক আগুনের পাশে বসে গিরিরাজের বন্দনা করে। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, জয় জয় কেদারায় নমঃ।। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি,।।

ধনেজু - বহুজাতিয়া - কেদারনাথ

১৪ই অক্টোবর। অতি প্রত্যুষে ধনেজুর তাঁবুর ঘরে ঘুম ভাঙ্গে। আজ স্লিপিং ব্যাগে বসেই প্রাতর্বন্দনা সেরে নিই। ধনেজুর উচ্চতা বেশী থাকায় শীতের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অধিক। প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ।

মহিপাল তাঁবুতে চা পরিবেশন করে। স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে বাইরে আসতে ইচ্ছা হয় না। অতীত যুগে যারা এপথে এসেছেন তাঁদের কত কষ্টই না করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে সূর্যদেব অনেকটাই পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে। সূর্যদেব পাহাড়ের মাথায় না এলে সূর্য রশ্মি ধনেজুর মাটি স্পর্শ করে না।

রচ্পাল মহিপালের প্রাতরাশ প্রস্তুত। আজ আমিও ওদের সাথে প্রাতরাশ সেরে নিই।

মালপত্র ইতিমধ্যেই প্যাকিং করে নিয়েছি। মহিপালকে নিয়ে তাঁবু গুটিয়ে নিই। ঘড়িতে ৭-৪৫ মিঃ। রচ্পাল যাত্রার সূচনা করে।

ধনেজুর পর থেকেই সবুজের কার্পেট বিছানো প্রান্তর ধীরে ধীরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে ওঠে। মহামান্য ব্যক্তির আগমনে প্রকৃতি নূতন সাজে সাজে। সেই অনাদিকাল থেকে প্রকৃতি পাণ্ডবদের অভ্যর্থনায় স্বর্ণালংকারে ভূষিতা। বিশ্বকর্মা নিজের হাতে সাজিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে পরপর ৬/৭টি সুদৃশ্য গুম্ফা। গুম্ফাগুলি দেখে অতীতের কথাই মনে পড়ে। কাদের জন্য গুম্ফাগুলি তৈরি হয়েছে, কে সৃষ্টিকর্তা, কারা ছিলেন, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় নেই। যত দেখে যাই ততই প্রশ্ন জাগে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। রচপালের ডাকে এগিয়ে চলি। কথিত আছে কেদার পথে পাণ্ডবগণ এই সকল গুহাতেই রাত্রিবাস করেন। চড়াই বুগিয়াল অতিক্রম করে আরও সুন্দর, আরও মসৃণ, এক অভিনব বুগিয়ালে উঠে আসি। স্বর্গীয় সুষমা মিশ্রিত প্রবেশ পথ। এ পথে পর্যটকরা আসে না। তবে সেই অতীতের সাজানো বাসর সজ্জা! প্রকৃতির বুকে, এমন সুউচ্চ পাহাড়ে অপার্থিব দেবাঙ্গন। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। মায়াময় দেবাঙ্গনের আকর্ষণ ছেড়ে মন যেতে চায় না। রচ্‌পালের সাথে দূরত্ব বেড়ে যায়। আবার দ্রুত পা চালাই। মহিপাল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি এখন সকলের পশ্চাতে চলেছি। সুউচ্চ চড়াই পথ চলার শক্তিও কমে আসে।

ঘড়িতে সাড়ে ৮টা। আমরা এখন যে পথে চলেছি তার ডাইনে বাঁয়ে সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী। সম্মুখে খাম পর্বতমালা। ডাইনে তুষার শুভ্র সুমেরু শৃঙ্গ। নীচে খাম গ্লেসিয়ার। গ্লেসিয়ার থেকে মৃদু ধারা নির্গতা। গ্লেসিয়ারের তুষারহীন পর্বত দেখা যায়। মহিপালের কথায় ওটা মহাচণ্ডিকা পাহাড়। ঐ পাহাড়ের মাথায় কখনও বরফ জমে না। মহাচন্ডিকার ডাইনে "নন্দাধার"। নন্দাধারের পশ্চাতে 'দোতিলা ধার'। 'দোতিলা ধারের সম্মুখে মনেনী গ্লেসিয়ার। মনেনী থেকে সরস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত। সকলেই খাম পর্বতমালার অর্ন্তভূক্ত।

আমরা এখন যে পথে চলেছি তার নাম বহুজাতিয়া পাশ। উচ্চতা কমবেশী ১৪০০০ হাজার ফুট। প্রচন্ড ঠাণ্ডা। হিমশীতল বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দেয়। চড়াই আর চড়াই। এখানে কোন পথচিহ্ন নেই। এতো উচ্চতায় ভেড়াওয়ালাদেরও নজর পড়ে না। পা আর চলতে চায় না। প্রায় ৭০ ডিগ্রিতে ওঠা। বসার কোন জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে সামান্য বিশ্রাম, আবার চলা। পিছনে একাধিক তুষার শৃঙ্গ।

ইয়ানবুক (৫৯৫৩ মিঃ) মান্দানী পর্বত (৬১৯৩ মিঃ), সুমেরু (৬৩৩০ মিঃ) খর্চাকুণ্ড (৬৬১২ মিঃ) আরও নাম না জানা পর্বতশৃঙ্গ। পাশের উপর থেকে বাঁহাতের গুহাগুলিকে আরও নিকটে দেখতে পাচ্ছি। সেই অনাদি অনন্ত কাল থেকে প্রকৃতি তার নিজের হাতে গুহাগুলিকে সাজিয়ে রেখেছে। ঋষি মহাত্মা অথবা দেবতাগণের চলার পথে অস্থায়ী আবাসন। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডব শঙ্কর ভগবানের দর্শনের অভিপ্রায়ে এপথে কেদারনাথ যাত্রা করেন। পথে এই সকল গুহাতে রাত্রিবাস করেন।

পাশ অতিক্রম করে অপূর্ব এক বুগিয়ালের দর্শন পাই। এটাই বহুজাতীয়া বুগিয়াল। শিবির স্থাপনের অপূর্ব পরিবেশ। গত দুদিন এপথে অনেক বুগিয়াল দেখেছি, বহুজাতীয়ার আয়তন ও রূপ সকলকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এপথে বহুজাতীয়ায় একদিন অবশ্যই শিবির স্থাপন করা উচিত। তাতে ক্যাম্পিংয়ের আনন্দ এবং প্রকৃতির সাথে একটা দিন মানিয়ে নেবার সুযোগ মেলে। বহুজাতিয়ায় অনেক জড়িবুটি পাওয়া যায়। চৌমাসি থেকে গ্রামবাসীরা আসে এখানকার জড়িবুটি সংগ্রহ করতে।

বুগিয়ালের আয়তন দেখে মনে হয় সেযুগে পাণ্ডবদের সাথে হয়তো অনেক অনুগামী ছিলেন। সকলকে সুন্দরভাবে আপ্যায়নের ইচ্ছাতেই বুগিয়ালে এই বিশালতা। বুগিয়ালকে অতিক্রম করতে ২০-২৫ মিনিট সময় লাগে।

বহুজাতিয়া নামের সাথে অনেক বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে আছে। যে পাশ অতিক্রম করে এসেছি তার নাম বহুজাতীয়া। দ্বিতীয় বহুজাতীয়া বুগিয়াল। তৃতীয় বহুজাতীয়া গ্লেসিয়ার চতুর্থ বহুজাতীয়া টপ। ডানহাতে প্রবাহমানা স্রোতস্বিনীর মৃদু গর্জন কানে আসে।

বুগিয়াল অতিক্রম করে শেষ সীমায় এসে পৌঁছাই সকাল সাড়ে ১০ টা। মহিপাল ও রচপাল পিঠের বোঝা নামায়। আজ এখানেই মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিই। রচ্‌পাল বলে এর পর জল ও সময় দুটোই মিলবে না। ঐ যে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে ওখানে গিয়ে উঠতে হবে। রচ্‌পাল ও মহিপাল সঙ্গের রুটি ও আখের গুড় দিয়ে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নেয়। আমিও সঙ্গের ছাতু ও শুকনো খাদ্য দিয়ে আহার সারি।

প্রকৃতি সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত। উচ্চতার দরুণ প্রখর সূর্যকিরণেও তেমন তাপ অনুভব হয় না। আহারের পর পথ চলা শুরু। ধীরে ধীরে টপের দিকে এগিয়ে যাই। এখন সমতল ভূমি দিয়ে চলেছি। সমগ্র উপত্যকার ম্রিয়মাণ ব্রহ্মকমল ও ফেন কমল দেখতে পাই। অক্টোবরের মাঝামাঝি শীত আগত প্রায়। পুষ্প সমূহ প্রকৃতির বুক থেকে বিদায় নেয়। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এলে এপথে অসংখ্য ফুল দেখা যায়। শীতকালে এ অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। এখন হেমন্তকাল।

শীঘ্রই পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হই। পাহাড়ের সারা শরীরটা জঙ্গলে ঢাকা। ছোট বড় লতাগুল্ম, জঙ্গল, ঝোপঝাড় অতিক্রম করে চলতে হচ্ছে। কোন পথে যাই সেটা ঠিক বুঝতে পারি না। রচ্‌পাল মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাল করে দেখে নিয়ে এগিয়ে যায়। আমরাও ওর নির্দেশে এগিয়ে যাই। এপথে রচ্‌পালের মানসিক শক্তির কোন তুলনা নেই। ওর আত্ম বিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে যাই। রচ্‌পাল ইঞ্জিনের কাজ করে। মহিপাল মাঝে মাঝে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। ওর হাতটা ধরে উপরে উঠি। রক ক্লাইম্বিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকলেও জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের গায়ে কোনদিন ক্লাইম্ব করি নি।

ঘড়িতে সাড়ে চারটে। জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সাথে লড়াই করেছি দীর্ঘক্ষণ। অবশেষে পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছি। অতি অপ্রশস্ত একটি পাটাতনের আকৃতি এক টুকরো সমতল ভূমি। সামান্য বিশ্রাম। চারিদিকে ছোট বড় পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বাবা কেদারনাথের আঙ্গিনা, মন্দির, কোথায়? কতদূর? কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।

আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। রচ্‌পাল একাই এগিয়ে যায়। একটা পাহাড় অতিক্রম করে আর একটা পাহাড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়ে সে আমাদের ডেকে নেয়। অতি সাবধানে এগিয়ে যাই। পথের কোন চিহ্ন নেই, দুটো হাতকে কাজে লাগিয়ে Travarse করে রচ্‌পালের নিকটে গিয়ে পৌঁছাই।

রচ্‌পাল অনেক নীচে অনেক দূরে অস্পষ্ট মন্দিরের চূড়া দেখায়। আমার দৃষ্টিতে মোটে স্পষ্ট হয় না। রচ্‌পাল দেখতে পেয়েছে সেটা শুনেই যথেষ্ট। তুষার শুভ্র সুমেরুকে দেখে অধিক আনন্দ পাই।

অপরাহ্ন বেলায় সূর্যের আলো অনেকটাই কমে আসে। ঘড়িতে পৌনে পাঁচটা, উৎরাই পথে নামতে থাকি। বোল্ডার ডিঙ্গিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি। রচ্‌পাল আগে আগে চলেছে। ওর গতি বেশী, ওর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ি।

রচ্‌পাল মাঝে মাঝে তাড়া দেয়— দিনের আলো থাকতে পৌঁছনো চাই। রচ্‌পাল জানে আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে কেদারনাথে পৌঁছাতে আরও আড়াই, তিন ঘন্টা সময় চাই। সারা পথটাই উৎরাই। দ্রুত নামতে গেলে বিপদ অনিবার্য। কোন কিছু ভাবার সময় নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে শুধুই নেমে চলেছি।

এক সমতল উপত্যকায় এসে হাজির। ব্রহ্মকমলের ভ্যালি। ব্রহ্মকমল সাধারণতঃ ১৪ হাজারের অধিক উচ্চতায় জন্মায়। ব্রহ্মকমল দেখে স্থানের উচ্চতা অনুমান করতে পারি।

অক্টোবর মাস, শীত আগতপ্রায়। মুমূর্ষু ফুলগুলি। কেউই আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। সকলেই নত মস্তকে প্রকৃতি-চরণে প্রণিপাত করে। পাতাগুলি জীবিত থাকলেও ফুলগুলি মৃতপ্রায়।

মৃতপ্রায় ফেনকমল দেখে কষ্ট হয়। শ্বেত শুভ্র রাজ হংসের পালক-সদৃশ পুষ্পালংকারে প্রকৃতি-রানী সুসজ্জিতা। কালের প্রভাবে দৃষ্টি নন্দন ফেন কমলগুলিও ম্রিয়মাণ। গোধূলির সোনালী আলোয় ক্ষণেক দেখা। ব্রহ্মকমল ও ফেনকমলের উদ্যানে চলমান পর্যটকের মনের দরজা উন্মুক্ত হলেও চয়নের কোন সুযোগ মেলে না।

মনের ব্যথা মনেই চেপে রাখি। পাহাড়ের গা বেয়ে শুধু নেমে চলা। দিনের আলো নিভে আসে। রুকস্যাক খুলে টর্চ বের করি। টর্চের অপ্রতুল আলোয় পথ চলা। কেদারনাথ আঙ্গিনা, মন্দির, ও পথের রেখা সামান্য পূর্বে দেখতে পেয়েছি। অন্ধকারে সবই ঢেকে যায়। অনেক দূরে আলো দেখা যায়। রচ্‌পাল বলে ওটা পাওয়ার হাউসের আলো।

ইতিমধ্যে রচ্‌পাল খচ্চর চলার পথ দেখতে পায়। ঐ পথ ধরে তিনজন এগিয়ে চলেছি। মৃতপ্রায় মৃদু টর্চের আলো মাঝে মাঝে বিদ্রুপ করে। রচ্‌পাল

ভৈরব মন্দিরের আলো দেখায়। মাঝে মাঝে মহিপালের হাতটা চেপে ধরি। কখন যে সান বাঁধানো পথে চলে আসি নিজেই বুঝতে পারি না। চারিদিক অন্ধকার। দূরে ভৈরবনাথ মন্দিরের আলো দেখা যায়। ভৈরবনাথ মন্দিরকে ডানহাতে রেখে সানবাঁধানো পথে এগিয়ে চলি।

আলো ঝলমল কেদারনাথ মন্দির দেখে সাহস ও শক্তি ফিরে পাই, মনে আনন্দ আসে। আমরা সান বাঁধানো পথ দিয়ে এগিয়ে চলি। ডানহাতে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত কেদারনাথ মন্দির, বাঁহাতে চায়ের দোকান। কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। আগে চা তারপর অন্য কথা।

গত তিনদিন ধরে একটানা ট্রেকিং করে কেদারনাথের পবিত্র ভূমি স্পর্শ করেছি। পুরাণে কথিত আছে কেদারভূমি দর্শনে ও স্পর্শনে মুক্তি। যাঁকে স্মরণ করে বাড়ি থেকে যাত্রা করেছি তিনিই আজ তাঁর দরবারে টেনে এনেছেন।

এ জয়ের আনন্দ তাঁর। মনের মণিকোঠায় তাঁকেই গভীর ভাবে অনুভব করি। সকল চাওয়া পাওয়ার অবসান ঘটিয়ে আনন্দে, গর্বে তিনিই কান্নায় কানায় পরিপূর্ণ করে দেন।

কি দেব তোমারে হে নাথ-
কি আছে মোর ভাগে—
যা দিয়েছো ফিরায়ে লহ তাই—
শূন্য করে মোরে,
চরণে দিও ঠাঁই।

রূপকুন্ড

প্রকৃতির ইচ্ছার কাছে মানুষের সকল ইচ্ছাই হার মানে। শুনেছি রূপময়ী রূপকুণ্ড দর্শনের শ্রেষ্ঠ সময় সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর। সারা বছরে মাত্র দুটি মাস প্রকৃতি রূপকুণ্ডের পথে বাসর সাজায়। হিমালয় প্রেমী পর্যটক বিশেষ করে বাঙলার দামাল ছেলে-মেয়েরা ঐ সময়ে রূপকুণ্ডের পথে অভিসারের স্বপ্ন দেখে।

দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমিও গত ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩, বীরের সাজে রূপকুণ্ডের পথে বেদনি বুগিয়ালে এসে হাজির হই। প্রকৃতি মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বেদনির প্রিয় সখী আলীবুগিয়াল। বেদনির প্রবেশ পথে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে যাই। আলীবুগিয়াল পুষ্পালংকারে সুশোভিতা। অভ্যর্থনার ডালি সাজিয়ে পুষ্পমাল্য হাতে অভিসারের নায়ককে সে স্বাগত জানায়। প্রকৃতির বুকে এলায়িত আলীবুগিয়ালের রূপের কোন পরিমাপ নেই। এ হেন আলীবুগিয়ালের সান্নিধ্য ছেড়ে মন যেতে চায় না। তবুও যেতে হয়। পথের সাথী ভগবান সিং দানুর পিছু পিছু ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে যাই। সাথী আলীবুগিয়ালে শিবির স্থাপন করতে মোটেই রাজি হয় না। আলীতে জলের উৎস অনেক দূরে। অথচ ক্লান্ত পর্যটক আলীর প্রেমে বাঁধা পড়ে আলীর বুকে ঘর বাঁধতে বেশী আগ্রহী।

বেলা ঠিক ১টা, বেদনির বুকে পা রাখার সাথে সাথে কে যেন অলক্ষে বাঁশী বাজায়। সুন্দর প্রকৃতি মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শুচিস্মিতা প্রকৃতি তার রূপ পাল্টায়, বসন বদলায়, অকস্মাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। টেন্ট খাটানোর সময়টুকু দেয় না। এ যেন এক চরম পরীক্ষা। ছুটে গিয়ে চায়ের দোকানের বারান্দায় আশ্রয় নিই। দোকানের সাথে বাড়তি দু-খানি কামরা রয়েছে পর্যটকের অসময়ে সামান্য আশ্রয়। প্রকৃতির তাড়া খেয়ে ওর একটিতে আশ্রয় নিই।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি। দিগন্ত বিস্তৃত ঘন কুয়াশা। লালা মোহন সিংয়ের হাতে চা-খেয়ে দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তির লাঘব ঘটাই। এ ঘরের ভিতরেই তাঁবু

খাটানোর সিদ্ধান্ত নিই।

১২,৫০০ ফুট উচ্চতায় বেদনির বুকে লালা মোহন সিংয়ের ঘরে বন্দী। প্রকৃতি রোরুদ্যমানা, ঘন কুয়াশা, মুষল ধারে বৃষ্টি, থামার কোন লক্ষণ দেখি না। এমনি ভাবে রাত কাটে, দিন কাটে, কেটে যায় দীর্ঘ ৯৬ ঘন্টা।

আমিও জেদ ধরি, প্রকৃতির হাসিমুখ না দেখে বেদনি ছেড়ে যাচ্ছি না। প্রকৃতির খেয়ালের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে চাই ধৈর্য ও সময়। অনেকেই সময়ের অভাবে একদিন দুদিন বেদনিতে কাটিয়ে বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাবর্তন করেন।

চার দিন পর অর্থাৎ ২৫শে সেপ্টেম্বর অপরাহু বেলায়, প্রকৃতির মুখে হাসি দেখা দেয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর পিতৃপক্ষের অবসান। শারদীয়া মহামায়ার আগমনী বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রভাতি সূর্যালোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত। বেদনিকে বিদায় জানিয়ে বগুয়াবাসার দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়াই।

হাওড়া — হলদুয়ানী

১৬ই সেপ্টেম্বর। রাত ০৩-৪০ মিনিটে ঘুম ভাঙ্গে। হিমালয়ের পথে শুভযাত্রা। গাড়োয়াল থেকে ফিরেই বাঘ এক্সপ্রেসে রিজারভেশন করে রেখেছিলাম। গাড়োয়ালী ও কুমায়ুনী কন্যা রূপসী, মধুময়। তাদের আকর্ষণ শাশ্বত। তাদের হাতছানি প্রাণবন্ত। হিমালয়ের আনন্দধারায় অবগাহন করেও তেষ্টা মেটে না। তার গিরি শিখরে শুভ্র কিরীট। একবার যাঁরা প্রেমে পড়েছেন, বার বার তাঁদের আসতেই হয়।

গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের যৌথ স্নেহ বর্ষণে রূপময়ী রূপকুণ্ডের রূপচর্চ্চা। সেই রূপসী রূপকুণ্ডের সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘ দিনের।

বিগত কিছুদিন ধরে হাওড়া স্টেশনে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ফলে ট্রেন চলাচল কিছুটা বিঘ্নিত হয়। রূপকুণ্ডের পথে যাত্রা ১৬ই সেপ্টেম্বর। ১৭ই বিশ্বকর্মা পূজা। সুতরাং কলকাতার পথে ঘাটে যানজট থাকাই স্বাভাবিক। বাঘ এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় সূচি রাত ২১-৪৫ মিঃ। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাই রাত ৯টায়। স্নেহধন্য রানা খবর পেয়ে আগেই স্টেশনে এসে হাজির, ও আমাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এসে কোয়ার্টারমাষ্টারের হাত থেকে টেন্টের ব্যাগটা নিয়ে

নেয়।

বড় ঘড়ির নীচে ফোয়ারার সামনে চেয়ারে বসি। চত্বরে অসংখ্য অপেক্ষমাণ যাত্রী। ট্রেনের কোন খবর নেই। রাত ১০টার পূর্বে বাঘ এক্সপ্রেসের কোন খবর মিলবে না। সুতরাং কোয়ার্টারমাষ্টার ও রানাকে আমিই বিদায় জানিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিই।

আমার পাশের চেয়ারে বসা ছেলেটি তার বাবাকে নিতে হাওড়া এসেছে। সকালের হিমগিরি রাত ১১টায় আসবে। ট্রেনের অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য মানুষও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে মোটেই পিছ পা নয়।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে রাত পৌনে এগারটায় ঘোষকের কণ্ঠ থেকে জানা যায় বাঘ এক্সপ্রেস ৭নং থেকে ছাড়বে। আমিও মালপত্র নিয়ে ট্রেনে গিয়ে বসি। ৯-৪৫ মিনিটের গাড়ি ১২টায় ছাড়ে। গাড়িতে আমার লোয়ার বার্থ। আমিও সহযাত্রীর সাথে বার্থ বদল করে আপার বার্থে চলে যাই। রাতের গাড়ি ভালই চলছে। বার্থে বসে ক্যাপ্টেনের হাতের তৈরি লুচি সবজি দিয়ে রাতের আহার সেরে নিই। ক্যাপ্টেনের হাতের তৈরি সবজির স্বাদটাই আলাদা।

গাড়ি দেরিতে ছাড়লেও মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই। রাতে ভালই ঘুম হয়। অতি প্রত্যুষে চা-ওয়ালার ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। গাড়িতে প্যান্ট্রিকার না থাকলেও খাবারের তেমন অসুবিধা দেখি না। গাড়িতে হকারের সংখ্যা কম নয়। যাত্রিগণ অধিকাংশই বিহারবাসী।

সকাল ৬টা, গাড়ি এসে শিমুলতলা দাঁড়ায়। ছোট স্টেশন, যাত্রীর ভিড় তেমন নজরে আসে না। ভ্রমণ-প্রিয় মানুষের বড়ই প্রিয় শিমুলতলা। স্টেশন থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের মাথায় দেবতার মন্দির। সিমুলতলার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সিমুলতলার খ্যাতি কম নয়। সিমুলতলায় অল্পক্ষণের বিরতি।

আজ সকালেই স্নান সেরে নিয়েছি, প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করে সামান্য ডাইরি লিখি। গাড়িতে দু-রাত্রি দু-দিনের সংসার। কথা বলে গল্প করার লোক না পেলে সামান্য অসুবিধা হয় বৈ কি? গতকাল হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার প্রাক্কালে সহযাত্রী নরেশ কুমারের মোবাইল ফোন থেকে ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টার মাষ্টারকে

খবর জানাই।

দেখতে দেখতে গাড়ি গঙ্গার বুকে এক দীর্ঘ সেতু অতিক্রম করে। বিহারের ঘরের ছেলে রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। বিহারবাসীর গর্ব। তাঁরই নামানুসারে সেতুর নামকরণ "রাজেন্দ্র সেতু"।

এখন বেলা ১২টা। সকাল থেকে অনেক ঘুমিয়েছি। আজ সহযাত্রী রজনীশের সাথে আলাপ হয়। বিহারের সুবায়ন জেলায় বাড়ি। ছোট থেকেই কলকাতায় মানুষ। দেশের চেয়ে কলকাতার প্রতিই তার টান বেশী। ভবানীপুর জগুবাজার এলাকায় Khalsha English Medium School এর নবম শ্রেণীর ছাত্র। ছুটিতে মা-কে ও ভাইকে নিয়ে দেশের বাড়ি চলেছে। কলকাতায় তার পিতার ফলের ব্যবসা। রজনীশের মিষ্টি চেহারা, মিষ্টি ব্যবহার, মিষ্টি হাসি। ওর সাথে গল্প করে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে।

আজ গাড়িতে তেমন ভিড় নেই। অবাঞ্ছিত যাত্রীর কোন দাপট নেই। বর্ষণস্নাত প্রকৃতি। সবুজ বসনে সুসজ্জিতা। শ্যামায়মান প্রকৃতি সজীব ও সুন্দর। চলন্ত গাড়িতে বসে প্রকৃতির রূপ দেখে সময় কাটে। দেখতে দেখতে সমস্তিপুর জংশন স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। ভিন রাজ্যের সহযাত্রী যারা ছিলেন তাদের অনেকেই নেমে যান।

ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। ইতিমধ্যে রজনীশের মায়ের সাথেও আলাপ জমে ওঠে। শ্রীমতী ইন্দুমতী গুপ্তা। দীর্ঘ ২০ বছর কলকাতায় আছেন। চেহারায় শক্ত বাঁধন, মিষ্টি গড়ন। কল্লোলিনী সুন্দরী কলকাতার সাথে ভালই মানিয়ে নিয়েছেন। বড় ছেলে গয়া কলেজে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র। রজনীশ, ঋষি ও স্বামীকে নিয়ে তার কলকাতার সংসার। বিলম্বে আলাপ হলেও স্বাদ মিটিয়ে গল্প করে।

অপরাহ্ন বেলায় বাঘ এক্সপ্রেস বিহারের বুক চিড়ে দ্রুত এগিয়ে চলে। যেদিকে তাকাই শুধুই সোনালী ক্ষেত। শুচিশুভ্র কাশফুল হেলে দুলে কোমর বাঁকিয়ে নৃত্য করে। শরতের শুভাগমনে ফুলে ফুলে মহামায়ার আগমনী বার্তা ঘোষিত হয়।

দিনের শেষে যুখু সিংয়ের সাথে আলাপ হয়। সেও গোরখপুরের অধিবাসী। ৬ মাস পর বাড়ি ফিরছে। ব্যাংককে কাপড়ের ব্যবসায় নিযুক্ত আছে।

খেদের সাথে সে বলে — বাড়িতে সকলেই আছে, তবুও বাড়িতে ফিরতে তার আনন্দ নেই। বাড়িতে শুধুই খরচ। এখানে কোন আয় নেই। যেখানে থাকে সেখানে যেমন খরচ তেমন আয়। ব্যাংককে পাঁচ টাকার নিচে কিছুই মেলে না। সকল মানুষই কিছু না কিছু কাজে যুক্ত আছে। একটা ঠেলাওয়ালা প্রতিদিন ৭০০/৮০০ টাকা রোজগার করে। প্রতিদিনই টাকার আসা যাওয়া আছে, সুতরাং আনন্দও আছে। বাড়িতে শুধুই খরচ, কোন আয় নেই। তাই আনন্দও নেই। যুখু সিংয়ের কথা অবাক হয়ে শুনতে থাকি।

দেখতে দেখতে সূর্যদেব পশ্চিমাকাশে নেমে যায়। বিহারের সীমানা কখন পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। বিলম্বে চলা গাড়ি। গোধূলির সোনা ঝরা আলোয় উত্তর প্রদেশের আকাশে, বাতাসে বসুন্ধরার নৃত্যনাট্যের আয়োজন। সান্ধ্য প্রদীপের শুভ সন্ধ্যায় গাড়ি এসে গোরখপুর দাঁড়ায়।

রজনীশ মাকে ও ভাইকে নিয়ে নেমে যায়। অল্পক্ষণের পরিচিত সহযাত্রী যুখু সিংও নেমে যায়। আমার কুপেটিতে এখন একাই আছি। জানিনা আর কেউ আসবে কিনা? কেউ না এলে শঙ্কর ভগবানের দায়িত্ব আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং চিন্তার কোনই কারণ নেই। এখন রাত ৯টা। আপন মনে একটু ডাইরি লিখি।

রূপকুণ্ডের পথে চলেছি। মানসিক শক্তি ও সাহস দুটোই চাই। যিনি যোগানোর তিনি সাথেই আছেন। চোখ বন্ধ করলেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি।

১৮ই সেপ্টেম্বর, সকাল ৬টায় ঘুম ভাঙ্গে। চলন্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বারাবাঙ্কি জংশন স্টেশন। চা-ওয়ালা হেঁকে হেঁকে চা-পানের আহ্বান জানায়। গতরাতে যখন ঘুমাই তখন গাড়িতে দ্বিতীয় লোক ছিল না। সকালে দেখি কোন বার্থ ফাঁকা নেই।

গাড়ি এখন উত্তর প্রদেশের বুক চিড়ে এগিয়ে চলেছে। লাইনের ধারে ঘন বসতি সমূহ নিদ্রামগ্ন। মানুষের প্রভাতী কর্মযজ্ঞ নজর কাড়ে। উত্তর প্রদেশের প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই আমার খুব পছন্দ। উত্তর প্রদেশের সীমানায় এলেই আমার মনে হয় — এই বুঝি লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার এসে যাই।

ইদানীংকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রেল লাইনের দুপাশে ফাঁকা জায়গা সমূহ শহরের রূপ নিয়েছে। মানুষের বসতি ও নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। আগের সবুজ প্রান্তর অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

গাড়ি এসে বাদশানগর স্টেশনে দাঁড়ায়। ছোট স্টেশন। আমরা যেদিকে চলেছি তার ডান হাতে প্ল্যাটফর্ম। বাঁদিকে সুবিশাল রেলওয়ে কলোনী ও শহর এলাকা। বিশাল বিশাল অট্টালিকা দেখে মনে হয় লক্ষ্ণৌ আগত প্রায়।

গতকাল অর্থাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজা। প্রতি স্টেশনেই পূজার ধূমধাম লক্ষ করছি। লক্ষ্ণৌ সিটি রেল স্টেশন পেরিয়ে যায়। গাড়ি দাঁড়ায় না। লক্ষ্ণৌ রাজধানী শহর। গত বছর পিণ্ডারীর পথে বাঘ এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ অতিক্রম করি। সেদিন ছিলাম নিদ্রামগ্ন। রাত তিনটে। আঁধার রাতে লক্ষ্ণৌর বুক ছুঁয়ে গাড়ি চলে যায়। এখন সকাল ৭টা। গাড়ি চারঘন্টা বিলম্বে চলছে। প্রভাতী আলোর ছটায় মায়াবিনী লক্ষ্ণৌকে প্রাণ ভরে দেখার সুযোগ পাই। দেখতে দেখতে আইশ বাঘ এসে গাড়ি দাঁড়ায়। দীর্ঘক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। বিলম্বের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

গতকাল থেকে কাঠগুদামগামী কোন যাত্রীর সাথেই দেখা হয় নি। আজ হঠাৎই এক প্রৌঢ়র সাথে আলাপ হয়। গত গভীর রাতে গোরোখপুরে ট্রেনে চেপেছেন, চলেছেন কাঠগুদাম ভ্রমণে। সঙ্গে তরুণী স্ত্রী ও এক শিশু পুত্র। প্রথম আলাপেই নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, আপ যাদা ওমর মে সাদি কিয়া? ভদ্রলোক সহাস্যে উত্তর দেন — এ মেরে দ্বিতীয় পক্ষ হুয়ী হ্যায়। প্রথম পক্ষ ঘরমে হ্যায়, উনকো কই বাচ্চা নেহি হ্যায়। ভদ্রলোক তরুণী স্ত্রী ও দেড় বছরের শিশু পুত্রকে নিয়ে নৈনিতাল চলেছেন প্রমোদ ভ্রমণ করতে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা চোখে দেখার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম। শিবপ্রসাদ সিং Manager. SBI, Munderwa U.P.। শিবপ্রসাদের বয়স ৫৫ বছরের কম হবে না। স্ত্রীর বয়স ১৮ বছরের অধিক নয়। ভদ্রলোকের কথায়— প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে খুব ভালবাসে, তাই স্বামীর সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়েছে।

আমাদের ট্রেন আইসবাঘ থেকে ছেড়ে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে সকাল পৌনে নয়টা। গাড়ি ছাড়ার তেমন লক্ষণ দেখিনা। চা

খেয়ে গল্প করে সময় কাটে।

আজ গাড়িতে দেড় বছরের শিশু পুত্র "শিবম" আমাদের সহযাত্রী। পূর্বে বলেছি শিবমের মা "সানি সিং ১৮ বছরের তরুণী। বিবাহের সময় সে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। তার দেহে তারুণ্যের তেমন প্রকাশ নেই। শিবমের প্রতি তার তেমন লক্ষ্য নেই। শিবম্ তার বাবার কাছে থাকতেই বেশী পছন্দ করে।

ইতিমধ্যে দেড়ঘন্টা কেটে যায়। গাড়ি আবার চলতে থাকে। লক্ষ্ণৌর পর আলমনগর স্টেশন দ্রুত অতিক্রম করে। গাড়ির গতিও সামান্য বাড়ে। রেল লাইনের দুধারে শুধুই আম্রকুঞ্জ দেখতে পাই। ইতিমধ্যে ছোট স্টেশন 'কাঁকরি' পেরিয়ে যায়। যে দিকে তাকাই শুধুই কাঁঠালের চাষ। শহরের প্রকৃতি শারদীয়াদেবীকে আবাহনের নেশায় যেন নূতন সাজে সেজেছে। কাশ ফুলের গহনা পরে সে মাকে (আবাহনী আহ্বান) করে। ঐ যে ছোট স্টেশন মালিয়াবাদ পেরিয়ে যায়। হঠাৎই প্রকৃতি মুখ ভার করে। আকাশের গায়ে কালো মেঘ দেখা দেয়। চরিদিক অন্ধকারে ঢেকে যায়। ক্ষণেকের বিষণ্ণতা। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি নামে। 'সাণ্ডিলা' এসে গাড়ি দাঁড়ায়। অল্পক্ষণের বিরতি। গাড়ি এখন ভালই গতি নিয়ে ছুটছে। দীর্ঘ বিলম্ব কাটিয়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা। তবুও যতটুকু কমানো যায়। ক্ষীণ আশার আলো দেখতে পাই। সাঁঝের পূর্বে হলদুয়ানীতে পৌঁছাতে পারলেই খুশী। ছোট্ট স্টেশন বাঘলী পেরিয়ে যায়।

ঘড়িতে সোয়া বারোটা। আমাদের গাড়ি এখন রোজা জংশন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অমৃতসর মেল দ্রুত অতিক্রম করে চলে যায়। আমাদের গাড়িও চলতে থাকে। সাড়ে বারোটায় গাড়ি এসে শাজাহানপুর স্টেশনে দাঁড়ায়। সামান্য দাঁড়িয়ে আবার চলতে থাকে। পূর্বেই বলেছি দীর্ঘ বিলম্ব কমিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা। এখন পর্যন্ত গাড়ি আট ঘন্টা বিলম্বে চলছে। দীর্ঘ বিলম্ব হলেও মোটেই অসুবিধা অনুভব করিনি। গাড়িতে তেমন ভিড় নেই, গরমের আধিক্য নেই। ক্যাপ্টেনের তৈরি খাবারে ভালই চলছে। গাড়িতে ভিড় না থাকায় জলের অভাব হয়নি। আমাদের কুপেতে এখন মোট চার জন। শিবপ্রসাদ, সোনী, শিবম্ ও আমি। বিশ্বকর্মার পূজার দরুন স্থানীয় যাত্রীর ওঠা নামা একদম নাই বললেই

চলে। ছ-খানি বার্থ নিয়ে আমার একার রাজত্ব। শিবপ্রসাদ তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে উইণ্ডো বার্থেই সর্বক্ষণ কাটিয়ে দেন। বেলা দেড়টা, গাড়ি এসে বেরিলি জংশনে দাঁড়ায়। গাড়ির বিলম্ব দেখে 'ভেণ্ডার এসে আগেই খাবারের অর্ডার নিয়ে যায়। বেরিলিতে খাবার সরবরাহ করে। সহযাত্রী শিবপ্রসাদ বাবুর মতে ভালোই খাবার।

বেলা পৌনে তিনটে। গাড়ি এসে রামপুরে দাঁড়ায়। রামপুরে লাইন দ্বিধা-বিভক্ত। একদিকে হলদুয়ানী হয়ে কাঠগুদাম, অপর শাখা মোরাদাবাদ নাজিমাবাদ, লাকসার হরিদ্বার হয়ে দেরাদুন।

রামপুরে এসে গাড়ি ইঞ্জিন বদল করে। এতক্ষণ গাড়ি যেদিকে যাচ্ছিল এখন তার বিপরীত দিকে। মেইন লাইন বেরিলী থেকে রামপুর হয়ে মোরাদাবাদ। আমাদের গাড়ি বেরিলির দিকে সামান্য এগিয়ে বাঁ-হাতে বেঁকে যায়। এ লাইন লালকুয়াতে এসে মেশে। এ পথে বিলাসপুর রোড স্টেশন। বিলাসপুর ছোট্ট পরিচ্ছন্ন স্টেশন। দেখতে দেখতে বাঘ এক্সপ্রেস লালকুয়া হয়ে হলদুয়ানী এসে দাঁড়ায়, ঘড়িতে বিকাল সাড়ে পাঁচটা। ট্রেন চলা শেষ।

হলদুয়ানী-গোয়ালদাম

আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। গোয়ালদামের পথে যাত্রা। গতকাল ৭ ঘন্টা বিলম্বে বাঘ এক্সপ্রেস হলদুয়ানী পৌছায়। ট্রেন থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে সোজাই পূর্বপরিচিত গ্রীন হোটেলে চলে আসি। সামান্য দূরত্ব হলেও রিকসা ভাড়া পাঁচ টাকা। গত বছর পিণ্ডারীর পথে ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাষ্টারকে সাথে নিয়ে এখানেই উঠেছিলাম। গ্রীন হোটেলের পরিচ্ছন্নতা চলনসই। চার্জ সাধারণের নাগালের মধ্যে।

অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। প্রাতঃকৃত সেরে যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে নিই। গতকালই বাসের খবর নিয়েছি। সকাল সাড়ে ৮টায় গোয়ালদামগামী প্রথম বাস। গ্রীন হোটেল থেকে বাস স্ট্যাণ্ডের দূরত্ব অতি সামান্য। একা মানুষ, তাই সকাল সাড়ে ৭টায় বাসে মালপত্র তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। যথা সময়ে গাড়ি ছাড়ে। চালক মোহন লালের সাথে গাড়িতে বসেই আলাপ হয়। গাড়ি নৈনিতাল

রোড ধরেই এগিয়ে চলে। সুপ্রশস্ত রাজপথ। আপ এণ্ড ডাউন রাস্তা। সুন্দর রেলিং বসিয়ে বিপরীত মুখী উভয় রাস্তার সীমানা নির্দেশ করা আছে। বাঁহাতে জনকল্যাণ মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়ের গেটে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশানাল ওপেন ইউনিভারসিটির সাইনবোর্ড দৃষ্টিগোচর হয়।

নৈনিতাল রোডের উভয় পার্শ্বে শহরের বিস্তৃতি। শহর এলাকা শেষ না হতেই পাহাড়ের দেখা মেলে। গাড়ি কাঠগুদামের দিকে এগিয়ে চলে। হলদুয়ানী থেকে কাঠগুদামের দূরত্ব ৫ কিমি। সর্বদাই অটো মেলে, ভাড়া ৫ টাকা।

মেন রোড থেকে অতি অল্প দূরত্বে রেল স্টেশন। স্টেশনে কম্পিউটারাইজড রিজারভেশনের ব্যবস্থা ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। পথের দুধারে সুউচ্চ বৃক্ষসমূহ পথের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মাঝে মাঝে সুসজ্জিত দোকান, রেস্তোরাঁ পর্যটকদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। বিপরীতগামী অটো, টাটাসুমো, জীপ ইত্যাদি দ্রুত অতিক্রম করে। দেখতে দেখতে শহরের রাজপথ পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নেয়। ডান হাতে শহরের বাড়ি ঘর, বাঁ-হাতে পাহাড়। সাইনবোর্ডে নওকুচিয়া তালের আবেদন দেখে মন লাফিয়ে ওঠে। মুহূর্তে পথের চেহারা বদল হয়। অরণ্য শোভিত পাহাড়ী পথে জাগরণ ও অমর উজালা পত্রিকার সুদৃশ্য সাইনবোর্ড দেখে ভালই লাগে।

বেলা ১০-১০ মিনিট, গাড়ি এসে ভাওয়ালী বাজারে দাঁড়ায়। স্থানীয় যাত্রীর ওঠানামা। ভাওয়ালী আপেলের জন্য বিখ্যাত। এখন আপেলের মরশুম। স্থানীয় কিছু লোক ও যুবক প্লাষ্টিক প্যাকেটে আপেল নিয়ে গাড়িতে আসে। ১০টাকা প্যাকেট। এক থেকে দেড় কেজি আপেল আছে প্রতিটি প্যাকেটে। দামেও সস্তা খেতেও সুস্বাদু। ভাওয়ালীর জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। দূর থেকে স্যানীটোরিয়ামের লাল বাড়িটি অপূর্ব দেখায়।

ঘড়িতে সাড়ে দশটা। ভাওয়ালীকে বিদায় জানিয়ে গাড়ি কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে সবুজের দেশে প্রবেশ করে, নিজেও বুঝতে পারিনা। দু-ধারে শুধুই পাইন অরণ্য।

হলদুয়ানী থেকে ৪৮ কিমি দূরে কাঁইচ গ্রাম। পথের ধারে কাঁইচি মন্দির। মন্দিরের বিগ্রহ বৈষ্ণোদেবী। রাত্রিবাসের জন্য পথের পাশেই মতি লজ ও

রেস্তোরাঁ। ভাওয়ালী থেকে কাঁইচি মুক্তেশ্বর, রামগড় প্রভৃতি গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণ আপেলের চাষ হয়। এছাড়া আরু, নেসপাতি ইত্যাদি নানা রকম ফলের চাষ এ অঞ্চলের অন্যতম উপজীবিকা।

বেলা সোয়া ১২টা। গরমপানি এসে গাড়ি দাঁড়ায়। স্থানের নাম গরমপানি। গরম জলের কোন চিহ্ন নেই। রাস্তার দুধারে দোকান, বাজার ও হোটেল। বেশ জমকালো পাহাড়ী শহর। 'ঠেরনা' গরম পানির বর্দ্ধিত এলাকা। ঠেরনা থেকে জীপ মেলে বিভিন্ন দিকের।

১২-১৫ মিঃ। আলমোড়া এসে আমাদের বাস চা-পানের বিরতি টানে। বাসস্ট্যাণ্ডের ঠিক সামনেই ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার অফিস। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সামান্য এগিয়ে বাঁহাতে স্টেট ব্যাঙ্কের ATM সুবিধা।

আলমোড়া থেকে ১২ কিমি দৌড়ে 'কোশি' এসে আমাদের গাড়ি হাঁফ ছাড়ে, বেলা ১-১৫ মিঃ। কোশিতে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি। সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ী শহর। ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস সবই আছে। STD Booth দেখে এই সুযোগে কলকাতায় প্রিয়জনদের সাথে একটু কথা বলে নিই।

কোশি থেকে কৌশানী (6000) 38 কিমি। পর্যটকের প্রিয় পাহাড়ী শহর। অনাশক্তি আশ্রম বা গান্ধী আশ্রম কৌশানীর প্রাচীন ঐতিহ্য। কৌশানীর পর্যবেক্ষণ বিন্দু থেকে নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, চৌখাম্বা, হাতি ইত্যাদি তুষারময় গিরি শৃঙ্গগুলি দৃশ্যমান। কৌশানীতে হোটেল, লজ, দোকান বাজার কোন কিছুর অভাব নেই। উত্তরাঞ্চল সরকার কৌশানীতে চা-শিল্প গড়ে তুলেছে। কৌশানী থেকে গরুড় ১৩ কিমি।

আমাদের গাড়ি কৌশানী হয়ে গরুড়ের দিকে এগিয়ে চলে। অপরাহ্ন বেলা। পড়ন্ত রৌদ্রকিরণে শোভাময়ী প্রকৃতি। উপরে নির্মল নীল আকাশ। দিবাবসানে ঘর্মাক্ত বসুন্ধরা। পাইন অরণ্য শোভিত পথ। গরুড় উপত্যকার রূপের কোন সীমা নেই। গরুড় মালক্ষ্মীর ভাণ্ডার। অল্প পরিসর আঙ্গিনায় ধান্য উৎপাদনে গরুড়ের কোন জুটি নেই।

আমাদের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অস্তায়মান রবি শেষ কিরণটুকু গরুড়ের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে গরুড়ের চরণ খানি

স্পর্শ করে। সাজানো শহর গরুড়। পথের উভয় পার্শ্বে দোতলা, তিনতলা বাড়ি। জীপ, ট্যাক্সি, ঠ্যালাগাড়ি, দোকান বাজারে জমজমাট গরুড়।

অল্পক্ষণের বিরতি, গাড়ি আবার ছুটতে থাকে। ডাইনে বাঁয়ে ধান ক্ষেত, বাড়ির উঠানে ধানের চাষ। এমন দৃশ্য গরুড়েই দেখা যায়। সোনালী ক্ষেত ধানের ভারে অবনত, যেন শিষগুলি বসুন্ধরাকে প্রণতি জানায়। ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাকা বাড়ি, দোকান। আমাদের গাড়িও দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ি মাথা থেকে মালপত্র নামিয়ে হালকা হয়। গরুড় থেকে বৈজনাথ ১কিমি।

গোমতীর বুকে পুল পেরিয়ে আমাদের গাড়ি বাঁহাতে এগিয়ে চলে। ডানহাতে গোমতীর পরপারে বৈজনাথ দেখা যায়। ডংগোলী হয়ে গাড়ি ছোটে গোয়ালদামের দিকে।

বিকাল ৫টা। গাড়ি এসে খেলাপ সিং রাউতের Fast Food Centre এর সম্মুখে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে নিই। বাস চলার সমাপ্তি।

খেলাপ সিং Fast Food Centre - এর সাথে নতুন গেষ্ট হাউস বানিয়েছে। খেলাপের গেষ্ট হাউস আধুনিক মানের। দাদা আলম সিং হোটেল ত্রিশূলের মালিক। হোটেল ত্রিশূলে ৩০১ নং রুমে উঠেছি। দুই ভাই পূর্ব পরিচিত। ঘরে গিজার বসিয়েছে। গরম জলে স্নান করে সারাদিনের বাস চলার ক্লান্তি দূর করি। হোটেল ত্রিশূলের ছাদে দাঁড়িয়ে গোধূলির আবির রঙে নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলকে প্রাণ ভরে উপভোগ করি। সান্ধ্য প্রদীপে গিরিরাজের চরণে অঞ্জলি দিই।

গোয়ালদামের কথা পূর্বেই বলেছি। গোয়ালদাম গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের যৌথ তোরণ। যোগাযোগের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। সরাসরি বাস মেলে হরিদ্বার, হলদুয়ানী ও আলমোড়ার। গোয়ালদাম ফরেষ্ট গেষ্টহাউস প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। থাকার জন্য G.M.V.N. - এর গেষ্ট হাউস, হোটেল ত্রিশূল ও খেলাপ সিং-এর নব নির্মিত সুসজ্জিত গেষ্ট হাউস।

গোয়ালদাম থেকেই রূপকুণ্ডের পথে যাত্রা শুরু।

গোয়ালদাম — লোহাজং

পূর্বেই বলেছি গতকাল অপরাহ্ন বেলায় গোয়ালদাম এসে পৌঁছাই। ত্রিশূল

হোটেলের ৩০১ নং ঘরে উঠেছি। সুপরিসর দ্বিশয্যার শয়ন কক্ষ। মার্বেলে ঢাকা বাথ। বাথেই গরম জলের ব্যবস্থা। ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূল পর্বতের শুভ্র জ্যোতির্ময় রূপ পর্যটকের মন হরণ করে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেই বিষাণ সিং পরিবারের চায়ের দোকান। বিষাণের সুন্দর ব্যবস্থা; গরম চা ও পকৌড়া পর্যটকের ক্লান্তি হরণ করে।

গোয়ালদাম কুমায়ুন ও গাড়োয়ালের যুগ্ম দ্বার। সড়ক পথের সঙ্গম। গোয়ালদাম থেকে সব সরাসরি পথ গিয়েছে গাড়োয়ালের ঋষিকেশ, হরিদ্বার ও কেদারবদ্রী। গোয়ালদাম থেকে কুমায়ুনের দিকে দিকে বাস পথ ছড়িয়ে গেছে জালের মত। স্বল্প দূরত্বের পথে জীপ মেলে সর্বত্রই। অতি প্রত্যুষে বাস মেলে আলমোড়া, হলদুয়ানী, কাঠগুদাম, হরিদ্বার ও নানা স্থানের।

আজ ২০শে সেপ্টেম্বর। গোয়ালদাম থেকে রূপকুণ্ডের পথে লোহাজং যাত্রা। শুনেছি বাস পথ লোহাজাং থেকে আরও পাঁচ কিমি এগিয়ে কুলিং পর্যন্ত গেছে। এ পথে নিয়মিত বাস চলে না। পথের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, তাই জীপই ভরসা। গোয়ালদাম থেকে ২০ কিমি জীপে থরালী। থরালী থেকে ১৫ কিমি জীপে দেবল। দেবল থেকে ৩০ কিমি জীপে লোহাজং। সবক্ষেত্রেই জীপ ছাড়ার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। জীপে যাত্রী বোঝাই হলেই জীপ ছাড়ে।

অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। ঘরেই স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রস্তুত হয়ে নিই। মালপত্র নিয়ে নীচে নেমে আসি। থরালীগামী প্রস্তুত জীপে মালপত্র তুলে দিই। জীপ ছাড়তে অনেক দেরী। আমি মাত্র একাই যাত্রী, আরও ৯/১০ জন যাত্রী না এলে জীপ ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই। হাতে অনেক সময়। খেলাপ সিংয়ের দোকান থেকে পথের কিছু শুকনো খাবার সংগ্রহ করি। বিষাণ সিংয়ের দোকানে বসে চা খাই।

ইতিমধ্যে জীপে ২/১ জন যাত্রী এসে বসেছে। হাতে তখনও বেশ সময়। এই সুযোগে সামান্য প্রাতর্ভ্রমণ সেরে নিই। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কর্ণপ্রয়াগের পথে বাঁহাতে KMVN Tourist Lodge. Lodge পেরিয়ে Central Public School ডানহাতে সুবিশাল গ্যারেজ। সামান্য এগিয়ে ডান হাতে বনবিভাগের বাংলো। নির্ভয়ে বাংলোয় প্রবেশ করি। বিজয় দত্ত মহাশয়ের 'হিমবন্তের অঙ্গনে'

গ্রন্থে পড়েছিলাম গোয়ালদামের বনবিশ্রাম ভবনটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। সেই আশা নিয়ে চৌকিদারের সাথে দেখা করি। চৌকিদার লজপত সিং। চৌকিদারের কথায় এখন এখানে কোন পর্যটক থাকে না। বনবিশ্রাম ভবনটি এখন কর্মচারীর আবাসন। তবে বিশ্রাম ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুষারশুভ্র নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলের সন্দর্শনে মাতাল হয়ে যাই। বনবিশ্রাম ভবনের সর্বত্র প্রাচীন স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে চলে। বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে এসে জীপে বসি। যথা সময়ে জীপ ছাড়ে।

জীপ যত এগিয়ে যায় নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূল ততই নিকটে দেখা যায়। পাইনের ছায়া ঘেরা পথে জীপ চলে। প্রকৃতির প্রাণময় পরিবেশ। গোয়ালদাম থেকে ১০ কিমি দৌড়ে এসে জীপ দাঁড়ায়। স্থানের নাম তলোয়ারী। তলোয়ারীতে সরকারী ইন্টার কলেজ আছে। গোয়ালদাম ও থরালী উভয় দিক থেকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসে। থরালীর ইন্টার কলেজ এখন ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়েছে। অল্পক্ষণের বিরতি। পথের উভয় পার্শ্বে সাজানো দোকান। STD Booth স্থানীয় যাত্রীর ওঠানামা শেষ, জীপ আবার চলতে থাকে।

তলোয়ারী পেরিয়ে 'ললতি গ্রাম'। পথের পাশে সুন্দর দোকান। খাবারের দোকানে গরম জিলাপী ভাজতে দেখি। ললতি গ্রামে এসে পিণ্ডারের দেখা পাই। ললতি ১,৭০০ ফুট উচ্চতা। গোয়ালদাম ১,৯৬০ ফুট উচ্চতা।

দেখতে দেখতে জীপ এসে থরালী জীপ স্ট্যান্ডে দাড়ায়। জীপের মাথা থেকে মালপত্র নামিয়ে নিই। জীপ চলা এখানেই শেষ। পথ চলে গেছে কর্ণপ্রয়াগ। জীপ যেখানে দাঁড়িয়েছে তার নাম উঁচু বাজার। পাশেই চায়ের দোকান, STD Booth, খাবার দোকান ইত্যাদি। চায়ের দোকানের পিছন দিয়ে পায়ে চলা পথ নীচে নেমে মেন রোড ধরে পিণ্ডারীর বুকে লোহার সেতুতে গিয়ে উঠেছে। সেতু পেরিয়ে নীচু বাজার। সেখান থেকেই জীপ ছাড়ে দেবলের। পিণ্ডারীর উভয় তীরে থরালীর বিস্তৃতি। দেবল রোডে লোক নির্মাণ বিভাগের। বিভাগীয় কার্যালয় বসেছে। এখান থেকেই লোহাজং পর্যন্ত পথের দেখভালের কাজ চলে।

থরালীর নীচু বাজার থেকে দেবলের জীপ ছাড়ে। দূরত্ব ১৫ কিমি।

জীপ স্ট্যাণ্ডে এসে অনেক জীপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। যেটা আগে যাবে সেটাতেই উঠে বসি। যথা সময়ে জীপ ছাড়ে। পথের চেহারা মোটেই ভাল নয়, পথের সৌন্দর্য অপরিসীম। পৌনে ১ঘন্টায় জীপ এসে দেবল বাজারে দাঁড়ায়, ঘড়িতে বেলা ১১টা।

জীপ স্ট্যাণ্ডের নিকটেই ষ্টেট ব্যাঙ্ক। জীপ ছাড়তে দেরী দেখে RTC ভাঙ্গানোর সিদ্ধান্ত নিই। ব্যাঙ্কে গিয়ে মহা বিপত্তি।

ম্যানেজারবাবু বলেন — তাদের শাখায় RTC ভাঙ্গানো হয় না। শেষ পর্যন্ত অনেক কথা কাটাকাটির পর তারা আমার RTC ভাঙ্গিয়ে দেয়। শাখার জন্মাবধি আপনি যিনি RTC ভাঙ্গালেন। শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপ্তি। জীপে এসে বসি। দেবল থেকে লোহাজং ২৫ কিমি। যথা সময়ে জীপ ছাড়ে। ভাড়া ৩০ টাকা।

হেলে দুলে জীপ চলে। পথের চেহারা মোটেই ভাল নয়। কাঁচা পাকা রাস্তা। রাস্তা অধিকাংশ স্থানেই পিচ্ উঠে গেছে।

পথের চেহারা খারাপ হলেও দেবলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি চমৎকার। পাহাড়ের মাথায় বাড়িগুলি ছবির মত দেখায়। সমতল আঙ্গিনায় বাস স্ট্যাণ্ড ও বাজার।

ছোট পাহাড়ী শহর। ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, দোকান, বাজার সব কিছুই আছে। জীপ ষ্ট্যাণ্ড থেকে গাড়ি ছেড়ে এসে এক কেরোসিন ডিলারের দোকানের সামনে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে অনেকেই জেনে গেছে আমি রূপকুণ্ডের যাত্রী। অনেকেই পোর্টার। গাইড হয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। রূপকুণ্ডের পথে আর কোথাও কেরোসিন মিলবে না, সকলেই দেবল থেকে কেরোসিন নিতে পরামর্শ দেয়। ডিলারের দোকানেই সাদা পলিথিন জার পাই। ২০ টাকা দিয়ে একটি জার কিনি। লিটার প্রতি ১২ টাকা দিয়ে ৩ লিটার কেরোসিন নিই। জীপের ড্রাইভার কমল সিং লোহাজংয়ের ছেলে। খুবই সহযোগিতা করে।

গাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। আমার আসন ড্রাইভারের পাশে আমার পাশে মান্দোলীর বধূ শ্রীমতী মীনা দেবী। মীনা দেবীর পাশে ওয়ান

গ্রামের বধু শ্রীমতী ধামতী দেবী। উভয়ই বিষ্ট সম্প্রদায়ের। মীনা দেবী দেরাদুনে মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরছে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল গ্রামেই, জামাই জীপ চালায়। বিয়ের পর দেরাদুনে গিয়ে ঘর বেঁধেছে।

আমাদের গাড়ি লোহাজংয়ের দিকে এগিয়ে চলে। পথের উভয় পার্শ্বে সুগভীর জঙ্গল। প্রকৃতির বুকে ছায়া সুশীতল পথ। হঠাৎ আমাদের জীপ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটি শিয়াল রাস্তা পার হয়। কমল সিং জানায় এ পথে সাপ ও শিয়াল প্রায়ই গাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

মান্দোলী হয়ে গাড়ি আসে লোহাজং। লোহাজং জগত সিং রানার দোকোনের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। জগৎ সিং রবীনবাবুর পরিচিত। রবীন বাবু অর্থাৎ রবীন ব্যানার্জী, যিনি দীর্ঘকাল হিমালয়ের কোলে কাটিয়েছেন। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের অনেক এলাকায় তিনি ব্যানার্জী সাহেব নামে পরিচিত। যাত্রাকালে জগত সিং রানার নামে রবীন ব্যানার্জীর একটা চিঠিও সঙ্গে নিই। জগত সিংয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। রবীন ব্যানার্জীর চিঠি দিতেই জগত সিং সকল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। জেলা পরিষদের সুসজ্জিত ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। জেলা পরিষদের ঘরের ভাড়া ১০০ টাকা।

জেলা পরিষদের বিশ্রাম গৃহের ব্যবস্থা বেশ ভাল। দ্বিশয্যার চারটি শয়ন কক্ষ। প্রতি ঘরেই টয়লেট বাথ সংলগ্ন। বিছানা পত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে বিজলী বাতিও আছে। বারান্দায় দাঁড়ালেই নির্মল আকাশের নীচে নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূল দৃশ্যমান।

ইতিমধ্যে জগৎ সিং ঘরে এসে সব রকম খোঁজ খবর নিয়ে যায়। মালপত্র রেখে জগত সিংয়ের দোকানে এসে বসি।

জগত সিং খুবই আন্তরিক, অমায়িক। স্থানীয় মানুষের নিকট খুবই পরিচিত। লোহাজং বাজারে নিজস্ব দোকান। দোকানে সব কিছুই মেলে। দোকানের পিছনে "রূপকুণ্ড লজ" পাশেই জগতের তেল ও আটাকল।

জগত সিং পর্যটকের বন্ধুও বটে। রূপকুণ্ড যাত্রায় পর্যটকের জন্য ঘোড়া, গাইড, পোর্টার ইত্যাদির ব্যবস্থা দিতে সর্বদাই তৎপর। পর্যটকের সেবায় সকল প্রকার সহযোগিতায় সে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করে না। জগতের সহযোগিতায়

আমার রূপকুণ্ডের পথের সাথী ভগবান সিংকে পাই। ভগবানের সব চেয়ে বড় গুণ সে কোন প্রকার নেশা করে না। কোন কিছুতে তার 'না' নেই। পাহাড়ে এমন মানুষ পাওয়া বিরল।

লোহাজং এখন রূপকুণ্ডের পথে প্রান্তিক স্টেশন। প্রান্তিক স্টেশনের "শ্রী" ও সৌন্দর্য লোহাজংয়ের বুকে তেমন স্পষ্ট নয়। স্থানীয় মানুষের সেবার মনোভাব তেমন প্রসারিত নয়।

লোহাজং থেকে আরও ৫ কিমি পথ ওয়ানের দিকে এগিয়ে গেছে কুলিং পর্যন্ত। এ পথে জীপ খুব কম চলে। অধিকাংশ জীপ এই পথটুকু বুকিং-এ যেতে চায়, বুকিং ২০০ টাকা। হাঁটা পথে দেড় ঘন্টার বেশী লাগে না। কুলিং-এ রাত্রিবাসের তেমন ভাল ব্যবস্থা নেই। রূপকুণ্ডের পথে লোহাজং-এ রাত্রিবাস করে পর দিন ট্রেকিং পথে পা বাড়ানোই শ্রেয়।

লোহাজং-এ খাবার জন্য রূপকুণ্ড রেস্তোরাঁই (আমার দেওয়া নাম) ভাল। মান্দোলীর দুই ছেলে ধন সিং ও প্রকাশ সিং কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের পাশেই নূতন রেস্তোরাঁ খুলেছে। এদের এখানে গিয়ে রাতের আহার সেরে নিই। এদের ব্যবহার ও রান্না উভয়ই ভাল। আহারের পর ধন সিং ঘরে গরম দুধ পাঠিয়ে দেয়।

লোহাজং জীপ স্ট্যাণ্ডে ২/৩টি চায়ের দোকান দেখি। অর্ডার দিলে প্রতি দোকানেই ভাত, রুটি, সবজি মেলে।

লোহাজং-এ রূপকুণ্ডের পথে মালবাহকের চার্জ ১৩০-১৫০ টাকার মধ্যে। গাইড ১৫০-২০০ টাকার মধ্যে। সকলকেই খাবার দিতে হয়। রূপকুণ্ডের পথে সাথীদের নিয়ে একটা পরিবার তৈরী হয়। রূপকুণ্ডের পথে ভগবান সিংকে নিয়ে দুই জনের চলমান সংসার শুরু হয় ২০ শে সেপ্টেম্বর। ২৭ শে সেপ্টেম্বর লোহাজং এ ফিরে অস্থায়ী সংসারের অবসান হয়।

লোহাজং-এ থাকার জন্য জেলা পরিষদের বিশ্রাম গৃহ। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের টুরিষ্ট লজ, রূপকুণ্ড টুরিষ্ট লজ, জেলা পরিষদ ও KMVN-এর ব্যবস্থাই ভাল।

লোহাজং আসার পথে জীপে ঠিকাদার রায়বাহাদুর সিংয়ের সাথে আলাপ

হয়। এ পথে দু-বছর জীপ চলা চল শুরু হয়েছে। দেবল থেকে লোহাজংয়ের পথের অবস্থা খুবই খারাপ। অথচ রূপকুণ্ড আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পর্যটন কেন্দ্র। দেশী বিদেশী অনেক পর্যটন প্রিয় মানুষ রূপকুণ্ডের সন্দর্শনে লোহাজংয়ে এসে জড় হয়। এহেন রূপকুণ্ডের প্রতি উত্তরাঞ্চল সরকারের তেমন নজর নেই।

লোহাজংয়ের লাগোয়া গ্রাম মান্দোলী। মান্দোলীতে কলেজ ও পোষ্ট অফিস আছে। ওয়ান, কুলিং ও লোহাজংয়ের ছেলে মেয়েরা মান্দোলী কলেজেই পড়তে আসে। পাহাড়ী গ্রামের ছেলে মেয়েরা কত কষ্ট করেই না পড়াশুনা করে। লেখা পড়া শিখে তাদের স্বপ্ন ঘোড়াওয়ালা, মেষপালক, পোর্টার অথবা পশুপালন।

লোহাজং — দিদ্‌না

পূর্বেই বলেছি গতকাল লোহাজং এসে জেলা পরিষদের বিশ্রাম ভবনে আশ্রয় নিয়েছি।

আজ ২১ শে সেপ্টেম্বর। অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে, ঘড়িতে ভোর চারটে। ঘরে বিদ্যুতের আলো ও প্ল্যাগ পয়েন্ট আছে। প্ল্যাগে গরম জল বসিয়ে দিই। আমার সাথী ভগবান সিং আমার পাশেই ঘুমিয়ে । জিনিষপত্র গুছিয়ে নিই।

ইতিমধ্যে গরম জল প্রস্তুত। লোহাজংয়ে এত সাত সকালে গরম জল পাব ভাবতেই পারিনি। ভগবান ঘরে চা নিয়ে আসে। ভগবানকে নিয়ে ঘরেই প্রাতরাশ সেরে নিই।

সকাল ৬-২০ মিঃ লোহাজংকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু। পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ দিদ্‌নায় গিয়ে যাত্রার বিরতি। এ পথ ভগবানের ভালই চেনা। ভগবন সিং পোর্টার কাম গাইড। ভগবান ওয়ান গ্রামের বাসিন্দা। অনেকবার সে রূপকুণ্ডের পথে গিয়েছে।

জেলা পরিষদের সামনে দিয়ে লোহাজং বাজারকে বাঁহাতে রেখে ভগবান নীচের দিকে নেমে যায়। আমিও তর তর করে নীচের দিকে নেমে যাই। একটানা ১ ঘন্টা চলেছি। ভগবান পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেয়। ওর সাথে আমিও বিশ্রাম নিই। মাটির পথ। পথের উভয় পার্শ্বে ঘন জঙ্গল। দূরে দূরে ২/১টি বাড়ি দেখা যায়। এসবই বাঁকের অংশ। বাঁক বিশাল গ্রাম। লোহাজং বাঁকের

একটা অংশ মাত্র। চলার পথে খরস্রোতা নদীর গর্জন কানে আসে। ভগবানের কথায় নীল গঙ্গার উচ্ছ্বাস। অল্পক্ষণের বিশ্রাম। আবার চলা শুরু।

ছায়া সুশীতল পথ। সূর্যালোকের দেখা নেই। মাঝে মাঝে সুগভীর জঙ্গলের পথ। পথের ধারে ব্রাস, বুরাস ইত্যাদি বৃক্ষ । ঘড়িতে সকাল ৮টা। অপূর্ব এবং অপরিসর বুগিয়ালে এসে দাঁড়াই। বুগিয়ালটি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। ভগবান সিং পিঠের বোঝা নামায়। বাঁহাতে পশ্চিমে পাহাড়ের গায়ে সুন্দর বাড়িঘর দেখা যায়। ভগবান জানায় ওটাই কুলিং গাঁও। কুলিং থেকে সামান্য উপরে ওর নিজের গ্রাম ওয়ান। যাত্রার পূর্বে ভগবান ওয়ান হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ওয়ান হয়ে গেলে বাড়িতে স্ত্রীর সাথে দেখা করে যেতে পারে। ঘরে স্ত্রী ও দুটি ছেলে মেয়ে আছে।

অপূর্ব বুগিয়াল। ভগবান জানায় এর নাম মাইলাধার। বুগিয়ালে বসেও নীল গঙ্গার গর্জন শুনতে পাই।

বুগিয়ালের পশ্চিম তীর ধরে উৎরাই পথ। পথ ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে যায়। ধীরে ধীরে জঙ্গলের গভীরতা কমে আসে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে সবুজ শস্য ক্ষেতের আল বেয়ে পথ। পূর্বাহ্নের সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত বসুন্ধরা। ঐ যে পর পর কয়েকটি ঝুপড়ির বাড়ি দেখা যায়। বাড়ির উঠানে সোনালী ফসল। রূপসী গাড়োয়ালী কন্যা কাজের ফাঁকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্রামের নাম আখোরি। পশ্চিম দিগন্তে জীবন্ত কুলিং ইশারায় আহ্বান করে। আখোরি অতিক্রম করে এক স্রোতস্বিনীর তীরে নেমে আসি। স্রোতস্বিনীর বুকে সুন্দর পানি চাক্কি।

পানি চাক্কির মালিক রণজিৎ সিং বিষ্ট স্বাগত জানায়। ভগবান পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেয়। রঞ্জিৎ সিংয়ের কথায় আন্তরিকতা মিশ্রিত। রঞ্জিৎ এখন ৭১ বছরের বৃদ্ধ। এক সময় সে পাহাড়ী দীপক সরকার ও ডি মজুমদারের সাথে গাইড হয়ে রূপকুণ্ডে গিয়েছে। রঞ্জিতের বাড়ি কুলিং গ্রামে। আজ বাংলার মানুষ পেয়ে চা না খাইয়ে ছাড়বে না। রঞ্জিতের তৈরি চা খেয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুনরায় যাত্রা।

স্রোতস্বিনী পেরিয়ে পথ দ্বিধা বিভক্ত। বাঁহাতে পাথর দিয়ে বাঁধানো মেন

রোড ওয়ানের দিকে গিয়েছে। ডান হাতে পায়ে চলা পথ দিদ্‌না গ্রামের। এই বিন্দুতে অবশ্যই একটি বোর্ড থাকা উচিত। গাইড ছাড়া এইসব স্থানে পর্যটকের পথ ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশী।

বাঁহাতি পথ ধরে দিদ্‌নার দিকে এগিয়ে চলি। এ পথে নীল গঙ্গা বড়ই লাজুক। সর্বদাই নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়। সকাল থেকে স্রোতস্বিনীর উচ্ছ্বাস শুনতে পাই, তার দেখা পাইনি। এতক্ষণে নীল গঙ্গার দেখা পাই। পশ্চিম তীর ধরে চলেছি। পথ গিয়ে লোহার সেতুতে মিশেছে। লোহার সেতু পেরিয়ে নীল গঙ্গার পূর্ব তীরে চলে আসি।

সেতু পেরিয়ে চড়াই পথের শুরু। পথশোভা অতি চমৎকার। সকাল থেকে উৎরাই পথে হেঁটেছি। এখন তার শোধ উঠছে। সুগভীর জঙ্গলে ঢাকা পথে এগিয়ে চলেছি। যত যাই চড়াই ততই বাড়ে। শীতকালে এ পথ ৩/৪ ফুট বরফে ঢাকা থাকে। চলার পথে কোন মনুষ্যপ্রাণী দেখতে পাই না। স্থানীয় কোন মানুষের সাক্ষাৎ মেলে না। শুধু চড়াই আর চড়াই। জঙ্গলে ঢাকা পথ। নীল গঙ্গার গর্জন কানে আসে। ভগবান সিং পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেয়। ভগবন সিং নীল গঙ্গার পশ্চিম তীরে আখোরি গ্রামের বাড়িঘর দেখায়। কুলিং থেকে ওয়ান পর্যন্ত নূতন পথের অংশ বিশেষ দেখা যায়।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। এ পথের চড়াই পশ্চিমবঙ্গের বিকে থেকে সন্দাকফুর কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে এ পথে রডডেনড্রনের ছায়ায় পথ চলা। জঙ্গলের গভীরতা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। তীব্র চড়াই পথে মাঝে মাঝে বসে পড়তে ইচ্ছা হয়।

দূর থেকে জঙ্গলের গভীরতাকে জঙ্গলের গুহা বলে মনে হয়। নিকটে পৌছানোর পর ধারণার বদল হয়। সূর্যকিরণ না এলেও আলোর কোন অভাব নেই। পথের উভয় দিকে সুউচ্চ বৃক্ষবাটিকায় বনদেবীর নির্জন আবাসন। উপরে নির্মল আকাশ। ডাইনে বাঁয়ে লাল, নীল, সাদা, গোলাপী নানা রঙের ফুলের মেলা। মাঝে মাঝে চিঁ, চিঁ, ঝিঁ, ঝিঁ, চুঁচু পাখির ডাক কানে আসে।

হঠাৎই প্রকৃতির রূপ বদলায়। ছায়া সুশীতল প্রকৃতি পর্দার আড়ালে চলে যায়। তীব্র সূর্যকিরণে ক্লান্ত দেহ ঘর্মাক্ত হয়। দেখতে দেখতে জঙ্গলের প্রাচীর

সরে যায়। সম্মুখে পাথরের প্রাচীর দেখা দেয়। দিদ্‌না গ্রামের প্রাচীর। ভগবান সংক্ষিপ্ত পথে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে দিদ্‌না গ্রামে বাড়িঘর দেখতে পাই।

পাহাড়ের কোলে সভ্যতার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রাম দিদ্‌না। প্রতিটি বাড়ির ছাদেই স্লেট পাথর। ৩/৪টি দোতলা বাড়িও দেখা যায়। গ্রামের প্রান্তসীমায় আসতেই দুই কিশোর স্বাগত জানায় — আইয়ে ভাইসাব —

দিদ্‌নার স্কুলবাড়িটাই এখন পর্যটক আবাসনের রূপ নিয়েছে। তিন কামরার স্কুল বাড়ি। ছাত্র সংখ্যা মাত্র ২৫ জন, শিক্ষক ৩ জন। ছাত্র ও শিক্ষক প্রায় স্কুলে আসে না। স্কুল বাড়ি অধিকাংশ সময় পরিত্যক্তই থাকে। রূপকুণ্ডের পথে পর্যটকরা ঐ স্কুল বাড়িতেই রাত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরাও পূর্ব দিকের ঘরে রাত্রের আশ্রয় নিই।

আজ বেলা সাড়ে ১১টায় দিদ্‌নার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছি। গ্রামের ছেলে কুন্দন ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। সে ও তার ভাই সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গ দেয়।

অপরাহ্ণ বেলা গ্রামের পুষ্কর সিং এসে আমাদের খোঁজ খবর নেয়। পুষ্করের সাথে আলাপে বেশ ভাল লাগল। এখানের মানুষের জীবিকা পোর্টার, গাইড, মেষপালন ও চাষবাস। পুষ্কর জানায় সেও পর্যটকের সাথে পাহাড়ে যায়।

অস্তায়মান রবির শেষ ছটায় গ্রামের ছেলে মেয়েরাই স্কুলবাড়ির অপরিসর উঠানে এসে হাজির হয়। সকলকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে হাতে লজেন্স দিই। সকলেই খুশির মেজাজে শুভেচ্ছা জানায়। মাত্র তিন জন ৯ম শ্রেণীর ছাত্র পাই। তাদের জীবনের স্বপ্ন কি জানতে চাই? ঐ তিন জনকে আলাদা লাইনে দাঁড় করাই। তিন জনের তিন উত্তর — প্রথম জন বলে পড়াশুনা শেষ করে মেষপালক হবে। দ্বিতীয় জনের উত্তর - পোর্টার হবে। তৃতীয় জনের ইচ্ছা - ঘোড়াওয়ালা হবে। পাহাড়ী ছেলেদের পাহাড়ের মতই উত্তর। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিই।

গ্রামে মোট চল্লিশটি পরিবারের বাস। মোট লোক সংখ্যা ২০০ জন।

স্কুল বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে যেদিকে তাকাই শুধুই সোনালী ক্ষেত। মাঝে ২/৩টি বাড়ি দেখতে পাই। দিদ্‌নার বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে। কৃষ্ণ পক্ষের কৃষ্ণরজনী ধীরে ধীরে দিদ্‌নাকে ঢেকে দেয়। হিমালয়ের কোলে দিদ্‌নাকে শুভরাত্রি জানাই।

দিদ্‌না — বেদনী

আজ ২২শে সেপ্টেম্বর, বেদনীর পথে যাত্রা। অতি প্রত্যুষে দিদ্‌নার স্কুলবাড়িতে ঘুম ভাঙ্গে। প্রাতঃকৃত্য সেরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিই। ভগবান সিং চা তৈরি করে। চা-বিস্কুট ও কেক দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিই। দিদ্‌নাকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু, সকাল ৭-১০ মিনিটে।

দিদ্‌নাবাসী হাত তুলে শুভেচ্ছা জানায়। দিদ্‌না রমণী যাত্রা কালে কাঁকড়ি উপহার দেয়। দিদ্‌নাবাসী এক পাহাড়ী কুকুর যাত্রাকালে পিছু নেয়। স্কুলবাড়ির আঙ্গিনা থেকে নীচে নেমে ডান হাতে জল কলের পাশ দিয়ে পায়েচলা অমসৃণ পথ উঠে গেছে জঙ্গলের দেশে। এক স্রোতস্বিনী এঁকে বেঁকে চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে। যত উপরে যাই পথ ততই চড়াই। জঙ্গলের গভীরতা বাড়তে থাকে। নবজাত এক শিশু স্রোতস্বিনীর কান্না শুনতে পাই। প্রবহমানা স্রোতস্বিনী পথ অবরোধ করে। পাথরে পাথরে পা রেখে বাধা অতিক্রম করি। তীব্র চড়াই অতিক্রম করে একটুকরো সমতল পথ দেখতে পাই। ঐ সমতলটুকু মনের সান্ত্বনা মাত্র। মুহূর্তে সমতলটুকু শেষ করে তীব্র চড়াই শুরু।

পথ চড়াই হলেও পথের চেহারা ভাল। পথ অমসৃণ নয়। গভীর জঙ্গলে ঢাকা। সূর্যকিরণ প্রবেশের সাধ্য নেই। চলার পথে তাপ দগ্ধ হতে হয় না। গভীর অরণ্যে মাঝে মাঝে পাখির কূজন কানে আসে।

সকাল ৯-২০ মিঃ, ভগবান সিং পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেয়। আমিও ওর পাশে গিয়ে বসি। ভগবানের হাতে ছোলা, কিশমিস, লজেন্স দিই। আজ দিদ্‌না থেকে যে কুকুরটি আমাদের পিছু নিয়েছে সেও বসে বিশ্রাম নেয়। ঝোলা থেকে বিস্কুট বাড় করে ওকে দিই।

আজ দিদ্‌নাবাসীর উপহার কাঁকড়ি ভগবান সঙ্গে এনেছে। আমার নিকট

থেকে ছুরি নিয়ে ভগবান কাঁকড়ি কাটে। দিদ্‌না থেকেই লবণ ও লঙ্কার গুঁড়া মিশিয়ে পুরিয়া করে এনেছে। কাঁকড়ির সাথে ' মিশ্রণ' মিশিয়ে বড়ই উপাদেয়। ঘর্মাক্ত দেহে চড়াই পথে কাঁকড়ি প্রসাদ অতি চমৎকার। আজ, নেপালে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের ট্রেকিং এর কথা মনে পড়ে। সুগভীর জঙ্গলে দুরন্ত চড়াই পথে ট্রেক। বেশি বিশ্রামের সুযোগ নেই। আবার চলা শুরু।

প্রকৃতির বিরূপ থাকলে এ পথে আসা খুবই অসুবিধা। সুন্দর মেঘমুক্ত আকাশে এ পথে ট্রেক তেমনই রমণীয়। ক্লান্ত দেহে মনে হয় এ চড়াইয়ের বুঝি শেষ নেই। পথের দুধারে শুধুই রডডেনড্রন। সুউচ্চ বৃক্ষসমূহ পরস্পরে মাথা ঠেকিয়ে ছায়া বিস্তার করে। সুযোগ পেয়ে ভগবান পিঠের বোঝা নামায়। চড়াই পথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়। ভগবান কাঁকড়ি কাটে, আমি ডাইরি লিখি। চড়াই পথের কষ্ট সর্বত্র একই রকম। কোথাও কম কোথাও বেশী।

এ পথের সৌন্দর্য অপরিসীম। চলার পথে কিছু শুকনো খাবার অবশ্যই সঙ্গে থাকা চাই। মাঝে মাঝে বসে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা হবেই। সে সময় কিছু খাবার ও জল খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে নিলে ভালই। চাঙ্গা শরীর নিয়ে পুনরায় চলা শুরু। দিদ্‌না থেকে 'বেদনী' একটানা ১২ কিমি চড়াই পথ। মাঝে মাঝে মনে হয় পথ নয়, পথের সিঁড়ি। দিদ্‌না থেকে চড়াই শুরু এ চড়াইয়ের শেষ দেখি না।

ঘড়িতে সাড়ে ১০টা। ঐ যে ভগবান পিঠের বোঝা নামিয়ে বসে পড়েছে। ভগবানের হাতে ছোলা, কিশমিস দিই। পথের সাথী কুকুরটিকে বিস্কুট দিই। আমিও ঝোলা থেকে ডাইরি পেন বার করি। উপরে নীল আকাশ। সামনে পেছনে রডোডেনড্রনের ঘন ছায়া। নির্জন প্রকৃতি, অরণ্য শোভিত পথ, ক্লান্ত পর্যটক পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেয়। ভগবান তার কাঁকড়ির শেষ সম্বলটুকু ভাগ করে দেয়। কাগজের গায়ে লেগে থাকা নুন ও লঙ্কার গুঁড়া এগিয়ে দেয়। এ এক অপূর্ব পরিবেশন, অপূর্ব অনুভূতি। গাছের ফাঁকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে পাহাড়ের ঢালে সূর্যদেবকে দেখতে পাই। চলার পথে কিরণমালী নেই, মাথার উপর সবুজ সামিয়ানা। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু।

ধীরে ধীরে মাথার উপরের সবুজ সামিয়ানা সরে যায়। সুউচ্চ বৃক্ষসমূহ,

সুগভীর অরণ্য, অরণ্যের আবাসিকবৃন্দ সব কিছুই নাগালের বাইরে চলে যায়। সম্মুখে উন্মুক্ত সবুজ প্রান্তর দেখা দেয়। এক নূতন সীমানা স্পর্শ করি।

মনে মনে ভাবি কোর্য়াটারমাষ্টার যার কথা বার বার আমার কানে দিয়েছে, যার রূপে স্বর্গের দেবতাগণ মর্ত্যের নেমে আসেন,যার যৌবন তরঙ্গে পর্যটকের চিত্ত বিগলিত হয়, সুরলোকের অপ্সরাগণ রূপের হাটে লজ্জা পায় এই বুঝি সেই "আলীবুগিয়াল"। তুঙ্গনাথ থেকে চন্দ্রশীলা যেমনটি দেখেছি, ঠিক তেমনটি পথ।

প্রকৃতির সবুজ অঙ্গে হীরা, মুক্তা, মাণিক্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত মণিমুক্তা, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী, রঙের অসংখ্য পুষ্পরাজি। নানা রঙের পুষ্পালংকারে সুশোভিত সোনালী কার্পেট পিছানো প্রান্তর। পূর্বাহ্ণে সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত অনিন্দ্য সুন্দর বুগিয়াল। যার সর্বাঙ্গে রূপের ধারা রসের ধারা। ক্ষুদ্র নয়, সংকীর্ণ নয়, সংক্ষিপ্ত নয়, যার ব্যাপ্তি বিশাল, বিস্তৃতি সীমাহীন। এহেন আলীবুগিয়ালের সন্দর্শনে আমি নিজেও চঞ্চল হয়ে পড়ি।

চড়াই ভেঙ্গে যতই উপরে যাই বিশালতা ততই বৃদ্ধি পায়। ভগবান সিং দ্রুত এগিয়ে যায়। আলীতে শিবির স্থাপনের ইচ্ছা ভগবানের মোটেই নেই। হঠাৎ এক অপরিসর জলাশয় দেখে থমকে যাই। ভগবান সিং কিছুই বলতে পারে না। আলীর বুকে হয়তো আলীকুণ্ড হবে। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে চলি। ঐ যে এক ঝলক মেঘ আমাদের দিকে ধেয়ে আসে। কিছুটা এগিয়ে এসে সে তার দিক পরিবর্তন করে। উঁচু পাহাড়টা ডিঙ্গিয়ে দূরে একটা মন্দিরের আকৃতি দেখতে পাই। কোন মনুষ্য প্রাণী দেখতে পাই না, যাকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

দূরে কয়েক হাজার মেষ শাবকের এক সুদৃশ্য মিছিল দেখতে পাই। নিকটেই হয়তো কোন ছানি দেখা যাবে। আমার ধারণা অমূলক হয় না। দুই গাড়োয়ালী রমণীর চিৎকার শুনতে পাই। গরুর পিছনে ছুটছে। ভগবান সিং জানায় নীচে অনেক ছানি আছে। ঐ ছানিতে দুধ, মাখন, ঘি পাওয়া যায়।

আলীবুগিয়াল যেন শেষ হতে চায় না। সকাল থেকে, দিদ্‌না থেকে ছায়া সুশীতল পথে ৮কিমি ট্রেক করেছি। সুবিশাল আলীবুগিয়ালের দৈর্ঘ্য ৫ কিমি।

দীর্ঘ চড়াই পথ অতিক্রম করতে দেহ পরিশ্রান্ত। পা যেন আর চলতে চায় না। ক্লান্ত শরীরটা টেনে নিয়ে বেদনীর দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হই। আলীর অন্তর্ধানে মন বিরহ ব্যথায় ভারাক্রান্ত। বেদনীতে এসেই মোহন সিংয়ের দেখা পাই। এই মোহনকেই সামান্য পূর্বে দুধ আনতে বলেছিলাম। মধ্যাহ্নের তাপদগ্ধ 'বেদনি' (১২,৮০০ ফুট) মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কোন এক অদেখা রেফারির বাঁশীর সংকেতে রূপসী "বেদনী" সমগ্র বুগিয়ালে এক অবাঞ্ছিত বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তাঁবু খাটানোর সময়টুকু দেয় না। শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। দ্রুত মোহনের ঘরের বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিই। ঘড়িতে বেলা ঠিক ১টা।

বেদনীতে মোহনের চায়ের দোকান একমাত্র ভরসা। বেদনীতে মোহনের তিন কামরার বাড়ি। বাড়ির মালিক লোহাজং-এর হায়াত সিং। মোহন হায়াতের নিকট থেকে ভাড়ায় নিয়েছে। প্রথমটিতে মোহনের চায়ের দোকান, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি পর্যটকের অস্থায়ী আস্তানা। প্রতিটি ঘরের জন্য দক্ষিণা ৫০ টাকা।

মোহনের হাতে চা খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। প্রকৃতি ক্রমশই মেঘাচ্ছন্ন হয়। বৃষ্টি থামার কোনই লক্ষণ দেখি না। মোহনের ঘরেই শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিই। মোহনের ঘরে আলো প্রবেশ করে না। মোহনের কেরোসিনের টেমি অথবা মোমবাতি ভরসা।

মোহনের কুঠিয়ায় নেমে আসার মুখে বাঁহাতে মন্দিরাকৃতি পর পর দু-খানি হাট দেখেছি। বন বিভাগের বিশ্রাম ভবন। দেবল বন বিভাগের দপ্তর থেকে অগ্রিম বুকিং করতে হয়। খালি থাকলে মোহনই দেখভাল করে। প্রতিটি হাটের দক্ষিণা ১০০ টাকা।

নীচে জেলা পরিষদের দুটি বাংলো আছে। অপেক্ষাকৃত ভাল। জেলা পরিষদের বাংলোর সাথে টয়লেট বাথের ব্যবস্থা আছে। এদের দক্ষিণা ১৫০ টাকা। সকল হাটের দায়িত্বই মোহনের।

আজ ২৩ শে সেপ্টেম্বর বেদনীতে বিশ্রামের দিন। যাত্রার পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সুউচ্চ পাহাড়ে ট্রেকিং-এর জন্য পথে ২/১ দিন বিশ্রাম নেওয়া সমীচীন। একটানা চড়াই পথে উচ্চতা জনিত অসুবিধা দেখা দিতে পারে। প্রকৃতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলে এসব সমস্যার অনেকটাই

সমাধান হয়।

গতকালই মোহন সিংয়ের পাশের ঘরে শিবির স্থাপন করেছি। ঘরের আয়তন বেশ বড়। আমার তাঁবুতে আমি একাই। তাঁবুর বাইরে ৩/৪ জন শোয়া যায়। এখানে ভগবান সিংয়ের সাথে আরও দুইজন পোর্টার ঘুমিয়ে ছিল।

গতকাল থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তার গতি অব্যাহত। সারা বেদনী কুয়াশায় ঢাকা। প্রকৃতির খেয়ালের সাথে কোন হিসাবই মিল খায় না। গত ২১শে সেপ্টেম্বর ৭ জনের এক বাঙালী দল বেদনিতে আসে। আজ তাদের বগুয়াবাসা যাওয়ার কথা। আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় আজ তাদের বেদনীতেই কাটাতে হয়।

সকাল ১০টা। মোহনের ঘরে বসে গল্প করে কিছুটা সময় কাটে। মোহন গরম চা খাওয়ায়। বাইরে আবহাওয়া মোটেই পরিষ্কার নয়। ঘরের ছাদ স্লেট পাথরের, তার উপর প্লাষ্টিক চাদর। প্লাষ্টিকের উপর বৃষ্টির শব্দ ঘরে বসেই শুনতে পাচ্ছি। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারা, মেঘ, কুয়াশা ইত্যাদি নিয়ে অন্ধকার ঘরে বসেই কাটাতে হচ্ছে। শুনেছি নির্মল আকাশের নীচে রৌদ্রস্নাত বেদনীর রূপের কোন সীমা নেই। বেদনীর বুকে ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, নীলকণ্ঠ, হাতি চৌখাম্বা ইত্যাদি তুষারশুভ্র শৃঙ্গগুলিকে দেখে দেখে আশা মেটে না।

আজ ২৪শে সেপ্টেম্বর, ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙ্গে। ঘরে ভগবান সিংও আন সিং ঘুমিয়ে আছে। গতকালই আন সিংয়ের সাথে প্রথম আলাপ। বাঙালী দলের মালবাহক। দুটি ঘোড়া নিয়ে বাঙালী দলের সাথে এসেছে। মিষ্টি চেহারা। ব্যবহার ও কথায় আন্তরিকতা মিশ্রিত। চুপিসারে বাইরে যাই। ঘরে এসে ভগবানকে ডেকে দিই। পাশের ঘরে মোহন জেগে আছে। ওর রেকর্ড প্লেয়ারে মা-নন্দাদেবীর স্তুতি গান শুনতে পাই। এদিকে ভগবানের চা প্রস্তুত। আন সিং-কে চা-পানে আহ্বান জানাই। তিনজনে চায়ের আসর জমাই।

বৃষ্টি নেই। চারিদিকে মেঘে ঢাকা আকাশ। প্রকৃতি বিষণ্ণবদনা। ভ্রমণ সূচি অনুসারে আজ আমাদের বগুয়াবাসা যাত্রার কথা। প্রকৃতির রূপ দেখে সেকথা ভাবতেই সাহস হয় না। এ বুঝি শঙ্কর ভগবানের পরীক্ষা। আমিও জেদ ধরেছি — যতদিন সূর্যদেবের দর্শন না পাচ্ছি, ততদিন এখানেই থাকছি।

এই মুহূর্তে বৃষ্টি বিরতি টানে। সেই সুযোগে ভগবানকে সাথে নিয়ে বেদনী বুগিয়াল পরিক্রমা করি। বেদনীকুণ্ডের চেহারা দেখে দুঃখ পাই। সাড়ে বারো হাজার ফুট উচ্চতায় প্রকৃতির অনন্য সৃষ্টি, বেদনী বুগিয়াল ও বেদনী কুণ্ড। এ হেন বুগিয়ালের কোন আদর নেই। কোন যত্ন নেই। সমগ্র বুগিয়ালের পরিচ্ছন্নতার কোন বালাই নেই। মেষ, ঘোড়া, গরু ছাগলের ছড়াছড়ি, প্লাষ্টিক দূষণে জর্জরিত। কুণ্ডের জল শুষ্ক প্রায়।

কুণ্ডের ধারে দুটি মন্দির। মন্দিরে কোন 'শ্রীই' অবশিষ্ট নেই। পর্যটকগণ ভক্তিভরে মনের অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

আজ বেদনী বুগিয়ালে বেদনার মধ্যেও আনন্দ অনুভব করি। আজ তিনদিন বেদনীতে বসে আছি। শঙ্কর ভগবান মঙ্গলময়। তিনি জীবের মঙ্গলই করেন। আজ আবহাওয়া অনেকটাই ভাল। সকাল থেকে বৃষ্টির দাপট অনেকটাই কম। মেঘের লুকোচুরি সমানেই চলছে।

গতকাল 'আজ তকের' এক প্রতিনিধি শশিভূষণ মৈথানি রূপকুণ্ড করে বেদনী এসেছে। বেদনীতে উপস্থিত সকল পর্যটকের সাথেই সে কথা বলতে চায়। সেইমত সকলকেই বেদনী কুণ্ডের তীরে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানায়।

যথাসময়ে সকলে উপস্থিত হয়। বাঙালী ছেলের দল পিঠে রুকস্যাক নিয়ে ট্রেকিং-এর মহড়া দেয়। শশীভূষণ তার ক্যামেরায় সব কিছুই ধরে রাখে। বাড়ি গিয়ে পর্দায় নিজেদের দেখতে পাব ভেবেও আনন্দ পাই।

আজ ১২টার মধ্যেই মধ্যাহ্ন আহার সেরেছি। আহারের পর ভগবানকে সাথে নিয়ে বেদনী Top-এ যাই। দূর থেকে রূপকুণ্ড ফেরৎ যাত্রী দেখতে পাই। চিৎকার করে শুভেচ্ছা জানাই। ছুটে কাছে যাই। পরিচয়ে জানতে পারি ভাস্কর মুখার্জী। কলকাতা আনোয়ার শা রোড থেকে এসেছেন। চার বন্ধু রূপকুণ্ড দর্শনে এসেছেন।

চারজনই বনবিভাগের বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছেন। ওনাদের আস্তানায় গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে সকলের সাথে আলাপ করে আসি। সে পরিচয় হিমালয়ের মতই উদার। আনন্দ পাই ভাস্কর বাবুর কথায় — "অমিত তাদের রেসের ঘোড়া"। দলে অমিত কনিষ্ঠ, আর সকলেই ছয়ের কোঠায়। অমিতকেই

সব ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হয়। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘরে ফিরি।

আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ঘড়িতে সকাল ৫টা। ঘুম ভাঙ্গতেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাই। তাঁবুতে বসেই ঠাকুরের নাম জপ করি। ভগবান চা তৈরি করে সকাল ৭টায়।

আজ চারদিন বেদনীতে বসে আছি। কি সিদ্ধান্ত নিই, বুঝে উঠতে পারছি না। চিন্তায় পড়ে যাই। মনের ভিতর কে যেন শক্তি যোগায়। — যার জন্য এসেছিস্ অপেক্ষা কর। তাড়া হুড়া করলে হিমালয় দর্শন হয় না। ধৈর্য ধর। অনেক পাবি। — আরও দু-চার দিন বেদনীতে থাকার সিদ্ধান্ত নিই।

সকাল ৮টায় অমিতদের Hut-এ যাই। ওদের চার জনের দল। গতকাল রূপকুণ্ড করে ফিরেছে। গতকালই প্রথম আলাপ। হিমালয়ের বুকে বাঙালী পর্যটকের দেখা পেলে খুবই আনন্দ হয়। অমিত বয়স্ক দাদাদের নিয়ে হিমালয় দর্শনে বেরিয়েছে। সুশীলবাবু, তপনবাবু, ভাস্করবাবুদের সাথে আলাপে খুবই আনন্দ পাই। হিমালয় প্রেমী মানুষ, হিমালয়ের পথে ঘুরে ঘুরে মনটাও হিমালয়ের মত তৈরি করেছেন। ওনারা আজ নীচে নেমে যাচ্ছেন। ওদের বিদায় জানাতে ওদের ঘরে যাই। ওদের গাইড জহর সিং গোয়ালদামের লোক। জহর খেলাপের ওখানে আমাকে দেখেছে। ওদের ঘরে যেতেই গরম চায়ের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দেয়। ওদিকে ঘোমটার আড়ালে অভিমানী প্রকৃতি অনেকটাই ঘোমটা সরাতে শুরু করেছে। জানিনা কবে তার হাসি মুখ দেখতে পাব। নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি হয়েই চলেছে। সে বৃষ্টির তেমন গতি নেই। অমিতরা বর্ষাতি ও ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে পথে নামে। অমিতদের বিদায় জানিয়ে আস্তানায় ফিরে আসি। বৃষ্টির কোন বিরাম নেই। অমিতরা ধীর পদক্ষেপে ওয়ানের পথে এগিয়ে চলে। বৃষ্টি মাথায় উৎরাই পথে ওদের কতই না কষ্ট হবে। ঘরে বসে ওদের কথাই ভাবতে থাকি আর বৃষ্টির শব্দ শুনি। মাঝে মাঝে মেঘের কুণ্ডলী দেখে সময় কাটে। শঙ্কর ভগবানকে ডাকা ছাড়া আজ আর কোন কাজ দেখিনা।

আজ প্রকৃতি দ্রুত রূপ পাল্টায়। ধীরে ধীরে বৃষ্টির শব্দ থেমে যায়। মেঘের কুণ্ডলী দৃষ্টির আড়াল হয়। মধ্যাহ্নে ক্ষণিকের জন্য সূর্যদেব দেখা দেয়। হঠাৎই এক বাঙালী পর্যটকের গলা শুনতে পাই।

বাঙালীর গলা পেয়ে ঘর থেকে বাইরে আসি। ভদ্রলোক মোহনের উনানের পাশে বসে হাত পা সেঁকে নিচ্ছেন। হাতে চায়ের কাপ।

ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। কবে কোথায় আমার সাথে দেখা হয়েছে ঠিক মনে রেখেছেন। ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পেরে স্মৃতির পাতা থেকে আমার নাম উদ্ধার করেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছুতেই মনে করতে পারি না। কোথায় আলাপ হয়েছে? পাহাড় প্রেমী মানুষটি প্রথম পরিচয়ের ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে স্মরণ করিয়ে দেন। আমিও স্মৃতি রোমন্থন করে অতীতের ঘটনাগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করি। প্রদীপ কুমার দে। দুই বছর পূর্বে যোশীমঠে নন্দাদেবী হোটেলে ক্ষণিকের দেখা।

আজ আর যোশীমঠ নয়। সেদিন যে পরিবেশে আলাপ, আজ তার বিপরীত মেরু। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোলাহলে হোটেলের ঘর। আর আজ ধ্যানময় হিমালয়ের গহন অন্তঃপুরে বেদনীর বুকে। পরস্পরের সম্পর্ক শঙ্কর ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়।

বিকাল ৩টে। সূর্যদেবের মুখে হাসি দেখে সকলেই প্রাণচঞ্চল্যে মেতে ওঠে। প্রদীপদের দলকে শুভেচ্ছা জানাতে জেলা পরিষদের ঘরে যাই। দলের বয়স্ক সদস্যের উক্তি, শুভেচ্ছা কেন? — আপনারার সূর্যদেবকে সাথে নিয়ে এসেছেন তাই আপনাদের প্রণাম জানাই।

প্রদীপ দে বলেন, আজ সকালে মহালয়ার অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। পিতৃ পক্ষের অবসান, আর বৃষ্টি হবে না —

'মহালয়া' — এই কথাটা শুনে চমকে উঠি। মহালয়ার দিন ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাস্টারকে ছেড়ে দূরে আছি — ভাবতেই পারি না। অতি প্রত্যুষে মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্যোক্তা কোয়ার্টার মাষ্টার। অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেনের হাতে চা — এসব দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। অনুষ্ঠান শেষে স্বপনকে সাথে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে তর্পণ — এসব জীবনের অঙ্গ।

অথচ বেদনীতে বসে দীর্ঘ পাঁচদিন ধরে মেঘ, বৃষ্টি বাতাস ও কুয়াশার কুণ্ডলী দেখতে দেখতে কিছুই মনে করার সুযোগ পাইনি। সবই শঙ্কর ভগবানের

ইচ্ছা। তাঁর সকল ইচ্ছা মেনে নিতে আমার কোন অনীহা নেই। যাকে দিয়ে যেমন হয়, তাকে দিয়ে তিনি তেমনটি করিয়ে নেন।

দীর্ঘদিনের অভ্যাস সহজে ভোলা যায় না। মহালয়ার দিন আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে। তাঁর সুমধুর কণ্ঠে মনমাতানো চণ্ডীপাঠ শুনতে বাঙালীমাত্রেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ থাকেন।

মহালয়ার অনুষ্ঠান পারিবারিক ট্রেকিং টীমের ঘরোয়া অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ঐ দিনটিতে টীমের কোন সদস্যই বাইরে থাকুক — মোটেই কাম্য নয়। অতি প্রত্যুষে সকলেই শয্যা ত্যাগ করে। গৃহকোণ ধূপের গন্ধে ও প্রদীপের আলোয় সুসজ্জিত হয়। সকলেই মনের মন্দিরে মহামায়াকে বরণ করে। শুদ্ধদেহে ও শুদ্ধ চিত্তে চণ্ডীপাশের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেনের চা-পরিবেশনে এক বাড়তি মাত্রা যুক্ত হয়। এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের।

এবারে কার নির্দেশে এসব অভ্যস্ত ব্যবস্থা থেকে দূরে হিমালয়ের কোলে, গিরিরাজের চরণ তলে ঠাঁই পেয়েছি, সেটা নিজেও ভাবতে পারি না। তবে, আমার অনুপস্থিতি ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাষ্টারের মনে যে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে, সেটা বেদনীতে বসেই অনুভব করি।

দুর্বল মন, অশুভ চিন্তাই মনে অধিক পরিমাণে ভিড় করে। জানি না কোন অপরাধে প্রকৃতি আমার প্রতি বিমুখ হয়। পরমুহূর্তে কে যেন মনে শক্তি সঞ্চার করে — প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে চলে। প্রকৃতিই ভগবান। প্রকৃতির নিয়মই ঈশ্বরের নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়ার শক্তি অর্জনের নাম সাধনা। যিনি প্রকৃতির নিয়মকে যতটা মেনে নিতে পারেন তিনি ততটাই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেন।

ইতোমধ্যে আকাশ অনেকটাই পরিষ্কার হয়। অপরাহ্ন বেলায় সামরিক বাহিনীর এক ট্রেকিং টীম বেদনীতে এসে উপস্থিত। রাজস্থান থেকে এসেছে। দলের মোট সদস্যা সংখ্যা ১৫। দুইজন 2 officer, 2 junior officer & 11 in other ranks. অফিসার দলের সুবেদার Antmaram Chowdhury এবং Jogendra Sarma। এঁদের সাথে আলাপ হয়। আমার পাশের ঘরেই আশ্রয়

নিয়েছেন। অন্য সদস্যরা PWD-র হাটে আশ্রয় নিয়েছে। সামরিক বাহিনীর ট্রেকিং। যাত্রার পূর্বেই সকল রকম নিয়ম-কানুন জেনে যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব শেষ করতে হয়। সুবেদার আত্মারামের মুখে এদের (Programme) পর্যটন সূচি শুনে বেশ আনন্দ পাই।

Total Trek 450 km. Trekking started from Kedarnath on 5th Sept. 2003. Leader of the Team is Captain - Manish Chowhan. 450 km. trek from Kedarnath to Goaldam via - Gourikund, Sonprayag, Gouptkashi, ukhimath, Mondal, Gopeswar, Chamoli, Pipulkothi, Helong, Joshimath, Bishnuprayag, Badrinath, Hemkund Sahib, Ghangaria, Gobindghat, Joshimath, Tapaban, Kuaripass, Pana, Jhihi, Gonatal, Kanol, wan, Bedni & Rupkund. Programme will be ended at Gowaldam.

অফিসারগণ ট্রেকিং পছন্দ করেন। তাই নবীনদের নিয়ে পোগ্রাম করেছেন। সঙ্গে পোর্টার, কুক, গাইড সবকিছুই আছে। সামরিক লোকেরা আমার দেশের জোয়ান। জোয়ানদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। তাদের দলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে ঘরে যাই।

বেদনী — বগুয়াবাসা

২৬শে সেপ্টেম্বর। বেদনীকে বিদায় জানিয়ে বগুয়াবাসার পথে যাত্রা। গত ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচদিন বেদনীতে বসে আমাকে পরীক্ষা দিতে হয়। এ পরীক্ষা ধৈর্যের পরীক্ষা। সাহসের পরীক্ষা, বিশ্বাসের পরীক্ষা। অনেকেই বর্ষণমুখর প্রকৃতির মেঘে ঢাকা রূপ দেখে নীচে নেমে আসতে শুরু করেন, আমিও জেদ ধরি — যত দিন না সূর্যের মুখ দেখছি ততদিন বেদনীতেই বসে থাকব। আমার জেদের কাছে প্রকৃতিও হার মানে।

মেঘ কেটে যায়, সকাল থেকেই প্রকৃতি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। প্রভাতী সূর্যকিরণে বেদনীকে দেখে আনন্দে পাগল হয়ে যাই। বিগত দিনের সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি ভুলে যাই। বেদনীর এত রূপ, এত ঐশ্বর্য সামান্য পূর্বেও ভাবতে

পারিনি। তুষারময় পর্বতমালা এত নিকটে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, নীলকণ্ঠ, হাতি, চৌখাম্বা ইত্যাদি শুভ্র উষ্ণীষধারী গিরিশৃঙ্গগুলি শুচিস্মিতা প্রকৃতির কোলে সহাস্যে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। হে গিরিরাজ! তোমার এ জ্যোতির্ময় প্রাণময় মূর্তি এত দিন কোথায় ছিল? আমার কোন অপরাধে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলে? আজ আমি অভিমানী। হে ত্রিভুবনেশ্বর! আমার সকল অহঙ্কার আমার চোখের জলে ভাসিয়ে দাও।

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ কর প্রভু! রূপকুণ্ডের পথে তোমার ধ্যানময় মূর্তি সর্বদাই আমার হৃদয় মন্দিরে জাগ্রত থাকুক। তুমি সর্বদাই কল্যাণময়। অহর্নিশ জীবের সান্নিধ্য থেকে জীবের মঙ্গল সাধন তোমার ব্রত। তুমি আমার অন্ধের যষ্টি। তোমার হাত ধরেই দুর্গম পথে এগিয়ে চলেছি।

বেদনীর বুকে পাঁচ রাত্রি কারাবাসের সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। বেদনীর আকাশ বাতাস পরম পবিত্র ও তীর্থময়। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে স্বর্গীয় সুষমা মিশ্রিত। সুবিশাল অঙ্গনের প্রতিটি উপলখণ্ডে দেবত্বভাব ও অধ্যাত্মভাব বিরাজিত। মহর্ষি ব্যাসদেবের আবাসভূমি। হিমালয়ের সুবৃহৎ পর্বতগাত্রে সুপ্রশস্ত আসনে মহর্ষি সৃষ্টির অনুশাসনে চতুর্বেদ রচনা করেন — ঋক, সাম, যজু, অথর্ব। বেদ থেকেই স্থানের নাম হয় বেদনী। বেদের প্রতিটি শ্লোক লিপিবদ্ধ করেন গণেশজী। গণেশজী লেখার দায়িত্ব না নিলে মহর্ষির মুখনিসৃত প্রতিটি শ্লোকই কালের অতল গর্ভে ডুবে যেত। গণেশজীর প্রচেষ্টায় বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, উপনিষদ আজ শাশ্বত। তাই গণেশজীকে বলা হয় God of Success. রূপকুণ্ডের পথে পার্বতী নন্দন কৈলুবিনায়ক গণেশজী সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

সকাল ৭-৩০ মিঃ। মোহনের হাতে চা খেয়ে পথে নামি। মোহনের দোকান পিছনে পড়ে থাকে। বেদনীকুণ্ডকে বাঁহাতে রেখে পথ উঠেছে পাহাড়ের মাথায়। অনিন্দ্য সুন্দর বুগিয়ালের এক প্রান্তে সুবৃহৎ সুপ্রশস্ত সুপেয় সরবরের সৃষ্টি প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল। বেদনী বুগিয়ালের বুকে সৃষ্টি তাই নাম হয় বেদনী-কুণ্ড।

গত পাঁচদিন মেঘে ঢাকা বেদনীতে বসে কিছুই দেখতে পাইনি। সকাল

থেকেই প্রকৃতি হাস্যোজ্জ্বল। নন্দাঘুন্টিকে সম্মুখে রেখে এগিয়ে চলেছি। কুড়ি মিনিটে চড়াই পথে পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়াই। পিছন ফিরে বেদনীকে বার বার দেখি। আজ সূর্যকিরণে বেদনী রূপের বাহারে ফেটে পড়েছে। চিরকুমারী চির সুন্দরী বেদনীকে দেখে আশ মেটে না। বেদনীর কচি হাতের আহ্বানে মন পিছু টানে। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে বেদনীকে ছবির মত দেখায়। দূরে কয়েকটি মেষপালকের ছানি দেখতে পাই। ঐ যে কালো রঙের এক ঝাঁক পাখি এসে বসেছে পাহাড়ের ঢালে। নন্দাঘুন্টির সন্দর্শনে সকল ক্লান্তি ভুলে যাই।

বাঁহাতে বেদনী বুগিয়াল ডানহাতে পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে সুমসৃণ পথ। হঠাৎ পথ বেঁকে যায়। ডানহাতের পাহাড় বাঁ-হাতে চলে আসে ডান। হাতে অনেক নীচে আর এক বুগিয়াল দেখতে পাই। ২/১টি মেষপালকের ছানি দেখা যায়। অজানা, অদেখা স্রোতস্বিনীর গর্জন কানে আসে, নুতন বুগিয়ালের কেন্দ্রে বেদনী অনেক আগেই দৃষ্টির আড়াল হয়। আর এক সুন্দর জলাশয় চমৎকার দেখায়। ভগবান সিং জানায় এ বুগিয়ালের নাম 'কুর্মোতোলী'।

সুমসৃণ পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। এত উঁচুতে এত সুন্দর পথ পাব ভাবতেই পারিনি। মাঝে মাঝে বেরসিক মেঘ সূর্যদেবকে আড়াল করে। গত পাঁচদিন সে জগতটাকে ঢেকে রেখেছিল, এই আসে, আবার লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়।

বেলা ১০টা। সুন্দর পথে পাতরনাচুনী পৌঁছাই। বেদনী থেকে ৫ কিমি পাতর নাচুনী। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোমুগ্ধকর, স্থান মাহাত্ম্য ও ভৌগলিক পরিমণ্ডল অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পাতরনাচুনী দেখে সহজেই মনে হয় — দীর্ঘ দেহী প্রস্তরময় মূর্তি সমূহ অনন্তকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

কথিত আছে গাড়োয়াল রাজ বংশের কোন এক রাজা রাজ জাত উৎসবে অংশ নিয়ে অধার্মিক আচরণ করেন। তাঁর আচরণে মা নন্দাদেবী অসম্মানিত হন। নন্দাদেবীর রোষ বহ্নিতে রাজারই 'নর্তকীগণ, 'দাসীগণ' ও আরও অনেকে প্রস্তরময় মূর্তিতে পরিণত হয়। পাতরনাচুনীর প্রস্তর মূর্তিগুলি তারই নিদর্শন মাত্র। পাতরনাচুনীতে এসে ভগবান পিঠের বোঝা নামায়। সাথের শুকনো খাবার দিয়ে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিই। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু।

পাতরনাচুনীর পর থেকেই চড়াই পথের শুরু, একটানা চড়াই। একটার পর একটা বাঁক অতিক্রম করে এগিয়ে যাই। প্রাণান্তকর চড়াই। দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিই। অধিক বিশ্রামের অবকাশ নেই। মধ্যাহ্নের সূর্যদেব মাথার উপর থেকে নেমে গেছে। ক্লান্ত দেহটা টানতে টানতে একটা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। বেলা সাড়ে ১২টা। পাতরনাচুনী থেকে ৫ কিমি। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতা গণেশজী। স্থানের নাম কৈলুবিনায়ক। পূর্বেই বলেছি গণেশজী এ পথে মহর্ষি ব্যাসদেবের মুখ নিসৃত শ্লোক গুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারই স্মৃতিতে কৈলুবিনায়ক।

বিনায়কজী (গণেশজী) সফলতার প্রতীক। গণেশজীকে প্রাণ ভরে পূজা দিয়ে এপথে অগ্রসর হওয়াই নিয়ম। আমিও গণেশজীর চরণে পূজা দিই। বিস্কুট, লজেন্স, ধূপকাঠি, ইত্যাদির সঙ্গে উপকরণ ভক্তি দিয়ে পূজার থালা সাজাই।

কৈলুবিনায়কের আশীর্বাদ নিয়ে পুনরায় বগুয়াবাসার পথে পা বাড়াই। কৈলুবিনায়ক থেকে বগুয়াবাসা ২ কিমি। উপলখণ্ড বিছানো পথ। অপেক্ষাকৃত সমতল। দ্রুত এগিয়ে চলি। বেলা ঠিক দেড়টায় বাগুয়াবাসার প্রান্ত সীমায় পৌঁছে যাই। বগুয়াবাসা প্রবেশের মুখে সুবিশাল এক ওভারহ্যাঙ্গের নীচে পাথর দিয়ে তৈরি পর পর দুটি অস্থায়ী আস্তানা। প্রথমটিতে এক বাঙালী পর্যটকের দেখা পাই। মধ্যমগ্রামের ছেলে। তাপস। একাই এসেছে রূপকুণ্ড করতে। সঙ্গে দুজন পোর্টার নিয়েছে। তাপসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে যাই। অসংখ্য বোল্ডার ছড়ানো প্রান্তর। বগুয়াবাসার (১৪৫০০) সমতল প্রান্তরে এসে পৌঁছাই। ডানহাতে টেন্ট পিচিং শিবির স্থাপনের বেশ কয়েকটি সমতল ভূমি। বাঁ হাতে পাথর সাজিয়ে তিন কামরাযুক্ত একটি বড় ঘর। তাঁবু না থাকলে পর্যটকগণ ঐ সকল ঘরে রাত্রিবাস করতে পারেন। তবে সঙ্গে বিছানাপত্র থাকা চাই।

আমি বগুয়াবাসায় পৌঁছানোর পূর্বেই প্রদীপ দে তাঁর দল নিয়ে বগুয়াবাসায় উপস্থিত হয়েছেন। প্রদীপবাবুও বগুয়াবাসায় শিবির স্থাপন করেছেন। ভগবানকে সাথে নিয়ে আমিও বগুয়াবাসায় শিবির স্থাপন করি।

অপরাহ্নের সূর্যকিরণে বগুয়াবাসা উদ্ভাসিত। উত্তর দিগন্তে নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলের সন্দর্শনে পথ চলার ক্লান্তি ভুলে যাই। বগুয়াবাসার নিজস্ব রূপ সৌন্দর্য

ও ঐশ্বর্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

আজ বার বার ক্যাপ্টেন ও কোয়ার্টারমাষ্টারের অভাব অনুভব করি। পারিবারিক ট্রেকিং টীম তৈরি হয়েছিল যাঁর ইচ্ছায় তিনিই কি আমাকে টেনে এনেছেন এ পথে? এপথে আসার পশ্চাতে কোয়ার্টারমাষ্টারের অবদান সর্বাধিক। বগুয়াবাসার বুকে অমৃত আহরণ, ব্রহ্মকমল পুষ্পচয়ন। ফেনকমলের সন্দর্শন সবই কোয়ার্টারমাষ্টারের প্রাপ্য।

বগুয়াবাসার উচ্চতা চৌদ্দ হাজারের অধিক। যে কারণে ঠাণ্ডার আধিক্য অনেকটাই বেশী। আজ বগুয়াবাসার বুকে রূপকুণ্ডে যাত্রার 'বোধন' অনুষ্ঠান পালিত হয়। দেবাশিস দের দলের পথ প্রদর্শক গোয়ালদামের জহর সিং। দলের অধিনায়ক প্রবীর দে। অন্যান্য সদস্য — ধনঞ্জয়, শিবপ্রসাদ, দুলাল ও জগদীশ। অপরাহ্ণ বেলায় অস্তায়মান রবির বিদায়ক্ষণে জহর সিং সকলের হাতে গরম চায়ের পেয়ালা তুলে দেয়। বগুয়াবাসার বুকে নন্দাঘুন্টির সন্দর্শনে এমন অনুষ্ঠান ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে। বাড়ি থেকে যাত্রাকালে কোয়ার্টারমাষ্টার হাওড়া স্টেশনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে চলে যায়। আজ বগুঁয়াবাসায় এতজনের সান্নিধ্য পেয়ে খুবই আনন্দ অনুভব করি।

সূর্য গেল অস্তাচলে। বগুয়াবাসাতে আঁধার নেমে আসে। শীতের তীব্রতায় তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করি। রাতে ভগবান আমার পাশেই শয্যা গ্রহণ করে।

বগুয়াবাসা — রূপকুণ্ড

শুনেছি রূপকুণ্ড রহস্যময়ী। রহস্যের অন্তরালে যাঁর নিত্য আবাসভূমি, যে কুণ্ডে রূপের প্রতিফলন হয়, যাঁর সন্দর্শনে দেহ মনে পরম আনন্দ ও চরম তৃপ্তি আনয়ন করে তিনিই পরমানন্দময়ী, অন্তর্যামিনী, জগদ্ধাত্রী, সিংহবাহিনী অষ্টভূজা দেবী নন্দার প্রতীকী রূপ, রূপকুণ্ড।

সুউচ্চ হিমালয়ের তুষারময় রাজ্যে রূপের সাগরে যিনি ডুবে আছেন, তিনিই রূপকুণ্ড।

মা পরমেশ্বরী শত নামে ভূষিতা। কখনও পার্বতী কখনও নন্দাদেবী।

সৃষ্টির আদি পর্বে যিনি পরমেশ্বরের পরিপূরক তিনিই পরমেশ্বরী। উভয়ই অভিন্ন, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য।

হিমালয়ের ত্রিশূলী পাহাড় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের। কথিত আছে টেহরী রাজকন্যা মা নন্দাদেবীর শ্বশুরালয় ঐ ত্রিশূলী পাহাড়। মা পরমেশ্বরী শ্বশুরালয়ের পথে আপন রূপ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরমেশ্বর শঙ্কর ভগবান মায়ের ইচ্ছা পূরণে ত্রিশূলী পর্বতের পাদদেশে এক স্বচ্ছ সুপেয় হ্রদের সৃষ্টি করেন। মা ঐ স্বচ্ছ কুণ্ডের জলে আপন রূপের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেন। সেই থেকে ঐ কুণ্ডের নাম হয় রূপকুণ্ড বা পার্বতী কুণ্ড।

নন্দা মায়ের শ্বশুরালয় ত্রিশূলী পর্বতে। বাপের বাড়ি থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে মা রূপকুণ্ডের তীরে কেশবিন্যাস করেন। মায়ের চরণ স্পর্শে রূপকুণ্ড মহা পবিত্র। অমৃতময়ী। পরম পবিত্র রূপকুণ্ডকে অপবিত্র করার অধিকার কারো নেই।

রূপকুণ্ড সৌন্দর্যের প্রতীক, জীবের কল্যাণে ও শ্রীবৃদ্ধিতে এর সৃষ্টি। এর প্রতিটি বারি বিন্দু গাড়োয়াল ও কুমায়ুনবাসীর মহৌষধ। এ হেন রূপকুণ্ডকে অসম্মানের কোন ক্ষমা নেই। তাইতো রূপকুণ্ড রহস্যময়ী। সত্যযুগের কথা, রাজা দক্ষপ্রজাপতি ছিলেন দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। মা পরমেশ্বরী তাঁর ঘরে কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। বাবা-মায়ের আদরের কন্যা সতী। অহংকারী রাজা আপন কন্যাকে পরমেশ্বরীর মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। পরমেশ্বরী ছিলেন পরমেশ্বরের উপাসক। তিনি পরমেশ্বর শঙ্কর ভগবানকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। কন্যার আচরণে রাজা ক্ষুব্ধ হন।

তিনি মেয়ের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পারিবারিক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রাজা আপন কন্যাকে আমন্ত্রণ না করে নিজের ও নিজ রাজ্যের মহা সর্বনাশ ডেকে আনেন। কন্যা সতী লজ্জায়, ঘৃণায়, অবুঝ পিতার আচরণে অধৈর্য হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

ত্রেতাযুগে পরমেশ্বরী এসেছিলেন মিথিলার রাজা জনকের ঘরে। বাবা-মায়ের আদরের কন্যা "জানকী"। জানকী মিথিলাবাসীর ঘরের মেয়ে।

দ্বাপরে মা আসেন হিমাচল রাজের ঘরে। বাবা-মায়ের আদরের কন্যা

"উমা" শঙ্কর ভগবানকে পতি রূপে লাভ করেন। শঙ্কর ভগবান উমাকে নিয়ে কৈলাসে গমন করেন।

কলিযুগে "মা" পার্বতী টেহরী রাজের ঘরে কন্যা রূপে আবির্ভূতা হন। বাবা মায়ের আদরের মেয়ে নন্দা। রাজা স্বপ্নাদেশে তার ঘরে মহামায়ার শুভাগমন বার্তা অবগত হন। দ্বিতীয় স্বপ্নাদেশে চার শিংযুক্ত ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে যথার্থ মর্যাদায় মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠানোর আদেশ প্রাপ্ত হন।

দৈববাণীর কথা সমগ্র গাড়োয়াল ও কুমায়নে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা কিছুতেই ত্রিশূলী পাহাড় ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। অবশেষে দেশে মহামারী ও মড়ক দেখা দেয়। দেশের স্বার্থে শত শত প্রজার প্রাণের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত এই মর্মান্তিক কাজে লিপ্ত হন।

সমগ্র গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে শিংওয়ালা ভেড়ার সন্ধান চালানো হয়। ভেড়াও মিলে যায়। কোন এক শুভক্ষণে গাড়োয়ালের মেয়ে নন্দাকে কনের সাজে ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে মহা শোভাযাত্রা সহকারে ত্রিশূলী পাহাড়ের দিকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভেড়াটি আপন মনে তুষারময় হিমালয়ের পথে চলতে চলতে এক সময় দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। আপন সন্তানকে এমনি ভাবে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসা খুবই মর্মান্তিক। সেই অতীত কাল থেকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের মানুষ সেই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে থাকেন। ঐ অনুষ্ঠান "নন্দাজাত" নামে খ্যাত। এই কাহিনীর অবতারণার কারণ নন্দাজাত অনুষ্ঠানের পথ ধরেই আমাদের রূপকুণ্ডের যাত্রা পথ।

বগুয়াবাসা পর্যন্ত পথের বর্ণনা পূর্বেই দিয়েছি। আজ ২৭শে সেপ্টেম্বর বগুয়াবাসা থেকে রূপকুণ্ড যাত্রা। অর্থাৎ ১৪.৫০০ ফুট থেকে ১৬.৫০০ ফুটে আরোহণ। দূরত্ব ৫ কিমি।

অতি প্রত্যুষে তাঁবুর ঘরে ঘুম ভাঙ্গে। বিছানাতে বসেই গুরুজীকে স্মরণ করি। তাঁবুর পর্দা সরাতেই নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলী শৃঙ্গের মূর্তি দণ্ডায়মান। অপূর্ব সে দৃশ্য। তাঁবুতে বসেই গিরিরাজকে প্রণতি জানাই। বগুয়াবাসায় এসে নির্মল প্রকৃতির কোলে প্রভাতী সূর্যকিরণ উদ্ভাসিত শুচিশুভ্র গিরিশৃঙ্গের দর্শন পাব ভাবতেই পারি নি। একেই বলে "কৃপা"। তার কৃপা হলে অসম্ভব সম্ভব হয়। অসুন্দর

সুন্দর, কঠিন সহজ হয়। চাই বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

সকাল ৬টা। ভগবান চা এনে হাতে দেয়। ভগবানরা আসার পূর্বেই যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে নিই। আজ আর কোন কিছু গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। রূপকুণ্ড দেখে বগুয়াবাসায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিয়েছি। সুতরাং তাঁবুর ভিতর সবকিছু রেখে তাঁবুর Chain বন্ধ করে দিই।

ঠিক সাড়ে ৬টায় যাত্রা শুরু। বোল্ডার সাজিয়ে পথ। পথ মোটেই মসৃণ নয়। সোজা পথে কিছুটা এগিয়ে যাই। বগুয়াবাসা থেকে সামান্য গিয়ে বাঁহাতে ব্রহ্মকমলের উদ্যান। গিরিরাজের চরণে অর্ঘ্য হবার মানসে প্রস্ফুটিত পুষ্প কানন। আরও কিছুটা এগিয়ে ফেন কমলের উদ্যান। বগুয়াবাসা পশ্চাতে পড়ে থাকে। সম্মুখে দুরন্ত চড়াই।

পথ গিয়ে উঠেছে পাহাড়ের মাথায়। খাড়াই পথ। মাঝে মাঝে দু হাতকেও কাজে লাগাতে হচ্ছে। ঘড়িতে সোয়া সাতটা। অর্থাৎ বগুয়াবাসা থেকে আধঘন্টা পথ চলেছি। পথ গিয়ে স্বর্গের সিঁড়িতে মেশে। দুরন্ত সিঁড়ি। স্থানের নাম "চিড়িয়ানাগ"(গাড়োয়ালী নাম)। রূপকুণ্ড থেকে নেমে আসা নীলগঙ্গার গর্জন শুনতে পাচ্ছি। প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারণ। সুউচ্চ পাহাড়, নীল আকাশের নীচে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ উদ্ভাসিত প্রকৃতির রূপ বর্ণনার অতীত। স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙ্গতে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়। স্বর্গে না উঠলেও পাহাড়ের মাথায় উঠেছি। অনেক দূরে প্রদীপের দলের ২/১ জনকে দেখতে পাচ্ছি। দূর থেকে মনে হচ্ছে ঐ লোকগুলো যেন পাহাড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমিও পথের সাথে লড়াই করে চলেছি। আর কত দূর আদৌ বুঝতে পারছি না। ভগবান সিং শুধুই বলে আর দূর নেই। ওর দূর আর শেষ হয় না। অবশেষে সত্যিই এক বরফের দেশে পৌঁছে যাই। প্রদীপের দলের সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানায়। ঘড়িতে পৌনে ৯টা। রূপকুণ্ডে এসে ছয়জন সাথী পাই। ওরাই আমাকে ভরিয়ে দিয়েছে।

প্রভাতী সূর্যকিরণে রূপকুণ্ডের আঙিনা উদ্ভাসিত। সম্মুখে বরফ ঢাকা পথে জিউনারা গলি। ওপারে যাওয়ার সাহস হয় না।

সকলেই একাত্ম হয়ে যাই। আনন্দের জোয়ারে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। ভজন, পূজন, মন্ত্র কিছুই জানা নেই। শুধুই ভক্তি, বিশ্বাস ও মনের জোরে

এতদিন যার হাত ধরে এই দুর্গম পথ পারি দিয়েছি তিনিই আজ সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐ যে নিশান, ঐ যে প্রস্তরময় মন্দির, ঐ তো উপলখণ্ডে দেবতার আসন, ঐ যে শিলামূর্তি। যিনি এনেছেন তার কৃপাতেই দু চোখ ভরে জল আসে। চোখের জলে দেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদান করি। কান্না ছাড়া কিছুই জানা নেই। ভজন, পূজন, মন্ত্র, শাস্ত্র, নিয়ম-বিধি কিছুই শিখিনি। যা দিয়েছো ফিরায়ে লহ তাই। শূন্য করে মোরে চরণে দিও ঠাঁই।

— তুমি যা দিয়েছো তাহাই ফিরায়ে লহ —

আজ আমি একা নই, অনেকের মাঝে একজন। সকলেই ছবি তোলে, সকলের ক্যামেরায় বন্দী হয়ে যাই। ক্যাপ্টেন নেই, কোয়ার্টার মাষ্টার নেই ওদের অভাবে মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ি। দেবাশিস, ধনঞ্জয়, দুলাল ও জগদীশ সকলেই ছোট শিশুর মত রূপকুণ্ডের আঙ্গিনায় বরফ খেলায় মেতে ওঠে। রহস্যময়ী রূপকুণ্ডের তীরে অসংখ্য নরকঙ্কাল বরফের নীচে চাপা পড়ে আছে। শরীরের দীর্ঘতম হাড় (Femer) দেখে মনে হয় সে যুগের মানুষ এযুগের চেয়ে অনেক দীর্ঘ দেহী ছিলেন। আমি ভগবানকে সাথে নিয়ে বরফ ঢাকা কুণ্ডের বুকে নেমে যাই। কুণ্ডের বরফ গলা জলে প্রিয়জনের বিদেহী আত্মার প্রতি জল নিবেদন করি। বাবা-মা, দাদু-দিদার কথা ভাবতে ভাবতে চোঁখে আবার জল আসে। দেহসিক্ত অশ্রুধারা প্রিয়জনের জন্য। শিশি ভরে রূপকুণ্ডের জল সংগ্রহ করি। রূপকুণ্ডের জল মাথায় ছিটিয়ে দিই। ইতিমধ্যে দেড় ঘন্টা কেটে যায়। ভগবান ফেরার কথা মনে করিয়ে দেয়। রূপকুণ্ডের মায়া কাটানো বড় কঠিন। রূপকুণ্ডের রূপসাগরে ডুবে যাই। ভগবানের ডাকে চমকে উঠি। ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ১০টা। ফেরার পথে পা বাড়াই।

রূপকুণ্ড - বেদনী

রূপসী রূপকুণ্ডকে প্রণতি জানিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই। ঘড়িতে সকাল সাড়ে ১০টা। উৎরাই পথ তর তর করে নামতে থাকি। কুড়ি মিনিট ধরে উৎরাই পথে নীচে নেমে আসি। বরফের রাজত্ব সবটাই পিছনে রেখে এসেছি।

রৌদ্র ঝলমল প্রকৃতির কোলে এক মসৃণ উপলখণ্ডে বসে প্রাতরাশ সেরে

নিই। কোয়ার্টার মাষ্টার সাথে নেই। তার দেওয়া Kurkuri দিয়ে ক্ষুধা মেটাই। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। উৎরাই পথে দ্রুত বগুয়াবাসায় ফিরে আসি। ঘড়িতে ১২-২০মিঃ। বেদনীতে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিয়েছি। বগুয়াবাসায় এসে ভগবান সিং চা- তৈরি করে সঙ্গের শুকনো খাবার দিয়ে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিই। আমি মালপত্র গুছিয়ে নিই। পূর্বেই বলেছি সকালে জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেই রূপকুণ্ড যাত্রা করি। ফিরে এসে মালপত্র গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় নষ্ট হয়।

দুলাল ও জগদীশ আন্তরিকভাবে খোঁজ খবর নেয়। ওদের দলের সকলেই আমার পূর্বেই নেমে এসেছে। ওরাও মধ্যাহ্ন আহার সেরে যাত্রা করে।

ঘড়িতে পৌনে একটা। বেদনীর পথে প্রত্যাবর্তন। বিদায় বগুয়াবাসা। যে পথে এসেছি সেই পথেই ফিরে যাওয়া। বাঁ-হাতে পর পর দুখানি ওভার হ্যাঙক ডান হাতে বুগিয়ালে পর পর কয়েকটি তাঁবু দেখতে পাচ্ছি। ঐ তাঁবুগুলো শ্বেতাঙ্গ দলের। গতকালই ওদের বগুয়াবাসায় আসতে দেখেছি। উৎরাই পথে তর তর করে নেমে চলেছি। দেখতে দেখতে কৈলুবিনায়কের দুয়ারে এসে যাই। ঘড়িতে বেলা একটা। প্রকৃতির কোলে একাই সিদ্ধিদাতা গণেশজী পর্যটকগণকে সিদ্ধির আশীর্বাদ দিয়ে রূপকুণ্ডের পথে এগিয়ে দিচ্ছেন।

কথিত আছে গণেশজী এখানে এসেছিলেন সৃষ্টির আদিপর্বে। মহামুনি ব্যাসদেব বেদের শ্লোক রচনা করেন আর গনেশজী সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সৃষ্টি হয় চার বেদ — ঋক্, সাম্, যজুঃ, অথর্ব।

গতকাল রূপকুণ্ডের পথে ক্লান্ত দেহ নিয়ে কৈলুবিনায়কে বেশী সময় দিতে পারিনি। আজ ফেরার পথে মনের সাধ মিটিয়ে গণেশজীর সান্নিধ্য গ্রহণ করি। আজ প্রকৃতি খুবই সহায়ক, হ্যস্যময়ী, সূর্যকিরণ উদ্ভাসিত। নির্মল আকাশের কোলে ত্রিশূল ও রূপকুণ্ড দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে বরফে ঢাকা জিউনারা গলিও দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ কাটানোর সুযোগ নেই। সময়ের তাড়া খেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকি।

দুরন্ত উৎরাই। অতি সন্তপর্ণে দ্রুত নামতে থাকি। ঘড়িতে আড়াইটে। পাতর নাচুনী এসে বসেছি। পাতর নাচুনীর প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন তুলনা

নেই। সবুজের কার্পেট পাতা আঙ্গিনা। অভিশাপ গ্রস্থ নর্তকীগণ অনাদিকাল থেকে প্রস্তরময় রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পদপ্রান্তে গণ্ডশিলায় বসে ক্ষণেক বিশ্রাম। দূরে কুর্মোতলীকে দেখতে পাচ্ছি। পূর্বে এক বুগিয়াল। বুগিয়ালে মেষপালকের ছানি। পরপারে পাহাড়ের গায়ে অতি চমৎকার জলপ্রপ্রাত।

ঐ যে ফিতের মত একফালি পথ দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় কে যেন পাহাড়ের মাথা থেকে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে। ঐ বেণীর পথ ধরে এগিয়ে চলি।

পথ মসৃণ। দ্রুত পা চালাই। দূর থেকে বেদনী চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিগত কয়েকদিন বেদনীকে দেখেছি বর্ষা মুখর। বেদনী আজ কুমারী কন্যার সাজে শুচিস্মিতা। বেদনীর বুকে ছোট ছোট কুণ্ডগুলি সূর্যলোকে প্রস্ফুটিত। আজ বেদনীকে নূতন সাজে, নূতন বেশে দেখি। রূপের জোয়ারে বেদনী আজ উল্লোসিত, অপরাহ্নের মিষ্টি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। নীল আকাশের গায়ে ধ্যানমৌন ত্রিশূল, নন্দাঘুন্টি, নীলকণ্ঠ, হাতি, চৌখাম্বা ইত্যাদি তুষারময় শৃঙ্গগুলি বেদনীর মস্তকে স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। ঘড়িতে সোয়া তিনটে। বেদনীর বুকে ফিরে আসি।

মোহন সিং স্বাগত জানায়। গিরিরাজের চরণে প্রণতি জানিয়ে বেদনীর বুকে শিবির স্থাপন করি। মোহনের দেওয়া গরম দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে বেদনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে যাই।

আজ বেদনীর বুকে নানা রঙের তাবুর মেলা বসে। শুচিস্মিতা প্রকৃতির কোলে , নির্মল নীল সামিয়ানার নীচে সুউচ্চ পর্বত গাত্র। অস্তায়মান রবির সান্নিধ্যে হিমালয়ের দামাল ছেলে মেয়েরা আনন্দ সাগরে অবগাহন করে। পরপারে সকলেই কাছাকাছি এসে যাই। সকলেই একই পরিবারের অঙ্গীভূত। সকলের একটাই পরিচয় রূপকুণ্ডের যাত্রী।

কানপুর থেকে এসেছে সিদ্ধার্থ। আই. আই. টি-র ছাত্র। চার বন্ধু মিলে রূপকুণ্ডের রূপসাগরে ভর দিতে আজই বেদনী এসে শিবির স্থাপন করেছে।

আহেরিটোলার ছেলে শৌভিক ও অশোক দুই বন্ধু এসেছে রূপকুণ্ডের অভিসারে।

বম্বে থেকে এসেছে আশুতোষ ও শর্মিলা। গিরিরাজকে সামনে রেখে,

রূপকুণ্ডের তীরে, জন্ম-জন্মান্তরের অভিন্ন হৃদয়ের শপথ গ্রহণ করে। বেদনীর বুকে হিমালয় ভক্ত ছেলে-মেয়েরা পাগল হয়ে নাচতে থাকে। সুন্দর স্বচ্ছ নির্মল প্রকৃতির কোলে সন্তানের আলোকে পুলকিত গিরিরাজ বেদনীর বুকে নেমে আসেন। ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন হৃদয়ে রূপকুণ্ডের অমৃত ধারা পান করে। সকলের মুখে একই মন্ত্র ওঁ নমঃ শিবায় নম।

বেদনী - লোহাজং

২৮শে সেপ্টেম্বর। অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে সাক্ষাৎ ধ্যান মৌন গিরিরাজকে প্রণতি জানাই। উদীয়মান রবির নবাগত শুদ্ধ কিরণমালায় হিমালয় দেবালয় উদ্ভাসিত। তুষারময় দেব দেউলে গিরিরাজ প্রাতঃসন্ধ্যা মগ্ন। রূপকুণ্ড জয়ের বিজয়োৎসব পালিত হয় বেদনীর বুকে।

সিদ্ধার্থ, আশুতোষ, শর্মিলা, সকলেই উৎসবের মহাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। কৃপাময় গিরিরাজের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যে যার পথে যাত্রা করে।

বিদায়ের পালা। "বেদনীর " মায়া, রূপকুণ্ডের প্রেম, গিরিরাজের পিতৃস্নেহ, সবুজ প্রকৃতির মধুময় সান্নিধ্য, অজানা, অচেনা ভ্রাতৃত্বের আন্তরিক ভালবাসা, এসব ছেড়ে যেতে মন চায় না। নিষ্ঠুর সময় দ্রুত এগিয়ে চলে। ঘড়িতেও সকাল সাড়ে ৯টা। যাত্রা পথে পা বাড়াই।

আজ যাত্রাকালে মোহনের গরম দুধ ও বিস্কুট দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিই। মোহনের ঝুপড়ির ঘর ছাড়িয়ে, পি.ডব্লু.ডি-র লজ হোটেলের সামনে দিয়ে, গণ্ডশিলা দিয়ে বাঁধানো পথ নীচের দিকে নেমে যায়। ঐ পথ ধরে এগিয়ে চলি। পিছন ফিরে যত তাকাই 'নন্দাঘুন্টি' ও 'ত্রিশূল' ইশারায় ডাকতে থাকে। মন পিছু টানে। মাত্র ২০ মিঃ চলেছি। ঐযে অরণ্য ভূমি দেখা দেয়। উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ছেড়ে অরণ্যে প্রবেশ করতে মোটেই ইচ্ছা হয় না। সুগভীর অরণ্যে ঢাকা উৎরাই পথে দ্রুত পা চালাই। অরণ্যের গভীরতায় সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। শোভাময়ী অরণ্য নিজস্ব রূপ ও ঐশ্বর্য্য নিয়ে অনন্তকাল থেকে রূপকুণ্ডের যাত্রীকে পথ দেখায়।

আজ আমাদের গন্তব্য ওয়ান হয়ে লোহাজং। দীর্ঘ পথ, এটাই রূপকুণ্ডের

আসল পথ। বেদনী থেকে ওয়ান ১২ কিমি। ওয়ান খুবই বড় গ্রাম। গ্রামের দৈর্ঘ্য ৩-৪ কিমি। ওয়ান থেকে কুলিং ৩ কিমি। কুলিং থেকে লোহাজং ৫ কিমি। পূর্বেই বলেছি রূপকুণ্ডের পথে হাঁটা শুরু। বেদনী আসার দুটি পথ। প্রথমটি দিদনা, আলীবুগিয়াল হয়ে বেদনী, দ্বিতীয় পথ কুলিং ওয়ান হয়ে বেদনী। আমি প্রথম পথ ধরে উঠেছি। দ্বিতীয় পথ ধরে নামছি।

বেদনী থেকে উৎরাই পথের শুরু। কোথাও এতটুকু চড়াই পাই নি। এ উৎরাই শেষ হয় না। পথ চলার কোন কষ্টও অনুভব করি না। ছায়া সুশীতল পথ। পাথর দিয়ে বাঁধানো পথ। পথের চেহারা দেখে মনে হয় বহু প্রাচীন কালের পথ। সৃষ্টির পর থেকে এ পথে কেউ হাত লাগায়নি। যত্নের অভাবে মাঝে মাঝে পথ ভেঙ্গে মাটির পথ তৈরী হয়েছে। এ পথেই ঘোড়া চলে বগুয়াবাসা পর্যন্ত। অথচ এ পথের দিকে কারও কোন নজর নেই। গভীর জঙ্গল। জঙ্গলের আবাসিকবৃন্দ অসংখ্য প্রাচীন বৃক্ষ, অসংখ্য পক্ষী, ও শ্বাপদকুল, সরীসৃপ।

ঘড়িতে ১০-০৫ মিঃ, অপূর্ব এক বুগিয়ালে নেমে আসি। সুযোগ পেয়ে সূর্যদেব তার কিরণমালা ছড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করে নি। এখানে এসেও ত্রিশূলকে দেখতে পাই। ত্রিশূল যেন পিছন ছাড়ে না। ছোট্ট বুগিয়ালের মধ্যমণি সিমেন্ট ও পাথর বালি দিয়ে তৈরী সুন্দর একটি বিশ্রামস্থল। প্রয়োজনে রাত কাটানো যায়। বুগিয়ালের বিস্তার বিশাল না হলেও সৌন্দর্যের কোন পরিমাপ নেই। এ যেন এক কুমায়নী কিশোরী বেদনীর পথে পর্যটককে অভ্যর্থনা জানায়। ক্লান্ত পথিক সামান্য বিশ্রাম নিয়ে প্রাণ পায়। বুগিয়ালের নাম "গেরিলী পাতল"।

গেরিলী পাতলের পর থেকে আবার উৎরাই শুরু। আবার সেই অরণ্য শোভিত পথ, সূর্যদেবের দেখা নেই। শুধুই রডডেনড্রন, অসংখ্য নাম না জানা বৃক্ষ বনদেবীর নিভৃত আবাস ভূমি।

পথের চেহারা মোটেই ভাল নয়। শুচিস্মিতা প্রকৃতির বুকে কর্দমাক্ত পথ। জুতার তলায় মাটির প্রলেপ। মাঝে মাঝেই স্লিপ কাটে। প্রকৃতি বিরূপ থাকলে এ পথ চলা খুবই কষ্টসাধ্য। মাঝে মাঝে দুই এক চিলতে পাথর বসানো পথ দেখতে পাই, অতীতের পাথর দিয়ে তৈরী পথের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে মাত্র। পূর্বেই বলেছি জন্মের পর থেকে এ পথের গায়ে কোন পরিচর্যার ছোঁয়া লাগেনি।

অবহেলা ও অযত্নে এখন দুর্দশাগ্রস্ত। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ জীবিকার সন্ধানে পর্যটকের সাথী হয়ে এ পথেই বেশী চলাচল করে। অথচ পর্যটন দপ্তরের কোন নজর নেই।

রূপকুণ্ড ট্রেকিং-এর এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ হতে পারে। ওয়ান থেকে বেদনী পর্যন্ত পথের সংস্কার অবশ্যই হওয়া উচিত। দেশী ও বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে, স্থানীয় মানুষের অবস্থার পরিবর্তন আসবে, সরকারের আয় বাড়বে।

ঘড়িতে সাড়ে ১১টা। ঐ যে নীল গঙ্গার নূপুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। বেদনী কুণ্ড থেকে নির্গতা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্রুত যৌবনের কোঠায় পা দেয়। ওয়ানের চরণ ছুঁয়ে যে কেউ কোয়েলের সন্ধানে ছুটে চলে দুই সখীর মিলন ঘটে দেবলের বাসর ঘরে।

তীব্র উৎরাই পথে নীল গঙ্গার বুকে সান বাঁধানো সেতু। কিশোরীর আঁচল লুটিয়ে চলে নৃত্যের তালে তালে। দীর্ঘ সময় পর সূর্যদেবের দর্শন পেয়ে ভগবান সেতুর দ্বার প্রান্তে পিঠের বোঝা নামায়। কিশোরীর সান্নিধ্যে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার পথে নামি।

আজ পথে কোন পর্যটকের দেখা মেলেনি। নীল গঙ্গা পেরিয়ে চড়াই পথে অপূর্ব এক বৃক্ষবাটিকায় উঠে আসি। অপূর্ব এ বৃক্ষকানন। লম্বা লম্বা বৃক্ষ উপরের দিকটা পাতায় ভর্তি। গাছগুলির স্থানীয় নাম "খরসু"। খরসু গাছের পাতা গরু, মহিষ ও ভেড়ার প্রিয় খাদ্য। ভূমিতে সবুজের গালিচা। প্রাণহীন বৃক্ষগুলি ভূমিতে শায়িত। শুকনো কাঠ জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে সূর্যকিরণ এসে পড়েছে। নীল গঙ্গার গান শুনতে পাচ্ছি। ঘড়িতে ১২টা। ভগবান পিঠের বোঝা নামায়। স্থানটি ওয়ান গ্রামের দ্বার প্রান্তে। সুতরাং আহার সেরে নিই।

আহারের পর ভগবান সিং মালের বোঝা পিঠে তুলে নেয়। ধীরে ধীরে ওয়ান গ্রামে প্রবেশ করি। গ্রামের দুটি ছেলে গরুর পাল নিয়ে নীচে নেমে আসে। পাশে দাঁড়িয়ে ওদের পথ করে দিই। পথের বাঁ-হাতে সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী তর তর করে বয়ে চলে। বেশ দূরে দূরে মাঝে মাঝে দুটি একটি বাড়ি দেখা যায়।

ভগবান সিংয়ের বাড়ি ওয়ান গ্রামে। ভগবানের বড়ই ইচ্ছা ওয়ানে একরাত কাটিয়ে পরদিন লোহাজং। ওয়ানে 'লাট্টু মহারাজের' মন্দির খুবই জাগ্রত।

ওয়ানে রাত্রিবাসের জন্য যাত্রীনিবাস (GMVN) আছে। সে সবই গ্রামের ঘন বসতি এলাকায়। গ্রামের ঘন বসতি এলাকা লোহাজং-এর রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। আমরা সে পথ পরিত্যাগ করি লোহাজং-এর সোজা রাস্তা ধরে ধরে ভগবানকে এগিয়ে যেতে বলি।

ইতিমধ্যে গ্রামের এক ছেলে মহিপাল সিং আমাদের সাথে যোগ দেয়। অল্প বয়সী যুবক। মিষ্টি ব্যবহার। সুন্দর কথা বলে, আমাদের সাথেই চলেছে। মাঝে মাঝে রাস্তা ভাঙ্গা। সেখানে মহিপাল আমার হাত ধরে পার করে দেয়। তার গন্তব্য ওয়ানের শেষ প্রান্তে করচা গ্রামে। সেখানে পানি চাক্কি চালিয়ে গম পেশাই করে। দেখতে দেখতে মহিপালের পানি চাক্কি এসে যায়। মহিপাল বিদায় নিয়ে চলে যায়। আমরা এগিয়ে চলি। ওয়ান গ্রামের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে।

ঘড়িতে পৌনে দুটো ওয়ান গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে একটি দোকান দেখতে পাই। নূতন নামকরণ কৈলাস নগর - হীরা সিংয়ের দোকান। দোকানে চা, মুদিখানা, মণিহারী সব কিছুই মেলে।

সুর সিং ওয়ান গ্রামের বাসিন্দা। সুর সিং-এর তিন ছেলে বড় ছেলে সেনা বিভাগে যোগ দিয়েছে। মেজো হীরা সিং নূতন রাস্তার পাশে নূতন দোকান। ছোট ছেলে শিক্ষক-মিত্র। শিক্ষক মিত্রের কথা পূর্বে কখনো শুনিনি। সমতল এলাকায় কোথাও ও পদ আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে পাহাড়ী এলাকায় গ্রামের কোন শিক্ষিত যুবককে ,ব্যক্তিকে শিক্ষক মিত্রের পদে নিয়োগ করা হয়। শিক্ষক-মিত্র অর্থাৎ শিক্ষকের বন্ধু। শিক্ষক-মিত্র বেতনভুক্ত কর্মচারী নয়। তাঁকে একটা সম্মানী দেওয়া হয়। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তাকেই স্কুল চালাতে হয়। কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তার ক্লাস নিতে হয় ইত্যাদি শিক্ষক মিত্রের কাজ।

ইতিমধ্যে হীরা সিংয়ের চা প্রস্তুত। দোকানে উপস্থিত সকলকে সাথে নিয়ে চা পান করি। চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে উপস্থিত সকলের সাথেই গল্প জমে। বগুয়াবাসায় পাথর দিয়ে তার যে ঘরটি দেখেছি সেটি গোপাল সিংয়ের। গোপাল সিং ওয়ান গ্রামের বাসিন্দা, বয়সে প্রৌঢ়। ঘর প্রস্তুতের ব্যয়ভার সবটাই

গোপাল সিংয়ের। দেখাশুনার দায়িত্ব গোপাল সিংয়ের উপর। প্রকৃত পক্ষে বগুয়াবাসায় কেউ থাকে না। গোপালের অভিযোগ টুরিষ্টরা দরজার কাঠ দিয়ে জ্বালানি করছে। আমি সাথে সাথেই প্রতিবাদ করি। পর্যটকের সাথে যারা যায় তারা সকলেই ওয়ান গ্রামের। উপস্থিত সকলেই স্বীকার করে নেয়।

দোকানে বসেই আরও তিনজন সঙ্গী জুটে যায়। তারাও লোহাজংয়ের যাত্রী। দুইজন মান্দোলীর ছাত্র, একজন ওয়ান গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। ওয়ান থেকে পাঁচজন যাত্রা করি কুলিং-এর দিকে।

পঞ্চায়েত প্রধান হরসিং দানু গ্রামের অভিজ্ঞ প্রধান। গ্রামের সকলেই তাঁকে মান্য করে। ওয়ান থেকে লোহাজং তিনিই আমার পথসঙ্গী। হরসিংজীর মুখ থেকে গ্রামের অনেক কথাই জানতে পারি। গ্রামে মোট ২০০ টি পরিবারের বাস। লোকসংখ্যা ১০০০। গ্রামের হাইস্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। ছাত্র মোট-৯৫, শিক্ষক-৬ শিক্ষকমিত্র-৩, প্রধান উপজীবিকা পশুপালন ও মেষ পালন।

দলে এখন পাঁচজন। ওয়ান থেকে কুলিং ৩ কিমি। কুলিং-এ জীপ না পেলে হাঁটা পথেই লোহাজং পৌঁছনোর সিদ্ধান্ত হয়। ওয়ান পর্যন্ত রাস্তা কাটিং এর কাজ শেষ হয়েছে। সকলের আশা ২/১ বছরের মধ্যেই ওয়ান পর্যন্ত জীপ চলে আসবে। সেদিন ওয়ানের গুরুত্ব বেড়ে যাবে অনেকগুণ।

ওয়ানে বসে অনেক সময় নষ্ট করেছি। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে। কুলিং-এর পথে যাত্রা। সকলেই দ্রুত পা চালাই। ঠিক সাড়ে চারটে কুলিং-এ পৌঁছাই।

কুলিং-এ দু-খানি জীপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। মনে আশার আলো জাগে। সাথে সাথেই সে আলো নিভে যায়। বুকিং ছাড়া কেউ যেতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াই স্থির হয়। জীপ স্ট্যাণ্ডে পর পর দুখানি চায়ের দোকান। নন্দন সিং দানু ও নরেন্দ্র সিং দানুর দোকান। নরেন্দ্রর দোকানে বসে পাঁচ জনে চা-খাই। ইতিমধ্যে ওয়ান থেকে কুলিং পর্যন্ত আসতে আসতে পথের সঙ্গী দুই ছাত্র ওমরাও সিং ও গব্বর সিংয়ের সাথে ভালই আলাপ হয়। ওমরাও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। গব্বর দশম শ্রেণীর ছাত্র। দুইজনই মন্দোলী রাজকীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। দুজনেই লোহাজং চলেছে।

ওমরাওর মিষ্টি চেহারা মিষ্টি ব্যবহার, কম কথা বলে। গব্বর মিশুক,

আলাপ করতে ভালবাসে। সাঁঝের আলো আঁধারে দুর্গম পথে গব্বর আমাকে হাত ধরে পার করে। প্রধানজী বিপদজনক সংক্ষিপ্ত পথে আমাদের চালিত করে। সে পথ এখনও পরিত্যক্ত। খুবই দুর্গম। দ্রুত লোহাজং পৌছনোর ইচ্ছায় ঐ দুর্গম পথ ধরে এগিয়ে যাই। গব্বর সিংয়ের হাত ধরে দুর্গম স্থানগুলি অতিক্রম করি। অবশেষে দিনের আলো নিভে যায়। আমরাও এসে লোহাজং পোঁছাই। ঘড়িতে ঠিক সারে ৬টা।

জগত সিংয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াই। জগত দোকানেই ছিল। জগত দ্রুত এগিয়ে এসে স্বাগত জানায়। জেলা পরিষদের দুই শয্যার ঘর সে আমার জন্য ব্যবস্থা করে। রূপকুণ্ডের পথে যে ঘরটিতে ছিলাম আজও সেই ঘরটি কপালে জুটে যায়। মেঝেতে কার্পেট, দুজনের শয্যা, সংলগ্ন বাথ। সর্বক্ষণ জল। ঘরে বিজলী বাতি। জগত ঘরে এসে চায়ের ব্যবস্থা করে। জগতের কর্তব্য বোধের কোন তুলনা নেই।

পূর্বেই বলেছি ভগবান সিংয়ের ইচ্ছা ওয়ানে একরাত্রি কাটিয়ে লোহাজং আসা। আরও একদিন সে বেশী পয়সা পায়। সেই ভাবে সে তার দাবিও পেশ করে। জগত ঘরে এলে জগতকে ভগবানের কথা জানাই। জগতের ধমক খেয়ে ভগবান শান্ত হয়। জগত ধমকের সুরে বলে রূপকুণ্ড ৭ দিনের পারাও, সেখানে তুমি ৮ দিনের পারাও পাচ্ছ। কেন ৯ দিন বলছো?

আজ রূপকুণ্ড জয়ের আনন্দে ভগবানকে সাথে নিয়ে ধনসিং ও প্রকাশের দোকানে নৈশ আহার করি। ভগবান অনেক দিন পর আমিষ আহার করে। আহারের পর ধন সিং ঘরে গরম দুধ পাঠিয়ে দেয়।

আজ ঘরে এসে ভগবান তার গ্রামের লাট্টু মহারাজের কাহিনী শোনায়। ওয়ানে লাট্টু মহারাজের মন্দির খুবই জাগ্রত। মন্দিরের বিগ্রহ শিবজী, মাতা পার্বতী ও গণেশজী। ঘূর্ণয়মান জগতের অধিকর্তা শঙ্কর ভগবান। শঙ্কর ভগবান লাট্টুর মত জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন। স্থানীয় মানুয়ের নিকট তিনি লাট্টু মহারাজ নামে পরিচিত।

রাত দুটো ঘুম ভেঙে যায়। এই সুযোগে কিছু কাজ সেরে নিই। রূপকুণ্ডের জল সঙ্গে এনেছি। লেবেল লিখে শিশির গায়ে এঁটে দিই। আমার কোয়ার্টার

মাষ্টারের কথা মনে পড়ে। ওর ইচ্ছাতেই রূপকুণ্ড। এ জয় কোয়ার্টার মাষ্টারের জয়, এ আনন্দ ওর আনন্দ। ভাবতে ভাবতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। পানীয় জলের বোতলে জল নিই। ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে। মগ থেকে বোতলে জল ঢেলে ক্যাপ্টে নের দেওয়া জিওলিন মিশিয়ে দিই।

ক্যাপ্টে নের সেবা ও ত্যাগের কোন তুলনা হয় না। মুখে কিছুই বলে না। রূপকুণ্ডের পথে ক্যাপ্টেনের কথা বার বার মনে পড়েছে। বগুয়াবাসার পর ঘোড়া চলে না। ৬ কিমি পথ খুবই দুর্গম ও প্রাণান্তকর চড়াই। ক্যাপ্টেনের খুবই কষ্ট হত। বরফ ঢাকা পথে দেহটা চলতে চায় না। রূপকুণ্ডের আঙ্গিনা স্পর্শ করে নূতন শক্তি ফিরে পাই। ধব ধবে ফর্সা তুষার গালিচায় ঢাকা উপত্যকা উপত্যকার মধ্যমণি শঙ্কর ভগবানের শিলাময় মূর্তি। সম্মূখে ত্রিশূল। ছোট ছোট পাথর দিয়ে সাজানো মন্দিরের আকৃতি। আগত সকলেই চোখের জলে অঞ্জলি প্রদান করে।

ঐ যে তুষার ঢাকা জিউনারা গলি দেখতে পাই। ২/১ জন দামাল ছেলে-মেয়ে এগিয়ে যায়। আমার যেতে সাহস হল না।

রূপকু ণ্ডের বুকে প্রদীপ, দুলাল, জগদীশ ও শিবু সকলকে পেয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। সকলেই আমাকে নিয়ে ছবি তোলে। আনন্দের বন্যায় রূপকুণ্ড ভেসে যায়। কে কতবার আমাকে নিয়ে ছবি তুলবে — প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কে বলে আমি একা? চিৎকার করে উঠি। ধীরে ধীরে ভগবানকে সাথে নিয়ে রূপকুণ্ডের তীরে নেমে যাই। আজ বরফে ঢাকা রূপকুণ্ড। স্বচ্ছ সরোবর রূপকুণ্ড। বরফের ঢাকনা সরিয়ে জল নিই।

প্রিয়জনের আত্মার শান্তি কামনা করি। শঙ্কর ভগবানের আঙ্গিনায় সকলের শুভ কামনায় মঙ্গল দীপ জ্বেলে দিই। বার বার প্রণতি জানিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই। সীমাহীন আনন্দে দুই চোখ ঝাপসা হয়। রূপকুণ্ড জয়ের স্মৃতিচারণ করতে করতে রাতের আঁধার কেটে যায়। ভোরের রবি নগাধিরাজের শুভ্র শিখরে সোনালী আলপনা এঁকে দেয়। ভগবানের ঘুম ভাঙ্গিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হই।

আমার যাত্রা পথ ঃ-

হাওড়া - হলদুয়ানী - গোয়ালদাম - দিদনা - বেদনী - বগুয়াবাসা -

রূপকুণ্ড।

ফেরার পথ ঃ-

বেদনী - ওয়ান - লোহাজং - গোয়ালদাম - হলদুয়ানী - হাওড়া।

২৭শে সেপ্টেম্বর, লোহাজংকে বিদায় জানাই। যাত্রাকালে লোহাজং জীপ স্ট্যাণ্ডে জয় সিং এর সাথে দেখা। জয় সিং স্কুলের ছেলেদের নিয়ে দেবকুণ্ড চলেছে। জগত সিং, ভগবান সিং সকলেই হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়। ঘড়িতে সকাল ৭টা। জীপের চাকা গড়িয়ে চলে। বিদায় লোহাজং। মান্দোলী, বগড়ীগড়, কাঁন্দা, লোহানী, ওলংগড়া ইত্যাদি গ্রাম পেরিয়ে দেবল এসে জীপ দাঁড়ায়। সকাল ৯টা দূরত্ব ৩০ কিমি ভাড়া ৩০ টাকা। দেবল থেকে জীপে থরালী। জীপে আধ ঘন্টা। থরালী থেকে জীপে গোয়ালদাম দেড় ঘন্টা, ভাড়া ২০ টাকা। পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি গোয়ালদামে একদিন বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফেরা। গোয়ালদাম থেকে সরাসরি বাস মেলে হরিদ্বার কিম্বা হলদুয়ানী। হরিদ্বার কিম্বা হলদুয়ানী থেকে ট্রেনে হাওড়া।

পূর্বেই বলেছি আমি ফেরার Reservation করে পাহাড়ে আসি না। পূজার মরশুমে ডুন এক্সপ্রেসে Reservation পাওয়ার ভরসা কম, তাই গোয়ালদাম থেকে কাঠগুদাম ফেরার সিদ্ধান্ত নিই। কাঠগুদাম থেকে বাঘ এক্সপ্রেসে Reservation পাওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশী। ২৭শে সেপ্টেম্বর গোয়ালদাম ফিরেই বাসের খবর নিই। হলদুয়ানীগামী বাস ভোর পাঁচটায় ছেড়ে যায়। সন্ধ্যায় কণ্ডাক্টর ঘর থেকে ডেকে নেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাস স্ট্যাণ্ড খেলাপের গেষ্ট হাউসের অতি নিকটে।

২৮শে সেপ্টেম্বর। অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। ঘড়িতে পৌনে চারটে। সাথে সাথেই গরম জল বসিয়ে দিই। সাড়ে চারটের মধ্যে স্নান ও পূজাপাঠ সেরে তৈরী হয়ে নিই। ঠিক পাঁচটা, বাসের কণ্ডাকটর ২নং ঘরে ঠক্ ঠক্ করে। কণ্ডাকটরের সাথে মালপত্র নিয়ে আমিও বাসে এস বসি। গাড়িতে সকল সিটেই যাত্রী। শুধু আমার সিটটাই খালি। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে। বিদায় গোয়ালদাম।

বিকাল চারটে। কাঠগুদাম এসে নামি। বাস স্ট্যাণ্ডের নিকটে স্টেশন। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট পাই। WL - 3 । ঘড়িতে সাড়ে চারটে। সন্ধ্যা ৬ টায় চার্ট থেকে কোচ নং ও সিট নং জেনে নিই। ৩০ তারিখ কলকাতায় ফিরি।

বাঙালীবাবা

হিমালয় ভ্রমণের পর কলকাতায় ফিরে এলে অনেকেই প্রশ্ন রাখেন কোন মহাত্মার দর্শন পেয়েছেন কি? কি উত্তর দিই ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। তাঁদের ধারণা মহাত্মার দর্শন হলে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়। — এ ধারণা মোটেই অমূলক নয়।

হিমালয় নিজেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা। তাঁর বিরাটত্ব, উদারতা ও মহত্ত্ব মূল্যায়নের উর্ধ্বে। তাঁর সান্নিধ্যে মানুষ নবজীবন লাভ করে। সমতলের মানুষ হিমালয়ের প্রভাবে অনেকটাই বদলে যায়। এ সত্য আমি বার বার উপলব্ধি করেছি।

'হিমালয় পরশপাথর'। তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই মেলে। ভ্রমণপ্রিয় সমতলের মানুষ পাহাড়ে যায় কিছুটা পরিবর্তনের আশায়। পাহাড় থেকে যা সংগ্রহ করে আনে তাই দিয়ে বেশ কিছুদিন চলে। ফিরে এসে প্রিয়জনের কাছে 'হিমালয়ের কথা' বর্ণনা করে সে আরও বেশী আনন্দ পায়।

হিমালয়-প্রকৃতি চির সবুজ। হিমালয়ের মানুষ বিনম্র। হিমালয়-উৎসারিত স্রোতস্বিনী সমতলবাসীর তৃষ্ণা মিটায়, বসুন্ধরাকে উর্বর করে। বিনিময়ে সে কিছুই প্রত্যাশা করে না। — হিমালয় নেয় না কিছুই, ভরিয়ে দেয় নিঃস্বঙ্গ মানুষকে নানা উপাদানে।

যুগ যুগ ধরে হিমালয় অধ্যাত্ম সাধনার পীঠস্থান। অনেকেই সংসারের মায়া কাটিয়ে মানুয়ের কল্যাণে হিমালয়ে গিয়ে স্থায়ী আসন পাতেন। সাধনা ও উপাসনায় হিমালয়ের বাতাবরণে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। দীর্ঘ হিমালয় বাসে হিমালয়ের বিরাটত্ব ও ঔদার্য প্রাপ্ত হন। হিমালয়ের প্রতি আসক্তি, হিমালয়ের প্রীতি ও প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা দ্বারা এই সকল সাধক হিমালয় -প্রকৃতি ভগবানের কাল্পনিক রূপ আপন দৃষ্টিতে ধারণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে হিমালয় -ভগবান স্পষ্টই বলেছেন- সাধকগণ আমার হৃদয় -সদৃশ্য, আমিও তাঁদের হৃদয় স্বরূপ। একেই বলে ভক্তের ভগবান।

'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।

হিমালয়বাসী ভক্তগণই দীর্ঘ সাধনায় মহাত্মার পর্যায়ে উন্নীত হন। হিমালয়ের গিরি-গুহা-কন্দরে দীর্ঘ দিন অবস্থান থেকে ইন্দ্রিয়গণকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। পরমাত্মাকে হৃদয়ে অনুভব করেন, প্রশান্ত চিত্ত মহাত্মার সাগরে অবগাহন করেন। শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখে, সন্মান ও অপমানে অবিচলিত থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ৬ষ্ঠ অঃ ৭ম শ্লোকে মহাত্মার কথা বলা হয়েছে।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।

দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছসাধনে মদন অধিকারী কেদারখণ্ডে স্থায়ী আসন পেতেছেন। ভয়ঙ্কর জেদি। কুস্তিগির মাতৃভক্ত মদন অধিকারী যৌবনে বাবা-মাকে হারিয়ে বিশ্বমায়ের সন্ধানে কেদারখণ্ডে গিয়ে আমরণ তপস্যায় বসেন। কর্পদক শূন্য যোগী মদন শুধু জল খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাসের জোরে তিনি বাবা কেদারনাথের কৃপালাভ করেন। তাঁর কথায় দীর্ঘ ২২ বছরে এটাই বুঝেছি - হিমালয় পরশ পাথর — যোগী মদন অধিকারী এখন কেদারখণ্ডের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাঙালীবাবা।

৪ঠা মে, ২০০৩, সচ্চিদানন্দকে সাথে নিয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছাই। গৌরীকুণ্ড এসে হোটেল দেবলোকে উঠেছি। হোটেলের মালিক জয়কিষণ মাঝবয়সী যুবক, মিষ্টি-হাসি, মিষ্টি চেহারা, ব্যবহারে আন্তরিকতা মিশ্রিত। হোটলের ঘরগুলি খুবই ভাল। টয়লেট বাথ অতি চমৎকার। গৌরীকুণ্ডে এসে এত ভাল ঘর পাব ভাবতেও পারিনি। হোটেল দেবলোক সচ্চিদানন্দের পূর্ব পরিচিত। ওর সান্নিধ্যে সুবিধায় ঘর মেলে।

গৌরীকুণ্ড এসেই সচ্চিদানন্দ বাঙালী বাবার কথা বলে। অপরাহ্ন বেলায় সচ্চিদানন্দের উৎসাহে বাঙালী বাবার দর্শনে যাই।

গৌরীকুণ্ড ও কেদারখণ্ডে এসেছি অনেক অনেক বার। বাঙালী বাবার

কথা কোন দিন শুনিনি।

পূর্বেও বলেছি সময় না হলে কোন কিছুই হয় না। সময়ের সাথে ইচ্ছা ও চেষ্টা দুটোই থাকা চাই। মহাত্মার দর্শনে ঈশ্বর দর্শনের সমান পুণ্য প্রাপ্তি। দীর্ঘ সাধনায় ও তপস্যায় সিদ্ধি লাভের পর মহাত্মা। বাঙালী বাবার দর্শনে নিজেকে ধন্য মনে করি। প্রথম দর্শনেই প্রেম। এ অঞ্চলে এত বড় মহাত্মা এখন আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা আমার জানা নেই। মন্দাকিনীর বুকে লোহার পুল পেরিয়ে বাবার আশ্রম। গুরুজীর নামানুসারে আশ্রমের নাম 'কপিল কুঠি'। পশ্চিমবঙ্গের মূর্তি। গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির সাঙ্খ্য যোগ আশ্রমে দীক্ষিত।

আশ্রমের ছোট একটি কুঠিয়াতে বাঙ্গালী বাবার সংক্ষিপ্ত সংসার। গেরুয়া তিনি পরেন না.। গেরুয়াধারী সাধুদের তিনি পছন্দও করেন না। সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবী, পাঞ্জবীর উপর জহর কোট, একটি সাদা চাদর। অতি আড়ম্বরহীন জীবন যাপন তাঁর পছন্দ। জনসংযোগ তাঁর আদৌ পছন্দ নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বজ বজে খড়িবেড়িয়া গ্রামের ছেলে মদন অধিকারী। প্রথম জীবন কেটেছে শরীর চর্চা, সঙ্গীত চর্চা ও সমাজ সেবার মাধ্যমে। অতিশয় স্বাধীনচেতা ও মাতৃভক্ত। সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা তার নেশা। দীনতার সাথে প্রতিযোগিতা করে আজ মহা সম্পদের অধিকারী।

অতি শৈশব থেকেই শিবগত প্রাণ।

কৈশোর থেকেই সংসারের প্রতি অনীহা। হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ আশৈশব। কথাবার্তায় প্রচণ্ড তেজস্বিতা লক্ষণীয়। সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি, বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করেন না। তিনি বলেন - বাবা মায়ের আদরের নাম মদন অধিকারী। তাকে অস্বীকার করার অধিকার আমার নেই। এখন যোগী হয়েছি। সকলেই বাঙ্গালী বাবা বলে সম্বোধন করেন। এর পশ্চাতে দীর্ঘ ২২ বছরের সাধনা রয়েছে। প্রথম যেদিন হিমালয়ে আসি সেদিন অনেকের কাছেই অপাঙক্তেয় ছিলাম।

অতি শৈশবে বাবাকে হারিয়েছি। আমি ছিলাম মায়ের আদরের নিধি। মা-কে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মা চলে যাওয়ার পর মহামায়ার ডাক শুনতে পাই। শুনেছি হিমালয়ে গেলে মা পরমেশ্বরী ও পরম পিতা পরমেশ্বরের

দর্শন মেলে।

১৯৮৩ সাল, আমি তখন ৫০ বছরের যুবক। মাতৃ বিয়োগের পর হিমালয়ের পথে পা বাড়াই। রাতের গাড়ি ডুন এক্সপ্রেসে চেপেছি। সবকিছুই চুরি হয়ে যায়। ঋষিকেশে এসে কালীকমলী ধর্মশালায় আশ্রয় নিই।

২২ বছর পর সেই যুবক আজ যোগী মদন অধিকারী, সিদ্ধ মহাত্মা। বাঙালী বাবা গৌরীকুণ্ডের গর্ব, উত্তরাঞ্চলের সম্পদ। এ হেন মহাত্মার সান্নিধ্য লাভ করে আজ গর্বিত আনন্দিত। আমাকে এই মহাত্মার সান্নিধ্যে এনে দিয়েছেন সেই তরুণ সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দজীকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। তাঁর প্রতি রইল হিমালয়ের প্রীতি ও সুগভীর শ্রদ্ধা।

মহাত্মার কুঠিয়াতে বসে অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনি। ধীরে ধীরে আবেগ মথিত হয়ে জীবনের অনেক কথাই একের পর এক বলে যান। আমিও মহাত্মার মুখ নিঃসৃত বাণী পরমানন্দে গ্রহণ করি। তাঁর কথায়,হিমালয় বাঞ্ছা-কল্প তরু। তাঁর নিকট দৈন্যের কোন স্থান নেই। হিমালয় রাজপুরী। রাজপুরীতে কোন অভাব নেই। হিমালয় অধিপতি শঙ্কর ভগবান রাজার রাজা। মহারাজের আঙ্গিনায় চাকরি পেতে হলে চাই নিষ্ঠা, ভক্তি, ত্যাগ ও ধৈর্য্য।

আমি একজনের কথা মানি, যিনি আমাকে সব কিছু দিয়েছেন, এখনও অকৃপণভাবে দিয়ে চলেছেন। প্রথম জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে আনন্দ পাই। আমার কাছে ধর্মহীন মানুষের কোন সম্পদ নেই। যার কাছে ধর্ম আছে তাঁর কাছেই অগাধ সম্পদ আছে।

আমি খুব স্বার্থপর। আমি কারো বোঝা হতে চাই না। আমার সুখ, দুঃখ, কারো সাথে ভাগ করে নিতে চাই না। যে যতটুকু কর্ম করে সে ততটুকুই পায়।

আমি এখন পরশ পাথর নিয়েই থাকি। আমি এখন সবচেয়ে ভাল জায়গায় থাকি। ২২ বছর পূর্বে কেদারনাথে এসে জল খেয়ে দিন কাটিয়েছি।। অচ্ছুৎ বাজনদারদের সাথে রাত কাটিয়েছি। বিগত ২২ বছর যার দ্বারে চাকরি করেছি, তিনি এখন খুশি হয়ে রাজার আসনে বসিয়েছেন। আপন কুঠিতে মহানন্দে দিন কাটাই।

ঐ যে হারমোনিয়মটা দেখছেন— ঐটি আমার সঙ্গী। আমার গুরু

বলেছেন, সা-রে-গা-মা সাধলে পাঁচ মিনিটে তোর ঠাকুর দর্শন হবে।

কৈশোর ও যৌবনে খড়িবেড়িয়া গ্রামের বুড়া শিবতলা ছিল আমার খেলার সাথী। এখন ঐ হারমোনিয়াম। কোন কিছুর অপেক্ষা না করে হারমোনিয়ামটা টেনে এনে আপন মনে গান ধরেন— মা তোর রূপের সীমা পাইনা খুঁজে—

চন্দ্র তপন লুটায় মা তোর
চরণ তলে দশভুজে ....মা তোর রূপের সীমা পাইনা খুঁজে ....

বাঙ্গালী বাবার সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীতের অমৃত হ্রদে ডুবে যাই।

সঙ্গীতের সাগর থেকে উঠে এসে স্টোভে চা তৈরী করেন। শুধু বলেন, আমি এখন একটু চা পান করব। আমার যখন ইচ্ছা আহার করি। যখন ঘুম পায় ঘুমাই, নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। আপনারা খেলে আপনাদের জন্য জল নেব। আমরাও চা-পানে সম্মতি জানাই।

আমি নিজেকে অলংকৃত করে পরিচিত হতে চাই নি। আমি পরিচিত হতে চাই একজনের সাথে। যিনি আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে অকৃপণ ভাবে কৃপা করেছেন। তাঁর কৃপায় আমি কোন কিছুর অভাব বোধ করি না। আমার কোন দৈন্য নেই। *কোন চাহিদা নেই, সব কিছুই তিনি পূর্ণ করেছেন।* তাঁর সম্মান রাখা আমার কর্তব্য।

আমি সকলের গুরু হতে চাই না, আমি একজনের গুরু হতে চাই। যার প্রণামে আমি ধন্য হয়ে যাব।

আমি অবাক হয়ে বাঙালী বাবার কথা শুনতে থাকি। কোন প্রশ্ন নেই, কোন জিজ্ঞাসা নেই।

কথার ফাঁকে চা তৈরী হয়। কালো চা। স্টিলের গ্লাসে চা দেন। মনে মনে ভাবি, মহাত্মা স্পষ্ট কথা বলেন, কথায় কোন জড়তা নেই। ঈশ্বর সাধনায় মানুষ কতই না শক্তি আহরণ করেন। একেই বলে মানসিক শক্তি, অধ্যাত্মিক শক্তি।

সময় উত্তীর্ণ। চা পানের পর বাঙালী বাবার নিকট বিদায় নিয়ে দেবলোক হোটেলে ফিরে আসি।

আজ সচ্চিদানন্দকে সাথে নিয়ে নৈশ আহার করি।

হোটেলে ফিরে সচ্চিদানন্দ তার অধ্যাত্মিক জীবনের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে। সচ্চিদানন্দজী ১২ বছর হিমালয়ে আছেন। বর্তমান বয়স ৩০ বছর। নিত্য পূজা-পাঠ ও ধ্যান জপের সে কোন ত্রুটি করে না। পূর্বেই বলেছি সচ্চিদানন্দ তরুণ সাধক। সাধনায় সে যথেষ্ট শক্তি লাভ করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকট মাথা নোয়াতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। তাঁর পরিচিতির গণ্ডি দেখে অবাক হয়ে যাই। সর্বদাই হিন্দি ও ইংরাজীতে কথা বলে। তাঁর আচার আচরণে বিন্দুমাত্র বাঙ্গালীয়ানা দেখা যায় না।

তিনি সর্বদাই বলেন- আমি গর্ভধারিণী মাকে ছেড়ে বিশ্বমায়ের সন্ধানে বেরিয়েছি। হিমালয়ে এসে বাবা মাকে পেয়েছি। হিমালয় পরমেশ্বর, পরমেশ্বরীর লীলা ভূমি। বাবা অল্পতেই খুশি হন। ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ- মন্ত্র জপ করলে বাবা অতি শীঘ্র সাড়া দেন। হিমালয় মন্থনে স্বামী সচ্চিদানন্দের সান্নিধ্য হিমালয়ের দান। তাঁর উদারতা ও বিরাটত্ব পরিমাপের উর্ধ্বে। স্বামী সচ্চিদানন্দের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী।

১২ই মে, ২০০৩। পুনরায় বাঙালী বাবার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়। কেদার থেকে ফিরে দেবলোক হোটেলেই আশ্রয় নিই। পূর্বেই বলেছি বাঙ্গালী বাবা কপিল মুনির আশ্রমে দীক্ষিত, তাই তার আশ্রমের নাম কপিল কুঠী।

গৌরীকুণ্ডের পরপারে মন্দাকিনীর তীরে কপিল কুঠী, বাঙালী বাবার আশ্রম। আশ্রম আঙ্গিনার ডান হাতে গুরু গোরোক্ষনাথ জীর তপোস্থলী। সমগ্র চত্বরটি সান বাঁধানো, মন্দাকিনীর বুকে লোহার পুল পেরিয়ে বাঁ হাতে অনতি উচ্চ লোহার গেট। ঐ গেটে বাবা সর্বদাই তালা লাগিয়ে রাখেন। গেট দিয়ে নেমে মন্দির পেরিয়ে বাঙালী বাবার ছোট কুঠী। কুঠীয়ার পশ্চাতে শৌচালয়। শৌচালয়ের পাশে আর একটি ছোট লোহার গেট। মন্দাকিনীর দিকে অনতিউচ্চ লোহার রেলিং দিয়ে সমগ্র অংশটি সুরক্ষিত। ঐ ছোট গেট দিয়ে নেমে গেলেই মন্দাকিনী। কয়েক পা এগিয়ে গেলেই গরম জলের ধারা। বাবার কুঠিতে একজনের সংসার। সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী সবই আছে। বেশ সাজানো ও পরিচ্ছন্নভাবে রাখা আছে প্রতিটি জিনিষ। গ্যাস, স্টোভ,সিলিণ্ডার, দুই একটি বাসনপত্র, গ্লাস, মগ ইত্যাদি। দর্শনপ্রার্থীদের বসার জন্য শয্যার সম্মুখে ছোট্ট

একটি কাঠের পাটাতন।

মন্দির সংলগ্ন সান বাঁধানো উঠান। উঠানের এক প্রান্তে প্রবেশ দ্বারের সন্নিকটে জলের কল।

আজ বাঙ্গালী বাবার কুঠিতে বসে তাঁর জীবনের আরও কিছু কথা শুনতে চাই। দেবলোক হোটেলে আমার থাকার অসুবিধার কথাও বলি। বাঙালী বাবার আশ্রমে অপ্রশস্ত উঠানে টেন্ট পিচিংয়ের কথা বলি। সাথে সাথেই অনুমতি পাই। সঙ্গে তাঁবু আছে। সুতরাং গৌরীকুণ্ডে এসে এমন সুযোগ ছাড়তে আমি মোটেই রাজি নই।

দেবলোক হোটেলের মায়া কাটিয়ে টেন্ট ও মালপত্র নিয়ে চলে আসি। আশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শিবির স্থাপন দেখে বাঙালী বাবা খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। ঘরে ডেকে নিয়ে চায়ের কাপ হাতে দেন। আমিও চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে এক মনে বাবার কথা শুনতে থাকি। বাবা মনের আনন্দে সব কিছু উজাড় করে বলতে থাকেন।

আমি থাকি কেদারনাথে। বাবা কেদারনাথ রাজরাজেশ্বর। তাঁর সান্নিধ্য সর্বদাই আমাতে বিরাজমান। সুতরাং আমার কোন দৈন্য নেই। আমি এখন রাজার ছেলে, রাজার মতই চলি।

প্রথমে কেদারনাথে এসে কালীকমলী ধর্মশালায় আশ্রয় নিই। ধর্মশালায় সর্বদাই সাধু-সন্ন্যাসীদের ভিড় ও হৈ-হুল্লোড়। আমার এসব পছন্দ হত না। এদিকে টাকা পয়সার খুবই অভাব, জল খেয়ে দিন কাটাই। হোটেল কিম্বা লজে থাকার সামর্থ্য নেই। মনের দৃঢ় বিশ্বাস বাবা কেদারনাথ রাজ রাজেশ্বর তিনিই শঙ্কর ভগবান। তাঁর আকর্ষণেই মানুষ আসে তাঁর দুয়ারে। কি পায় তারা? কি দেন তিনি? নিশ্চয়ই কিছু পায়। নইলে যুগ যুগ ধরে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সুউচ্চ পাহাড়ের মানুষ আসে কেন?

আমিও কিছু পেতে চাই, এটাই আমার জেদ। যতদিন কিছু না পাচ্ছি তত দিন এখানেই থাকব। পূজা, প্রাণায়াম, ধ্যান- জপ আমি কিছুই বুঝি না। একমাত্র শঙ্কর ভগবানকে বুঝি। একমাত্র তাকেই পেতে চাই। আমি পেতে চাই তার তৃতীয় নয়ন। এই জেদ নিয়ে আমি কেদারখণ্ডে চুপচাপ দিন কাটাই।

মন্দিরের ঈশান কোণে ঈশানেশ্বর মহাদেব। ঈশানেশ্বর মন্দিরে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে বসে থাকি। যত সময় ইচ্ছা বসে থাকি। দুই একজন ভক্তপ্রাণ তীর্থ যাত্রী, সাধু মহাত্মা ভেবে মাঝে মাঝে টাকা পয়সা ছুড়ে দেন। মনের দৃঢ়তা বেড়ে যায়। মনে মনে ভাবি শঙ্কর ভগবান আমার চলার পয়সা দিয়েছেন। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। এমনি ভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে যায়। শঙ্কর ভগবান কি ভাবেন জানিনা। তাঁকে দেখতে পাই না। তাঁর কথা শুনতেও পাই না। তাঁর চেহারা হৃদয়পটে অনুভব করি

১৯৮৮, জন্মাষ্টমী তিথি। কেদারনাথ মন্দির কমিটি মন্দির প্রাঙ্গণে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বহু বিশিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় সুধীবৃন্দ আকৃষ্ট হন। কেদারনাথবাসী যোগী মদন অধিকারীর খবর তখনও কেউ রাখে না।

মন্দির প্রাঙ্গণে যথা সময়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয়। প্রেমী মদন অন্তরে অস্থিরতা অনুভব করেন। রবাহুত অনাহুত হয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকেন। তাঁর অস্থিরতা প্রকাশের নয়। কে যেন তাঁর মনের কথা বুঝতে পারেন।

মহা উৎসাহে অনুষ্ঠান জমে ওঠে। অকস্মাৎ তীব্র বায়ু প্রবাহে অনুষ্ঠানে ছেদ পড়ে। যোগী মদন সেই সুযোগে উপযাজক হয়ে আসরে সঙ্গীত পরিবেশনের অনুমতি চান। অনুমতিও মেলে। প্রথমে বয়জু বাওরার —

'দুনিয়াকে রাখ ভাল' সঙ্গীত দিয়ে শুরু করেন। প্রথম সঙ্গীত পরিবেশনের পর উপস্থিত শ্রোতার মধ্য থেকে আর একটি সঙ্গীত পরিবেশনের দাবি ওঠে। কর্তৃপক্ষও আর একটি সঙ্গীত পরিবেশনের কথা বলে। আমি তখন -ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর রূপের সীমা পাইনা খুঁজে..... গান করি। আমার মনে হয় আমার গানে সুমেরু পর্বত কেঁপে ওঠে। আনন্দ ও তৃপ্তিতে মন ভরে যায়। সেই গানের আসর থেকেই আমার পরিচয়ের দ্বার খুলে যায়। হৃদয় মন্দিরে শঙ্কর ভগবানকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই।

অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার সর্বেন্দ্র বাতোয়াল, কেদারনাথ উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী নিবাস পোস্তি আরও অনেকে স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আলাপ করেন। আমাকে অভিনন্দন জানান। এতদিন এদের সাথে আমার পরিচয় ছিল না। সর্বেন্দ্র বাতোয়াল সেই দিনই আমাকে তার ঘরে

নিয়ে আসেন। তিনি আমার কেদারনাথের জীবনটা জেনে নেন। দীর্ঘ ছয় বছর কেদারনাথে আছি, অথচ থাকার কোন ভালো জায়গা পাই নি।

পোষ্ট অফিসের পিছনে একটি পরিত্যক্ত ঘর ছিল। সর্বেন্দ্র বাতোয়াল এই ঘরটি আমাকে দেখান। আমার একার পক্ষে অতি চমৎকার। মনে মনে ভাবি বাবা শঙ্কর ভগবান ঐ ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

পরদিনই বাজনদার দেবলু দাসের ঘর থেকে আমার ঘরে চলে আসি। আজও ঐ ঘরেই থাকি। শঙ্কর ভগবানের দেওয়া ঐ ঘরটি আমার ভজন কুঠি। সারাদিন ঘরেই থাকি আর শঙ্কর ভগবানকে ডাকি। যত দিন যায় মনের জেদ ততই বেড়ে যায়। শঙ্কর ভগবানের ললাটের ঐ চাঁদ আমাকে পেতেই হবে।

সর্বেন্দ্র বাতোয়াল ধার্মিক, শিবগত প্রাণ। আমার প্রতি সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি। আমাকে আর কিছুই ভাবতে হয় না। একটাই ভাবনা। বাবা কেদারনাথ, বাবা শঙ্কর ভগবান।

কেদারনাথ ধামের কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। দীপাবলিতে মন্দির বন্ধ হয়। শীতকালে মন্দিরের পাঠ বন্ধের পর সেখানে কেউই থাকার অনুমতি পায় না। আমি স্থানীয় জেলা শাসকের নিকট থেকে বিশেষ অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে নিয়েছি। সেই অনুমতি পত্রের জোরে মন্দির বন্ধের পরও আমি ২/৪ মাস কেদারনাথে থাকার সুযোগ পাই।

১৯৮৯ সালে মন্দির বন্ধের পর বাতোয়ালের দেশের বাড়িতে যাই। বাতোয়ালের বাড়ি গোপেশ্বর জেলায় কুংকলি গ্রামে। মণ্ডলে নেমে যেতে হয়। কুংকলি গ্রামে পূর্ণেশ্বর মহাদেব থাকেন। পুর্ণেশ্বর মহাদেবের নিকট কয়েকটা দিন ভালই কাটে।

১৯৮৯-১৯৯১আমার জীবনে স্বর্ণযুগ বলা যায়। বাবা শঙ্কর ভগবান আমাকে দু-হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। আমার জীবনে যোগেশ জিণ্ডাল ও ইটালিয়ান দম্পতির আবির্ভাব শঙ্কর ভগবানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমি যে আকাঙ্ক্ষা ও জেদ নিয়ে বছরের পর বছর কেদারখণ্ডে কাটিয়েছি, শঙ্কর ভগবান আমার সে সকল ইচ্ছা পূরণ করেছেন। আমার আর কোন চাহিদা নেই, কোন দৈন্য নেই। ঐশ্বর্য ও সম্মানের কোন ঘাট্‌তি নেই। কাশীপুর নিবাসী যোগেশ

জিণ্ডাল একজন শিল্পপতি। আমার অনুগত ভক্ত। আমার ইচ্ছানুসারে গৌরীকুণ্ডকে নূতন সাজে সাজিয়েছেন।

যোগেশ জিন্ডাল তাঁর গুরুদেব বাঙালী বাবার নির্দেশে স্বর্গতা মাতা বিনোদ দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে গৌরীকুণ্ডের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করেছেন। সকলেই বলে বাঙালী বাবার অবদান। আমি বলি এসবই শঙ্কর ভগবানের দান।

গরম কুন্ডের সন্নিকটে একটি উন্নত মানের শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। শৌচালয় নির্মাণের ফলে তীর্থ যাত্রীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হয়। শৌচালয়ের জমিটুকু স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পেয়েছি। গত দু বছরেও কর্তৃপক্ষ সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। কেদারনাথে ঈশানেশ্বর মহাদেব মন্দির ও কেদারনাথ দরবারের সংস্কার যোগেশ জিণ্ডালের অবদান, এছাড়াও রামগুণ্ডিতে মহা সমারোহে যথা নিয়মে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের মধ্যে চার বেদ ও আঠার পুরাণ দান করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চল শঙ্কর ভগবানের দেশ। যোগেশকে দিয়ে আরো কিছু কাজ করানোর ইচ্ছা আমার আছে।

১৯৯০ সালে আমি পুষ্কর যাই। সেখানে এক ইটালিয়ান দম্পতির সাথে আমার আলাপ হয়। তাদের কোন সন্তান ছিল না। সন্তান লাভের জন্য তারা বড়ই কাতর হয়। আমি তাদের কেদারনাথে আসতে বলি। পরবর্তীকালে ঐ দম্পতি কেদারনাথে এসে আমার সাথে দেখা করে। দীর্ঘ ২২ দিন তারা আমার সান্নিধ্যে কাটায়। আমি তাদের একটি কন্যা সন্তান দানের প্রতিশ্রুতি দিই। তাদের আমি বলেছিলাম তোমাদের যে মেয়েটি পাবে তার নাম রাখবে 'বিদ্যাবতী'। তিন বছর পর তারা বিদ্যাবতীকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে কেদারনাথে এসেছিল। এখন প্রতিবছরই তারা একবার আমার নিকট আসে। তারা আমাকে ইটালিতে নিয়ে যাবার জন্য খুবই অনুরোধ করে।

দু বছর আগের কথা। মন্দির বন্ধের ঠিক আগের দিন। যাত্রী একদম নেই ছোট বড় সকল দোকানদার নীচের দিকে নেমে চলেছে। প্রতিদিনের মত আমিও সকাল ৯টায় শ্রীনিবাস পোস্তির ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসেছি। পোস্তি একটা চেয়ারে আমি আর একটা চেয়ারে। পরস্পর একটু দূরেই বসে আছি।

প্রতিদিনের মতো সে দিনও দু-চারটি কথা বলেছি। এমন সময় এক অপরূপা সুন্দরী তরুণী এসে আমার হাতে মুখে গলায় আদর করতে থাকে। আমি বলি— তোমার যা ইচ্ছা কর আমি তোমাকে স্পর্শ করব না।শ্রীনিবাস পোস্তি অপর চেয়ারে বসে বলেন উনি যোগী মহাত্মা, তুমি আমার কাছে এসো। বলতেই মেয়েটি কয়েক পা গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এসব অলৌকিক পরীক্ষা, এ সব পরীক্ষায় আমি ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছি। তবে এসব কথা আমার মুখ থেকে না শুনে শ্রীনিবাস পোস্তির মুখ থেকে শোনাই ভাল। উনি থাকেন গুপ্তকাশী। সেখানে 'Frontier House' নামে এক হোটেল বানিয়েছেন। সেখানেই ওঁনাকে পাবেন। আমার সময়মত গুপ্তকাশী এসে পোস্তির সাথে দেখা করি। পোস্তি বিশেষ ভদ্রলোক। পোস্তির নিকট বাঙালী বাবার বিষয়ে জানতে চাই। পোস্তির মুখেও একই কথা শুনি।

মন্দির বন্ধের পর ডিসেম্বর জানুয়ারী পর্যন্ত কেদারেই থাকি ঐ সময় মাঝে মাঝে দুটি সাদা বাঘ এসে আমার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। একটি পুরুষ একটি নারী। আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি এদের নাম দিয়েছি হর ও পার্বতী।

বাঘের রূপ নিয়ে আমাকে দেখতে আসে, এটাই আমার বিশ্বাস।

প্রচার আমি চাইনি। আপনারা লিখতে চান লিখবেন— সেটা আপনাদের ব্যাপার। যা বলেছি সবই আমার কথা।

সর্বেন্দ্র সিং বাতোয়াল এখনও চাকরিতে আছেন। বর্তমানে গোপেশ্বর মুখ্য ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার। তিনি দীর্ঘদিন বাঙালী বাবার সান্নিধ্যে দিন কাটিয়েছেন। বাঙালী বাবার বিষয়ে তাঁর অনেক কথাই জানা আছে।

গৌরীকুণ্ডে কপিল কুঠিতে বাঙালী বাবার সান্নিধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মায়। তাঁর স্নেহ ও আদরের কয়েকটা দিন অতি চমৎকার ভাবে কাটে। তাঁর প্রতি গভীর আগ্রহ জন্মায়, গৌরীকুণ্ডের মন্দাকিনীর তীরে কপিল কুঠিতে বাঙালী বাবার সান্নিধ্যে রাত কাটানোর সুটোগ পাব, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। বাবা থাকেন পাকা ঘরে, আমি থাকি তাঁবুর ঘরে। নিরবচ্ছিন্ন মন্দাকিনীর নূপুর ধ্বনি শুনতে শুনতে কোথায় হারিয়ে যাই নিজেও বুঝতে পারি না। জীবনে এমন সুযোগ আসতে পারে সেটা আদৌ বুঝতে পারিনি।

পূর্বেই বলেছি বাড়ির গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে এলেই কে যেন হাত ধরে পথ দেখায়। তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় গৌরীকুণ্ডে।

অতি প্রত্যুষে মন্দাকিনীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। তাঁবুর ঘরে গুরুজীর পূজা ও প্রার্থনা। ভোরের গৌরীকুণ্ড তখনও ঘুমিয়ে। ঘুম নেই মন্দাকিনীর চোখে। আবহমান কাল থেকে সে নিদ্রাহীনা। গিরিরাজের কন্যা মন্দাকিনী। শান্তির বার্তা নিয়ে সে ছুটে চলে নিম্নভূমে। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে একবার তাকালে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারি না। ছন্দময়ী, শুচিস্মিতা, চিরকুমারী, চিরযৌবনা। অসংখ্য উপলখণ্ড তার বক্ষে শায়িত। ভোরের পাখি নানা রঙে রঞ্জিত। একটা উপলখণ্ড থেকে অন্য এক উপলখণ্ডে লাফিয়ে লাফিয়ে মন্দাকিনীর সাথে কত কথাই না বলতে থাকে। সে দৃশ্য অতি চমৎকার।

অকস্মাৎ বাঙালী বাবার ঘর থেকে চা-পানের আহ্বান আসে। এমন সহজ সরল সাদা পোষাকের মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। অতি সাবধানে বাঙালী বাবার ঘরে গিয়ে বসি। নিজের হাতে চা বানিয়েছেন। আমাকে সামনে বসিয়ে চা-খেতে তাঁর বেশী আনন্দ। ছোট শিশুর মতো কথা বলেন। এ হেন মানুষের সংস্পর্শে আপন মনের দুর্বলতাও কেটে যায়।

বাঙালীবাবা সর্বেন্দ্র বাতোয়ালের সাথে দেখা করার কথা বলেন। তাঁর কথা— আমার কথা আমি বলতে চাই না অপরের মুখ থেকে শুনুন তবে বেশী ভাল লাগবে। বাতোয়ালের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা আমার মনেও জাগে।

সে দিন ১৯শে মে, সোমবার, ২০০৩। অনসূয়ার দর্শন নিয়ে মণ্ডলে নেমে গোপেশ্বর বাস স্টেশনে নেমেছি। রুকস্যাক পিঠে নিয়ে সোজাই গোপেশ্বর পোষ্ট অফিসে আসি। অফিসে সকলের প্রিয় বাতোয়াল। অতি সহজেই দেখা পাই। আমি আসার পূর্বে কে যেন ফোন করে আমার আগমনের কথা জানায়। সর্বেন্দ্র অজানা মানুষটিকে স্বাগত জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, তাঁর আন্তরিক আপ্যায়নে নিজেই লজ্জা পাই। সে আমাকে বাড়ি যেতে অনুরোধ করে।

সর্বেন্দ্র সিং হিমালয়ের মানুষ। তাঁর কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ দিন কেদারখণ্ডে কাটিয়েছেন তাঁর আন্তরিক আপ্যায়নে হিমালয়ের উদারতা স্পষ্ট অনুভব করি। তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিই।

আজকের কেদারনাথ

ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম তীর্থস্থানগুলির অধিকাংশই হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত। হিমালয়ের গাড়োয়াল ও কুমায়ূন ভূ-ভাগ দুটি যথাক্রমে দেবভূমি ও তপোভূমি নামে প্রসিদ্ধ। বহু বহু প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মপ্রাণ মানুষ সাধনা, তপস্যা ও সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হিমালয়ের নানা অঙ্গনে আসন পাতেন। আবার ভ্রমণ পিপাসু, হিমালয় প্রেমী পর্যটক হিমালয় ভ্রমণান্তে সমতলে ফিরে নানা তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁদের লেখা গ্রন্থসমূহ ও নানা তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা থেকে আমরা হিমালয় বিষয়ে নানা সংবাদ পেয়ে থাকি।

অতীতে এই সকল মনীষী পর্যটকগণ হিমালয়ে যেতেন সীমাহীন কষ্ট, কৃচ্ছসাধন ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। তাঁদের সময়ে হিমালয়ের বুকে পথঘাট ছিল স্বপ্ন। সমতলের গণ্ডি পেরিয়ে পা সম্বল করে হিমালয়ের বুকে পাড়ি জমাতে হত। তাঁদের সময়ে হিমালয়-যাত্রা ছিল অগস্ত্য-যাত্রার সদৃশ।

দেবতাত্মা হিমালয়ের সান্নিধ্য থেকে ফিরে আসা লেখকদের বর্ণনায় তাঁদের হিমালয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে অধিক মাত্রায়।

বর্তমান যুগের নবীন পাঠক ও হিমালয় প্রেমী মানুষের নিকট সেই সকল শ্রদ্ধাবান প্রাচীন লেখকদের গ্রন্থসমূহ এক একটি দলিল সদৃশ্য।

অতীতের সাথে বর্তমান হিমালয়-যাত্রার কোন মিল পাওয়া যাবে না। বর্তমান যুগে হিমালয় যাত্রা প্রমোদ ভ্রমণের বিকল্প মাত্র। অতীতের ভয়ঙ্কর, দুর্গম, প্রাণান্তকর ইত্যাদি বিশেষণগুলি কালের গহ্বরে মিলিয়ে গেছে। তবুও শাশ্বত এই বিশেষণগুলির প্রভাব কেদারনাথ, বদ্রীনাথ তীর্থ যাত্রার সাথে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে। সাধারণ ভ্রমণ প্রিয় কেদার-বদ্রীর যাত্রীর মনে এই শব্দগুলি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে। এই দুই তীর্থ যাত্রার প্রস্তুতি পর্বে তাদের মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে পর্যটন শিল্পের স্বার্থে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ তীর্থক্ষেত্র এখন আধুনিক যুগের দুই পাহাড়ী শহর। অতীতযুগ এখন নেই। সে

যুগের পাণ্ডবগণ নেই। আছে ১১৭৫৩ ফুট উচ্চতায় সেই পবিত্র স্থান, আছে মন্দির, গর্ভ মন্দিরে শিলাময় মূর্তি। আছে স্থান মাহাত্ম্য, আছে মানুষের বিশ্বাস। আছে প্রকৃতি, প্রকৃতির সুবাসিত রূপ, রস ও সৌন্দর্য।

মানুষ তার মনের বিশ্বাসকে পাথেয় করে আজও দলে দলে ছুটে যায় হিমালয়ের কোলে কেদার-বদ্রীর অমৃত আহরণে।

কথিত আছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম পীঠস্থান কেদারনাথ ধাম। অথচ কেদারনাথজীর গর্ভমন্দিরে কোন মূর্তি নেই, কোন শিব লিঙ্গ নেই। মন্দিরে গিয়ে মনের অনুভূতি দিয়ে ঐ প্রস্তর খণ্ডে শঙ্কর ভগবানের পশ্চাৎ ভাগ কিংবা লিঙ্গমূর্তি অনুভব করতে হয়। কেদারনাথ দর্শনে মুক্তি।

স্কন্দপুরাণে বলা আছে পাণ্ডবদের দর্শন দিতে অনিচ্ছুক মহাদেব মহিষরূপ ধারণ করে পাতালে প্রবেশ করেন। পাণ্ডবগণ সেই মুহূর্তে পশ্চাতার্ধ জাপটে ধরেন। পাণ্ডবদের স্পর্শে দেবতা প্রস্তরে পরিণত হয়। পাণ্ডবগণ সেখানেই মন্দির নির্মাণ করে পূজা-পাঠ-প্রার্থনা আরম্ভ করেন। অনাদিকাল থেকে সেই প্রথা আজিও অব্যাহত।

শিবের পেছন দিক কেদারনাথে। দেহের অন্য অংশগুলি কোথায়? কেদারনাথ মন্দিরে এসে এ ভাবনা মনে জাগা উচিত। অন্য অংশগুলি মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর। এই পঞ্চকেদারের রূপ দর্শন না হলেও মনের দর্পণে স্পষ্ট হতে পারে, তবেই কেদারনাথ দর্শন সার্থক।

কেদারনাথ দর্শনের পর মন্দিরের পশ্চাতে শঙ্করাচার্য সমাধি মন্দির অবশ্যই দর্শন করা উচিত। শঙ্করের যিনি আচার্য তিনিই শঙ্করাচার্য। তাঁর কথায় — ধর্ম আছে কেদারে / কর্ম আছে বদ্রীনাথে। তাই শঙ্করাচার্যের সমাধি - কেদারনাথে, আদি বদ্রীনাথে।

কেদার-বদ্রীর পথঘাট এখন যথেষ্ট উন্নতমানের। অতীতে যেখানে পথের কোন চিহ্ন ছিল না, এখন সেখানে রাজপথ। হরিদ্বার থেকে কেদারনাথ বদ্রীনাথের পথ এখন ৫৮নং জাতীয় সড়কের মর্যাদায় ভূষিত। সুপ্রশস্ত জাতীয় সড়কে বিপরীতমুখী দুখানি গাড়ি অতি সহজেই যাতায়াত করে। জাতীয় সড়ক রুদ্রপ্রয়াগে দ্বিধাবিভক্ত। সোজা পথ অলোকানন্দার তীর বেয়ে এগিয়ে গেছে বদ্রীনারায়ণ ধাম। বাঁহাতি পথ অলোকানন্দার বুকে লোহার সেতু পেরিয়ে সুড়ঙ্গ পথ ভেদ

করে মন্দাকিনীর আঁচল ধরে পৌঁছে গেছে কেদারনাথ ধাম। পথে তিলওয়াড়া, অগস্ত্যমুনি, চন্দ্রাপুরী, গুপ্তকাশী, ফাটা, সীতাপুর, রামপুর, সোনপ্রয়াগ হয়ে মা গৌরীর তপোস্থলী গৌরীকুণ্ড।

গৌরীকুণ্ড কেদারনাথের পথে বেস ক্যাম্প। কেদারনাথ দর্শনার্থী, পর্যটক, তীর্থযাত্রী, সাধু-সন্ন্যাসী সকলকেই গৌরীকুণ্ডে আসতে হয়। গৌরীকুণ্ড এখন পাহাড়ী শহর। থাকা, খাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কোন কিছুর অভাব নেই গৌরীকুণ্ডে। গৌরীকুণ্ডে বিদ্যুতের আলোয় আলোময়। অসংখ্য STD Booth। পৌঁছেই বাড়িতে খবর দিতে পারবেন। গৌরীকুণ্ডের গরমকুণ্ডে অবগাহনে পথ চলার সকল ক্লান্তির অবসান হয়।

হরিদ্বার কিংবা ঋষিকেশ থেকে বাস, ট্যাক্সি, জীপ, সুমো ইত্যাদি যানবাহনে ৭-৮ ঘন্টায় গৌরীকুণ্ডে পৌছানো যায়। গৌরীকুণ্ডের সানবাঁধানো সুপ্রশস্ত চত্বরে বাসস্ট্যাণ্ড। উত্তরাঞ্চল পুলিশ প্রশাসন যাত্রী সেবায় সর্বদাই নিযুক্ত থাকে। বাসস্ট্যাণ্ড, দোকান, বাজার জমজমাট।

গৌরীকুণ্ডে থাকার জন্য হোটেল শিবলোক, হোটেল দেবলোক, পাঞ্জাব-সিন্ধ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কালীকমলী ধর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা যথেষ্টই ভাল।

বাঙালীর পছন্দের খাবার পাবেন কালীবাবুর দিদির হোটেল, সুপ্রিয়া হোটেল এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের নিজস্ব রেস্তোরাঁয়। সুন্দর চা ও মুখরোচক খাবারের জন্য "হোটেল কলকাতা"।

গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ (১১৭৫৩ ফুট) ধাম ১৪ কিমি, হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। তুষার শুভ্র সুমেরু পর্বতের পাদদেশে, মন্দাকিনীর উৎসে, দেবতাত্মা হিমালয়ের অধ্যাত্ম বাতাবরণে কেদারনাথ মন্দিরের অবস্থিতি। একমাত্র কেদারনাথ শিবজীর আকর্ষণে তীর্থযাত্রী ও হিমালয় প্রেমী মানুষ এই সুদূর দুর্গম অঞ্চলে পাড়ি জমায় সেই আদিমকাল থেকে। কেদারনাথ ধাম এখন সহজ সরল ও সুগম্য।

১৪ কিমি ট্রেকিং পথ। পথ সুপ্রশস্ত ও সানবাঁধানো। মাঝে মাঝে যাত্রী বিশ্রামস্থল। প্রতিটি বিশ্রামস্থলে বসার ব্যবস্থা। সারা পথে জলের কোন অভাব নেই। মরশুমে অসংখ্য দোকান বসে পথের দুধারে। জঙ্গল চটি, রামওয়াড়া

গরুড়চটি, দেবদেখনি ইত্যাদি চটির হোটেলে চা, দুধ ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা মেলে।

গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ যাঁরা হেঁটে যেতে চাইবেন না তাঁদের জন্য ঘোড়া, ডাণ্ডি ও কাণ্ডি সর্বদাই প্রস্তুত। সকল বয়সের মানুষই এখন কেদারনাথ দর্শনে সক্ষম।

মে থেকে অক্টোবর, ২০০৩ সালের সরকার অনুমোদিত যানবাহনের ভাড়ার তালিকা এখানে তুলে দিলাম - (সর্বাধিক)

ঘোড়া	—	যাতায়াত ১ রাত্রি ২ দিন	=	Rs.	800.00
”	—	যাতায়াত ১ দিন	=	Rs.	600.00
”	—	শুধু যাওয়া / আসা	=	Rs.	400.00
ডাণ্ডি	—	যাতায়াত ১ রাত্রি ২ দিন	=	Rs.	2100.00
”	—	যাতায়াত ১ দিন	=	Rs.	1700.00
কাণ্ডি	—	যাতায়াত ১ রাত্রি ২ দিন	=	Rs.	600.00
”	—	শুধু যাওয়া / আসা ১ দিন	=	Rs.	460.00
”	—	শুধু মালপত্র	=	Rs.	250.00

পূর্বেই বলেছি কেদারনাথ যাত্রা এখন অতি সহজ ও সুগম। আধুনিক যুগের সুযোগ সুবিধার কোন অভাব নেই কেদারনাথ ধামে। একমাত্র আমিষ ভোজীদের অসুবিধা। কেদারনাথ ধামে আমিষ নিষিদ্ধ। কেদারনাথ-বদ্রীনাথ যাত্রীদের ভ্রমণের কয়েকটা দিন নিরামিষ আহারের উপর নির্ভর করতে হয়।

১১৭৫৩ ফুট উচ্চতায় কেদারনাথ ধামে বসে আপনি এখন বাড়িতে ছেড়ে আসা প্রিয়জনের সাথে কথা বলতে পারেন। ভাবতেও আনন্দ। কেদারনাথ ধামে এখন PCO, STD, ISD - র ছড়াছড়ি।

মন্দির মার্গের উভয় পার্শ্বে আহার ও রসনা তৃপ্তির জন্যে গড়ে উঠেছে আধুনিক মানের অনেক অনেক হোটেল, রেস্তোরাঁ ও টি-স্টল। ফলে নানা পদের নানা স্বাদের খাবারের আর কোন অসুবিধা নেই। লালাজী, মালকানী, দোকানী ও হোটেল মালিকদের মধ্যে ভাল খাবার সরবরাহ ও পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে যাত্রীটানার প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়।

রাত্রিবাসের জন্য মন্দির কমিটির নিজস্ব ধর্মশালা, শঙ্করাচার্য স্মৃতি ভবন, ভারতসেবাশ্রম সংঘ, বিড়লা মঙ্গল নিকেতন, জয়পুরিয়া ভবন, পাঞ্জাব-সিন্ধ, কালীকমলী ধর্মশালা ইত্যাদি অসংখ্য লজ ও যাত্রীনিবাস তৈরি হয়েছে। প্রতিটি সংস্থাই যাত্রীটানার প্রতিযোগিতায় আপন আপন যাত্রীনিবাসের মান উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ফলে যাত্রীগণ নিজের চোখে দেখে পছন্দের আবাসন স্থির করার সুযোগ পাচ্ছেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আকাশছোঁয়া অগ্রগতিতে কেদারনাথজীর মাহাত্ম্য ও দেবত্বভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। বরং অধিক ভক্তের সমাগমে দেবতার সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উত্তরাঞ্চল সরকারের পর্যটন দপ্তর যাত্রী পরিষেবার উন্নয়নে নূতন Helicopter Service প্রবর্তন করেছে।

To render modern and better services to the tourists &

Rs. 8000.00

বাবা কেদারনাথ দর্শনে এসে একদিনে সবকিছু দেখা সম্ভব নয়। কেদারখণ্ডের সবকিছু দেখতে বা জানতে হলে কেদারে কয়েকদিন থাকতে হয়। কি কি দেখার আছে কেদারখণ্ডে তার একটা তালিকা আমার পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। শ্রীশ্রী কেদারনাথ ধামে দ্রষ্টব্যস্থান সমূহ ঃ-

১। মন্দিরের পশ্চাতে তুষার শুভ্র মেরু ও সুমেরু পর্বত। ভগবন কেদারনাথজীর সম্মানে এই দুই পর্বতের বর্তমান ঠিকানা 'কেদার শৃঙ্গ'।

২। হংস কুণ্ড — মন্দির আঙ্গিনা থেকে ৫০৯ মিঃ দূরে হেলীপ্যাডের দিকে।

৩। রেচক কুণ্ড — হংসকুণ্ড থেকে আরও ১০০ মিটার দূরে।

৪। উদক কুণ্ড — মন্দিরের ঠিক বিপরীতে, বাজারের মধ্যে দুর্গামন্দিরের নিকট।

৫। শঙ্করাচার্য সমাধিস্থল — মন্দাকিনীর তীরে, মন্দিরের পশ্চাতে, মন্দির থেকে কমবেশী ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

৬। ভৈরবনাথ মন্দির — মন্দির আঙ্গিনা থেকে কমবেশী ৮০০ মিটার দূরে অবস্থিত।

৭। চোরাবালি তাল — বিকল্প নাম - গান্ধী সরোবর। মন্দাকিনীর পরপারে। মন্দির থেকে কম বেশী ৩ কিমি ট্রেক।

৮। বাসুকীতাল (১৬০০০ ফুট) — মন্দির থেকে পূর্বদিকে ৮ কিমি ট্রেক। তালের তীরে বুগিয়ালে ব্রহ্মকমল ও ফেন কমলের অপূর্ব সমাবেশ। ফুল দেখারজন্য জুলাই - সেপ্টেম্বরের মধ্যে আসুন।

৯। ব্রহ্মগুম্ফা — মন্দির আঙ্গিনা থেকে উত্তরে ৫ কিমি ট্রেক। গ্লেসিয়ার অতিক্রম করে ব্রহ্মগুম্ফা।

শ্রীশ্রী কেদারনাথ দর্শনে গিয়েছি বহুবার। ২০০৩ সালে তিনবার কেদারনাথ দর্শনের সুযোগ হয়। ১৬ই অক্টোবর বছরের শেষ দর্শন। এবারের দর্শনে এবারে কেদারনাথ যাত্রায় কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়। এদের মধ্যে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির সমিতির Secretary & Deputy Chief Executive Officer Sri Jagadamba Prasad Nambudri বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

His service, sacrifice and dedication towards Lord Kedarnath is beyond estimation. He is great. He is divine. He is the best selection of the Badrikedar Temple committee. He is entrusted with the responsibility to look after the entire administration of the Kedarnath Temple during the session.

This Temple Committee was constituted under the Act of 1939, U.P Govt. now Uttaranchal. At present total 45 temples are under the Control of the Committee. New Committee is formed at the end of every three years.

Function & Objects of the Committee.

1. To worship & Pujas of the Gods & Goddesses of the temple should be done according to the sastra & vedas.
2. To arrange facilities to pilgrims to offer pujas and worship.
3. To arrange protection and securities of the Temple's properties both movable and immovable.
4. Donation given by the donors should be utilised according to their wishes. All kind of donations are utilised for the development of the temple. Discipline and all take responsible to bemaintained.
5. Committee promise to impart Sanskrit education amongst the local people.
6. To give Medical Aid to the pilgrims.
7. Food and scholarship are given to poor students of the localities.
8. Ayurvedic nictitation are conducted by the committee.

Funds are raised from the donation and offerings from the generous people of the country.

Temple Committee has its own guest House and Dharmashalas at the following places on Kedarnath Route.

1. Rishikesh	2. Devaprayag	3. Srinagar,
4. Rudraprayag	5. Gupta Kaashi	6. Kalimath
7. Madamaheshwar	8. Gourikund	9. Kedarnath

On Badrinath Route

1. Karnaprayag	2. Chamoli	3. Pipulkoti
4. Joshimoth	5. Badrinath.	

Advance booking for accommodation in the above mentioned guest houses are available from the Rishikesh Office. Near Chandravaga.

পঞ্চপ্রয়াগ

হিমালয় মাতৃসমা। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়। সৃষ্টির আদিপর্বে সৃষ্টিকর্তা হিমালয়ের বুকে জীবন ধারণের উপাদানগুলি সঞ্চারিত করেন। উপাদানগুলির মধ্যে জল অন্যতম। তাই জলের অপর নাম জীবন। সেই জীবনধারা ব্রহ্মপুত্র ,গঙ্গা, যমুনা, ভাগীরথী, অলোকানন্দা, মন্দাকিনী, কালীগঙ্গা, মধুগঙ্গা, ইত্যাদি শান্তির দূত হয়ে নিম্নভূ মে ধাবমানা। ধরণীর বুকে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত সুশীতল জীবনধারার স্পর্শে প্রাণময় হয়ে ওঠে। হিমালয় থেকে নির্গত অসংখ্য নদী সমতলভূমে নানা ছন্দে , নানা ভঙ্গিতে নানা প্রান্তে, পরস্পরে মিলিত হয়। সৃষ্টি হয় অসংখ্য সঙ্গম বা প্রয়াগ তীর্থ। এদের মধ্যে গাড়োয়াল হিমালয়ের দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ উল্লেখযোগ্য। এই পাঁচটি স্থান পঞ্চপ্রয়াগ নামে খ্যাত। পঞ্চপ্রয়াগ হিমালয়প্রেমী মানুষের পঞ্চতীর্থ । পাঁচটি নদীসঙ্গমের খ্যাতি বিশ্ব-ভুবনময়।

সঙ্গমের সৌন্দর্য , স্নিগ্ধতা ও শান্তির বাতাবরণে মুগ্ধ হয়ে স্বর্গের দেবতারাও নেমে আসেন। তাই সঙ্গমের স্নানে তীর্থস্থানের ফল লাভ হয়।

দেবপ্রয়াগ

উত্তরাঞ্চল, জেলা- টেহ্‌রী-গাড়োয়াল, উচ্চতা ৬১৮মি। প্রথম প্রয়াগ। দেবপ্রয়াগের খ্যাতি তার সঙ্গমের জন্য। হিমালয়ের দুই শ্রেষ্ঠ জীবনধারা ভাগীরথী ও অলোকানন্দার মিলন হয়েছে এইখানে। দেবতা তার সকল সৌন্দর্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে পবিত্র সঙ্গমে। তাই নাম হয়েছে দেবপ্রয়াগ। সঙ্গমে সুউচ্চ রঘুনাথ মন্দির তীর্থযাত্রীর অন্যতম আকর্ষণ ।

মন্দিরের বিগ্রহ রাম, লক্ষ্মণ ,সীতা , শিব ও বিষ্ণু মূর্তি।

সঙ্গমের সানবাঁধান ঘাটে শিকল ধরে স্নানের অপূর্ব ব্যবস্থা। সানবাঁধান চাতালে পিণ্ডদানের জন্য পূজারী ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন। ধর্মপ্রাণ যাত্রিগণের অনেকেই প্রিয়জনের চিতাভস্ম সঙ্গমে বিসর্জন দেন এবং পারলৌকিক ক্রিয়াদি

সম্পন্ন করেন।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার কিংবা ঋষিকেশ থেকে বাস, ট্যাক্সি ও জীপ মেলে। দূরত্ব যথাক্রমে ৯১ ও ৭১কিমি, দেরাদুন থেকে ১১২ কিমি, শ্রীনগর থেকে ৩৮ কিমি।

কোথায় থাকবেন ঃ থাকার জন্য জি এম ভি এন এর সুসজ্জিত টুরিষ্ট লজ আছে। বাসের চালককে আগে থেকে অনুরোধ করলে টুরিষ্ট লজের সামনেই আপনাকে নামিয়ে দেবে । টুরিষ্ট লজের পরিবেশ মনোমুগ্ধকর। দুই এক দিন থাকতে ভালই লাগে।

রুদ্রপ্রয়াগ

রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ৬১০মি। দ্বিতীয় প্রয়াগ। ঋষিকেশ থেকে কেদার-বদ্রীর পথে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগে পথ দ্বিধাবিভক্ত। বাঁহাতে অলোকানন্দার বুকে সেতু পেরিয়ে মন্দাকিনীর আঁচল ধরে পথ গিয়েছে কেদারনাথধাম, সোজা পথে বদ্রীনাথধাম। হিমালয়-দুহিতা দুই সহচরী অলোকানন্দা ও মন্দাকিনী আলিঙ্গনবদ্ধ । দুই যমজ শিশুকন্যা একত্রে মাতৃস্তন্য পানে দিশাহারা। সঙ্গমের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর । রুদ্রপ্রয়াগ এখন নবগঠিত উত্তরাঞ্চল রাজ্যের অন্যতম জেলাশহর। ঋষিকেশ থেকে দূরত্ব ১৪২কিমি। ঋষিকেশ থেকে কেদার-বদ্রীর পথ এখন জাতীয় সড়কের সম্মানে ভুষিত। নিকটতম রেলস্টেশন ঋষিকেশ অথবা দেরাদুন।

কথিত আছে সঙ্গীতগুরু নারদ মুনি সঙ্গমের তীরে বসে মহাদেবের উপাসনা করতেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে রুদ্র-মূর্তিতে নারদের সম্মুখে উপস্থিত হন। সেই থেকে স্থানের নাম হয় রুদ্র প্রয়াগ। সঙ্গমের ঠিক উপরে রুদ্র ভগবান ও জগদম্বার মন্দির। সঙ্গমের বাঁধান ঘাটে স্নান, পূজা-পাঠ ও মন্দিরে অর্ঘ্য নিবেদন ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রীর বড়ই প্রিয়।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার , ঋষিকেশ অথবা দেরাদুন থেকে সরাসরি বাস, ট্যাক্সি ও জীপ পাবেন।

কোথায় থাকবেন ঃ গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের নবনির্মিত সুসজ্জিত টুরিষ্ট লজ ,অলোকানন্দার উভয়তীরে কালীকমলী ধর্মশালা ও প্রাইভেট হোটেল ও লজ পাবেন ।

কর্ণপ্রয়াগ

রাজ্য- উত্তরাঞ্চল । উচ্চতা ৭৯৫মি। অলোকানন্দা ও পিণ্ডার নদীর সঙ্গম। তৃতীয় প্রয়াগ। ঋষিকেশ থেকে বদ্রীনারায়ণের পথে ৫৮নং জাতীয় সড়কের উপর কর্ণপ্রয়াগ। ঋষিকেশ থেকে দূরত্ব ১৭৩কিমি। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিচারে কর্ণপ্রয়াগের গুরুত্ব সমধিক। শুধু নদীসঙ্গম নয় , পথেরও মহাসঙ্গম কর্ণপ্রয়াগ । কর্ণপ্রয়াগ থেকে পিণ্ডার নদীর তীর বেয়ে পথ গিয়েছে কুমায়ুনের দিকে । ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাচীন ঋষিবর কর্ণের আশ্রম ছিল সঙ্গমের অনতিদূরে। ঋষির নামানুসারে স্থানের নাম কর্ণপ্রয়াগ । বর্তমান উত্তরাঞ্চল সরকারের ট্যুরিষ্ট বাংলো বসেছে সেই আশ্রমে। বনাঞ্চলে সুশোভিত প্রাচীন কর্ণপ্রয়াগ এখন আধুনিক শহর। কুরুক্ষেত্রের অপরাজেয় বীর কর্ণের জন্ম কর্ণপ্রয়াগে। মতান্তরে কর্ণের নামানুসারে স্থানের নাম । ঋষিকেশ থেকে বাস, ট্যাক্সি,ও জীপে কর্ণপ্রয়াগ আসা যায়। থাকার জন্য হোটেল , লজ ও ধর্মশালা পাবেন। কর্ণপ্রয়াগ এখন মহকুমা শহর। সঙ্গমে নারায়ণ, গোপাল, শিব ও উমাদেবীর মন্দির। একদিকে ঋষিকেশ -বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক, অপরদিকে পথ গিয়েছে নৈনিতাল, রাণীক্ষেত কৌশানি, গোয়ালদাম, পিণ্ডারী ইত্যাদি।

কিভাবে যাবেন ঃহরিদ্বার ,ঋষিকেশ অথবা দেরাদুন থেকে সরাসরি বাস, ট্যাক্সি, জীপ পাবেন।

কোথায় থাকবেন ঃ জি.এম. ভি. এন এর সুসজ্জিত টুরিষ্ট লজ ও প্রাইভেট হোটেল পাবেন।

নন্দপ্রয়াগ

রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। উচ্চতা ৯১৪মি। অলোকানন্দা ও নন্দাকিনী নদীর সঙ্গম। চতুর্থ প্রয়াগ। বদ্রীনাথধাম থেকে আগতা অলোকানন্দা , নন্দাদেবী হিমবাহ থেকে নির্গতা নন্দাকিনী। ঋষিকেশ থেকে দূরত্ব ২০৫ কিমি। নন্দপ্রয়াগ থেকে ১০কিমি চড়াই পথে চামোলী। ২২কিমি উৎরাই পথে কর্ণপ্রয়াগ। থাকার জন্য টুরিষ্ট রেষ্ট হাউস, মন্দির কমিটির অতিথিশালা,এবং প্রাইভেট হোটেল পাবেন। পৌরাণিক কাহিনী অতি চমৎকার। কথিত আছে এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন নন্দঘোষ। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও প্রজাবৎসল । তাঁরই নামানুসারে সঙ্গমের নাম রাখা হয় নন্দপ্রয়াগ। শোনা যায় রাজা কোন একসময় এই সঙ্গমের তীরে এক মহতী যজ্ঞের আয়োজন করেন। ভগবান বিষ্ণুকে পুত্ররূপে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি যজ্ঞের সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সেবায় ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

একই বর প্রাপ্ত হন নন্দের নিকট আত্মীয়া দেবকী। দেবকী তখন অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারে বন্দী। রাজা কংস ছিলেন লোভী, পরশ্রীকাতর , নিষ্ঠুর। তিনি জানতে পারেন দেবকীর গর্ভের সন্তানই তার মৃত্যুর কারণ। তাই তিনি দেবকীকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন এবং পর পর সাতটি নবজাতককে হত্যা করেন। ভগবান বিষ্ণু সর্বশক্তিমান। তিনিই সৃষ্টি , স্থিতি বিনাশের কারণ। তিনিই কৃষ্ণনাম নিয়ে দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাতের অন্ধকারে বসুদেব নবজাতককে নন্দের গৃহে যশোদার কোলে রেখে আসেন।

কিভাবে যাবেন ঃএপথে বাস, ট্যাক্সি ও জীপ মেলে ।

কোথায় থাকবেন ঃ থাকার জন্য টুরিষ্ট রেষ্ট হাউস, মন্দির কমিটির অতিথিশালা পাবেন।

বিষ্ণুপ্রয়াগ

অলোকানন্দা ও ধৌলীগঙ্গার সঙ্গম। পঞ্চম প্রয়াগ। যোশীমঠ ও পাণ্ডুকেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। উচ্চতা ১৩৭২মি। যোশীমঠ থেকে চড়াই পথে ১২কিমি, ঋষিকেশ থেকে ২৬৮কিমি। এপথে সর্বত্রই বাস, ট্যাক্সি ও জীপ মেলে। থাকার জন্য ১২কিমি দূরের যোশীমঠকে বেছে নেবেন। বিষ্ণুপ্রয়াগের অন্য আকর্ষণ বিষ্ণুকুণ্ড এবং বিষ্ণু মন্দির।

কথিত আছে অতি প্রাচীনকালে মহর্ষি নারদ বিষ্ণুকুণ্ডের তীরে বসে ধ্যান করেন। বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে পথ গিয়েছে কাকভূষণ্ডিতাল। অন্যপথে গোবিন্দঘাট নেমে ভিউণ্ডার গ্রাম হয়ে কাকভূষণ্ডিতাল যাওয়া যায়।

নব-কেদার

হিমালয়ের পঞ্চকেদারের সাথে অনেকেরই পরিচয় আছে। হিমালয় মন্থনে বেরিয়ে আরও চার কেদারের সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়। গ্রন্থরচনার সুবাদে সেই চার কেদারের সাথে আমার পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। বুড়াকেদার, বসুকেদার, ভবিষ্যকেদার ও পশুপতিনাথ।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর মহাদেবের দর্শনপ্রার্থী হয়ে পাণ্ডবগণ হিমালয়ে আসেন । মহাদেব সত্যের প্রতীক । সৃষ্টি , স্থিতি ও প্রলয়ের সর্বময় অধিকর্তা। ন্যায়ের মানদণ্ড, অন্যায়ের বিভীষিকা । পাণ্ডবদের বিশ্বাস দেবাদিদেবের দর্শনে , সকল পাপ থেকে মুক্তি। মহাদেব কিছুতেই পাণ্ডদের দর্শন দিতে রাজি ছিলেন না। ভাল কর্মের জন্য পুরস্কার, মন্দ কর্মের তিরস্কার সকলেরই প্রাপ্য। যুদ্ধে আত্মীয় নিধনের ফলে পাপের সঞ্চার হয় , পাণ্ডবগণকে তার ফল ভোগ করতেই হয়। মহাদেব মহিষের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেন। সুচতুর পাণ্ডবগণ মহাদেবের অভিপ্রায় অনুধাবন করেন। কেদারখণ্ডে মহিষরূপী মহাদেব পাতাল প্রবেশে উদ্যোগী হন। সেই মুহূর্তে পাণ্ডবগণ মহিষের পশ্চাতার্ধ জাপটে ধরেন। সেই থেকে কেদারে মহিষের পশ্চাৎ ভাগের ন্যায় এক খণ্ড শিলা দেবতা জ্ঞানে আজিও পূজিত হয়ে আসছে । কথিত আছে পাণ্ডবগণ গাড়োয়ালের পাঁচটি স্থানে ছদ্মবেশী মহাদেবের প্রস্তরময় মূর্তির পাঁচটি অঙ্গের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই পাঁচটি স্থান পঞ্চকেদার নামে খ্যাত।

কেদারনাথ

রাজ্য উত্তরাঞ্চল , জেলা রুদ্রপ্রয়াগ, পঞ্চকেদারের প্রথম কেদার। ৩৫৮৩মি উচ্চতায় সুমেরু পর্বতের পাদদেশে মন্দিরের অবস্থিতি । কথিত আছে পাণ্ডবগণ এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন। গর্ভমন্দিরে মহিষরূপী মহাদেবের শিলাময় মূর্তির পশ্চাতার্ধ প্রকাশিত।

প্রান্তিক বাসস্টেশন গৌরীকুণ্ড(১৯৮১মি)। ঋষিকেশ থেকে গৌরীকুণ্ড বাসপথে ২১৮কিমি। গৌরীকুণ্ড থেকে চড়াই পথে কেদারনাথ ,১৪কিমি ট্রেক।

পথে জঙ্গলচটি, রামওয়াড়া, দেবদেখনি ইত্যাদি চটিতে আহার্য ও বিশ্রামের জন্য জায়গা পাবেন। রামওয়াড়াতে এখন থাকার কোন অসুবিধা নেই। বিড়লা মঙ্গল নিকেতনের ঘরগুলি বেশ বড় এবং সুসজ্জিত। টয়লেটবাথ অতি চমৎকার। জি.এম.ভি.এন. এর নবনির্মিত টুরিষ্ট লজের ব্যবস্থাও উন্নতমানের।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে বাস, ট্যাক্সি অথবা জীপে গৌরীকুণ্ড আসুন। গৌরীকুণ্ড থেকে হাঁটাপথে অথবা ঘোড়া, ডাণ্ডি-কাণ্ডিতে কেদারনাথ।

কোথায় থাকবেন ঃ থাকার জন্য গৌরীকুণ্ডে ও কেদারনাথে ভারত সেবাশ্রমসংঘের যাত্রীনিবাস, কালীকমলী ধর্মশালা, হোটেল দেবলোক, হোটেল শিবলোক, পাঞ্জাব সিন্ধ, ইত্যাদি প্রাইভেট হোটেল ও লজ পাবেন।

মদমহেশ্বর

রাজ্য, উত্তরাঞ্চল, জেলা, রুদ্রপ্রয়াগ, দ্বিতীয় কেদার। মদমহেশ্বরে মহিষ রূপী মহাদেবের নাভি প্রকাশিত। ৩২৮৯মি উচ্চতায় তুষারশুভ্র চৌখাম্বা শৃঙ্গের পাদদেশে মদমহেশ্বরের অবস্থিতি। সবুজের কার্পেট পাতা সুবিশাল আঙ্গিনার মধ্যমণি মদমহেশ্বর মন্দির। প্রাকৃতিক শোভা মনোমুগ্ধ কর। মন্দির গাত্রে উত্তর ভারতীয় শিল্প কলার নিদর্শন দেখা যায়। মদমহেশ্বর থেকে কেদারনাথ ও নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ দৃশ্যমান। নিকটতম বাসস্টেশন উখিমঠ ও কালীমঠ। ঋষিকেশ থেকে উখিমঠ ১৯০ কিমি, কালীমঠ ১৯৬কিমি। কালীমঠ থেকে চড়াই পথে ৩১ কিমি ট্রেক। উখিমঠ থেকে ১৭ কিমি ট্রেক। মদহেশ্বরের আঙ্গিনা থেকে ১কিমি উপরে বৃদ্ধ মদমহেশ্বরের মন্দির দেখতে ভুলবেন না।

কিভাবে যাবেনঃ হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে বাস, ট্যাক্সি অথবা জীপে উখিমঠ এসে নামুন। উখিমট থেকে জীপে ১৬কিমি উনিয়ানা এসে নামুন। উনিয়ানা থেকে হাঁটা পথের শুরু। মোট ১৭কিমি ট্রেক। রাঁশু-২, গৌণ্ডার -৩, বানতৌলি-৩, নানু-৪, মদমহেশ্বর-৫। যাঁরা পঞ্চকেদার করতে চান তাঁরাও কেদারনাথ দর্শনের পর গৌরীকুণ্ড থেকে বাস অথবা জীপে উখিমঠ এসে নামবেন। উখিমঠ তহশীল শহর। থানা, দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক,

পোষ্টঅফিস, ইত্যাদি সবকিছুই আছে উখিমঠে। অপরিসর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সর্বদাই জীপ মেলে উনিয়ানার।

কোথায় থাকবেন ঃ থাকার জন্য উখিমঠে ভারতসেবাশ্রম সংঘের যাত্রীনিবাসের কোন তুলনা নেই। কালীমঠে মন্দির কমিটির নবনির্মিত ধর্মশালার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। গুপ্তকাশীতে থাকা আরও সুবিধাজনক। গুপ্তকাশীতে পাঞ্জাবসিন্ধ-এর ব্যবস্থা মনেরমত। গুপ্তকাশী থেকে সর্বদাই বাস অথবা জীপ মেলে গৌরীকুণ্ড, কালীমঠ, উখিমঠ আসার। ট্রেকিং পথে লেঙ্ক, রাঁশু, গৌণ্ডার অথবা বানতৌলিতে প্রাইভেট বাড়ি ও ধাবায় রাত কাটান যায়। মদমহেশ্বরে মন্দির কমিটির ধর্মশালার ব্যবস্থা ভালই।

তুঙ্গনাথ

রাজ্য ঃ উত্তরাঞ্চল, জেলা ঃ রুদ্রপ্রয়াগ, ৩৬৮০মি উচ্চতায় চৌখাম্বার ছত্রচ্ছায় তুঙ্গনাথের অবস্থিতি। তৃতীয়কেদার। তুঙ্গনাথে ছদ্মবেশী মহাদেবের বাহু প্রকাশিত। গাড়োয়ালের সর্বোচ্চ তীর্থমন্দির। নিকটতম বাসস্টেশন চোপতা। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথ ৩ কিমি ট্রেকি। তুঙ্গনাথ থেকে ১কিমি উপরে চন্দ্রশিলা। কথিত আছে রামচন্দ্র চন্দ্রশিলায় বসে তপস্যা করেছিলেন। চন্দ্রশিলায় দাঁড়িয়ে চৌখাম্বাকে খুবই নিকটে দেখায়, মনে হয় যেন লাফিয়ে চলে যাই।

কিভাবে যাবেন ঃ হরিদ্বার, ঋষিকেশ অথবা ডেরাদুন থেকে রিজার্ভ ট্যাক্সি অথবা জীপে সরাসরি উখিমঠ হয়ে চোপতায় এসে নামুন। চোপতায় মঙ্গল সিং- এর আস্তানায় অথব পি, ডবলু. ডি. রেষ্ট হাউসে রাত কাটান। চোপতা থেকে ৩কিমি ট্রেক তুঙ্গনাথ। পঞ্চকেদারের যাত্রীগণ মদমহেশ্বর দর্শনের পর উখিমঠ ফিরে এসে গোপেশ্বরগামী বাস অথবা জীপে চোপতায় এসে নামুন। চোপতা বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সামান্য উপরে মঙ্গল সিং-এর ধাবা। মঙ্গল সিং এপথে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি ও নির্ভরযোগ্য। মঙ্গলের কাছে বাড়তি মালপত্র রেখে ও চা-পান করে তুঙ্গনাথের পথে যাত্রাকরাই সুবিধা। ইচ্ছাকরলে তুঙ্গনাথ দর্শন করে চোপতায় এসে রাত্রিবাস করা যেতে পারে।

কোথায় থাকবেন ঃ থাকার জন্য চোপতা ও তুঙ্গনাথে পি ডব্লু ডি

বাংলো ওপ্রাইভেট হোটেল পাবেন। মঙ্গলের কথা পূর্বেই বলেছি, তুঙ্গনাথে বচনসিং-এর ছেলে বিক্রমের কাছেও রাত কাটাতে পারেন।

রুদ্রনাথ

রাজ্য ঃ উত্তরাঞ্চল , জেলা ঃ চামোলী, উচ্চতা-২২৮৬মি, চতুর্থকেদার। গুহামন্দির । রুদ্রনাথে মহাদেবের আনন প্রকাশিত। নিকটতম বাসস্টেশন সাগর অথবা মণ্ডল। গোপেশ্বর জেলা সদর । সাগর থেকে ১৫ কিমি ট্রেক। পানার গুম্ফায় অথবা তাঁবুর ঘরে প্রথম রাতের বিশ্রাম। রুদ্রনাথে থাকার জন্য মন্দির কমিটির যাত্রীনিবাস আছে। মণ্ডল থেকে মাতা অনসূয়া ৫ কিমি,অনসূয়া থেকে ডুমক হয়ে রুদ্রনাথে নামা যায়।

কিভাবে যাবেন ও কোথায় থাকবেন ঃ কেদারনাথ-বদ্রীনাথের পথে গোপেশ্বর। গোপেশ্বর জেলাশহর। হরিদ্বার,ঋষিকেশ থেকে সরাসরি বাস পাবেন গোপেশ্বরের। কেদারনাথ,বদ্রীনাথ থেকে সরাসরি বাস অথবা জীপে গোপেশ্বর এসে নামুন। রাত্রিবাস। রুদ্রনাথের পথে মালবহনের জন্য পোর্টার ও কুলি গোপেশ্বর থেকে ঠিক করে নেবেন। এবিষয়ে হোটেলের মালিকের পরামর্শ নিতে পারেন। গোপেশ্বর থেকে সাগর ৩ কিমি। আগের দিন জীপ বা অটো বলে রাখুন, অতি প্রত্যুষে সাগরে পৌঁছে দেবে। সাগর থেকে ট্রেক শুরু। প্রথম দিন ৭কিমি ট্রেক , পানার গুম্ফায় রাত্রি বাস। দ্বিতীয়দিন ৮ কিমি ট্রেক, মন্দির কমিটির যাত্রী নিবাসে রাত্রিবাস।

কল্পেশ্বর

রাজ্য-উত্তরাঞ্চল, জেলা চামোলী, উচ্চতা ৭৫০০ফুট। পঞ্চমকেদার । গুহামন্দির। কল্পেশ্বরে মহাদেবের জটা প্রকাশিত। নিকটতম বাসস্টেশন হেলাং। হেলাং থেকে ৯কিমি ট্রেক। পথের সৌন্দর্য অসাধারণ।

হেলাং নেমে মন্দাকিনীর বুকে পুল পেরিয়ে দক্ষিণ পারে চলে আসুন। কল্পগঙ্গা নদীর তীর বেয়ে পথ গিয়েছে উর্গম। উর্গম থেকে ২কিমি ট্রেক কল্পেশ্বর গুহামন্দির। কল্পগঙ্গার বুকে ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ। পথের চেহারা

সমতল। দিনে দিনে বেড়িয়ে পিপুলকোটি অথবা যোশীমঠে ফিরে রাতকাটানো যায়। এপথে পর্যটক কম আসে। উর্গম গ্রামে প্রাইভেট বাড়িতে বা পথিকলজে রাতকাটান যায়।

কিভাবে যাবেন ঃ কল্পেশ্বরের যাত্রীদের আগের দিন পিপুলকোটি অথবা যোশীমঠে রাতকাটান উচিত। পরদিন ভোরের প্রথম বাস অথবা জীপে চেপে হেলাং এসে নামুন। দিনে দিনে কল্পেশ্বর বেড়িয়ে যোশীমঠ অথবা পিপুলকোটি ফিরে রাত্রিবাস।

বুড়াকেদার

রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা - টেহ্‌রী গাড়োয়াল। এই গ্রন্থে বুড়াকেদারের বর্ণনা পূর্বেই দিয়েছি। তবুও কেদার সিরিজে বুড়াকেদার সকলের অগ্রগণ্য। বুড়াকেদার গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সর্ববৃহৎ লিঙ্গ মূর্তি। সকল গাড়োয়ালবাসীর আরাধ্য দেবতা। দেবতার নামেই গ্রামের নামকরণ। বালগঙ্গা ও ধর্মগঙ্গার সঙ্গমে অবস্থিত। কথিত আছে রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গমে বসে তর্পণ করেছিলেন। তাই সঙ্গমের আর এক নাম ধর্মপ্রয়াগ। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের একমাত্র লিঙ্গ মূর্তি যেখানে পঞ্চপাণ্ডবের আলিঙ্গনের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি ছাড়াও ত্রিশূলধারী শঙ্কর ভগবান, মাতা পার্বতী, দ্রৌপদী, নন্দি মহারাজ, ইত্যাদি মূর্তি সুবৃহৎ লিঙ্গমূর্তিতে আজও বর্তমান। বুড়াকেদারের পাশের ঘরে অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি, মূর্তির ডাইনে কালভৈরব, পাশেই গুরু গোরখনাথের গদি।

কিভাবে যাবেন ঃ ঋষিকেশ থেকে সরাসরি বাস অথবা জীপে বুড়াকেদার আসা যায়। ঋষিকেশ থেকে প্রতিদিন সকাল ৯টায় বুড়াকেদারের বাস ছাড়ে, ঐ বাস বিকাল ৫টায় বুড়াকেদার পৌছায়। টেহ্‌রী, ঘাংশিয়ালী, চামিওয়াল, তলিবান, বিনাখাল হয়ে পথ গিয়েছে বুড়াকেদার। এপথে রিজার্ভ ট্যাক্সি বা জীপে যাওয়াই সুবিধা।

কোথায় থাকবেন ঃ বুড়াকেদার বাস স্ট্যাণ্ডের উপর প্রাইভেট হোটেলে রাত কাটাতে পারেন, অথবা শ্রীনগর ফিরে রাত কাটাতে পারেন।

বসুকেদার

রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। লিঙ্গমূর্তি। গুপ্তকাশী অথবা উখিমঠ থেকে জীপ মেলে বসুকেদার আসার। কথিত আছে পাণ্ডবগণ ধর্মের প্রতীক। ধর্ম রক্ষার্থে শঙ্কর ভগবান কৈলাস থেকে মর্ত্যে নেমে আসেন। কেদারনাথের পথে তিনি এইখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

ভবিষ্যকেদার

রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা-চামোলী। যোশীমঠের প্রাণকেন্দ্র। বদ্রীনাথের পথে যোশীমঠে বিশ্রাম নিয়ে ভবিষ্যকেদার দেখে নেওয়াই সুবিধা। শঙ্করাচার্য আশ্রম যোশীমঠের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। আশ্রম পেরিয়ে সামান্য এগিয়ে কল্পবৃক্ষ। কল্পবৃক্ষের নীচে জগতগুরু শঙ্কারাচার্যের সাধনপীঠ, একদিকে শঙ্কর ভগবানের লিঙ্গমূর্তি। কথিত আছে কলির অবসানে কেদারনাথের পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে, সেইসময় এইখানেই কেদারনাথের পূজা ও আরতির ব্যবস্থা হবে। তাই এই স্থানকে বলা হয় ভবিষ্যকেদার।

পশুপতিনাথ কেদার

শঙ্কর ভগবান যখন পাতালে প্রবেশ করেন তখন তার পশ্চাতার্ধ কেদারখণ্ডে এবং সম্মুখ ভাগ নেপালে পশুপতিনাথে প্রকট হয়। তাই পশুপতিনাথের অপর নাম পশুপতিনাথ কেদার।

মুনস্যারী

হিমালয়ের কুমারী কন্যা মুনস্যারী। কুমায়নী সাজে চির সবুজ, চির নবীন, চির শুভ্র। পঞ্চ মুকুটে গরবিনী, যৌবন তরঙ্গে হিল্লোলিনী, প্রানোচ্ছ্বাসে কল্লোলিনী। প্রকৃতির বাসর ঘরে চির বসন্তের মাধবী মঞ্জরী।

তার আহ্বানে প্রকৃতি-প্রিয়া-হৃদয় তরঙ্গায়িত হয়। তার রূপের সাগরে প্রাণনাথের মুরলী-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত। গোরী-গঙ্গার জল সিঞ্চনে চরণ যুগল সর্বদাই বিধৌত। পাহাড় পাগল ছেলে-মেয়েরা তার বুকে আকণ্ঠ পান করে মিলামের পথে যাত্রা করে। মিলাম হিমবাহের প্রবেশ দ্বার মুনস্যারী। এ হেন মুনস্যারীর বুকে মাথা রেখে ঘুমোতে কার না ইচ্ছা হয়!

অতীতে এটাই ছিল তিব্বত ও চীনের হাঁটা পথ। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমনের সময় দালাইলামা এ পথেই ভারতে প্রবেশ করেন। অতীতে চীন ও তীব্বতের সাথে ব্যবসা বানিজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল মুনস্যারী। শোনা যায় অতীতে কৈলাস ও মানস সরোবর যাত্রার এটাই ছিল সহজ পথ।

শত্রুর আক্রমণে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়, পরস্পরের মধুময় সম্পর্ক আজ অবলুপ্ত। বৈদেশিক আক্রমণের ভয়ে ভারতকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। মুনস্যারীর পর থেকে সমগ্র সীমান্ত এলাকা এখন ITBPF (Indian Tibetian boarder police force) দ্বার নিয়ন্ত্রিত। ITBPF ভারতের নিজস্ব বাহিনী। মিলামের পথে এই বাহিনীর সান্নিধ্য বড়ই মধুর। পর্যটকগণ এদের কাছে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। পেয়ে থাকেন বন্ধু ও আত্মীয় সুলভ ব্যবহার।

মুনস্যারী এখন থানা, মুনস্যারী তহশীল, জেলা পিথরাগড়ের গর্ব। পাহাড়ী শহর মুনস্যারী। উচ্চতা ২১৩৫ মিটার। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। স্বাস্থোদ্ধারের আদর্শ পীঠস্থান। প্রধান আকর্ষণ পঞ্চচুলি। তুষার শুভ্র গিরিশৃঙ্গ এতই নিকটে মনে হয় যেন লাফিয়ে চলে যাই, পঞ্চচুলির পাঁচটি শৃঙ্গ অতি চমৎকার ভাবে

দৃশ্যমান। পর্যটন শিল্পে মুনস্যারীর গুরুত্ব অনেকের উর্ধ্বে।

অথচ মুনস্যারীর মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, শ্রীহীনা শহরের সন্দর্শনে মনে মনে বেদনা অনুভব করি। ঠিক যেন অযত্নে পালিতা মাতৃহীনা কন্যা।

ভারতের নানা প্রান্ত থেকে ভ্রমণ-প্রিয় দেশী-বিদেশী পর্যটকের অনেকেই মুনস্যারী আসেন মনের তৃষ্ণা মেটাতে। বাঙালী ভ্রমণ পিপাসু মানুষের স্বপ্নের বারাণসী মুনস্যারী।

বাঙালী ভ্রমণ প্রিয়, হিমালয় প্রেমী। গিরিরাজের প্রতি তার দুর্বলতা চিরন্তন। পাহাড় পাগল বাঙালীর জীবনে মুনস্যারীর কোন দোসর মেলে না।

কলকাতার যাত্রীদের হলদুয়ানী হয়ে মুনস্যারী আসাই সুবিধা। হাওড়ায় ট্রেনে চেপে কাঠগুদামের ঠিক আগের স্টেশন হলদুয়ানী এসে নামা। হলদুয়ানী থেকে বাস, ট্যাক্সি কিংবা জীপে মুনস্যারী। দূরত্ব ২৯২ কিমি, বাস ভাড়া ১৮৫ টাকা।

প্রতিদিন রাত ৯-২০ মিঃ হাওড়া থেকে বাঘ এক্সপ্রেস ছাড়ে। ঐ গাড়ী তৃতীয় দিন সকালে হলদুয়ানী পৌছায়। ঐ দিনটা হলদুয়ানীতে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন মুনস্যারীর পথে যাত্রা করাই শ্রেয়। হলদুয়ানী থেকেই বাসের যাত্রা শুরু। তাই বাসে পছন্দের সিট পেতে কোনই অসুবিধা হয় না।

স্টেশন থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে হোটেল, লজ ও বাসস্টেশন। স্টেশনে মালপত্র ও সঙ্গী-সাথীকে রেখে নিজে গিয়ে হোটেল ঠিক করে আসা যায়। স্টেশন থেকে বাসস্টেশন রিক্সা ভাড়া ৫ টাকা।

হলদুয়ানীতে দুটি বাসস্টেশন। প্রথমেই কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের (KMVN) বাসস্টেশন। এদের এখান থেকেই প্রতিদিন ভোর ৫টায় মুনস্যারীর বাস ছাড়ে। সামান্য এগিয়ে ডানহাতে সরকারী বাস স্টেশন। সরকারী বাস স্টেশন থেকে হরিদ্বার, দিল্লী, আলমোড়া, রাণীক্ষেত, নৈনীতাল ইত্যাদি নানা স্থানের গাড়ি মেলে।

বাস স্টেশন থেকে অতি অল্প দূরত্বে নৈনীতাল রোড। নৈনীতাল রোডে নামি দামি পছন্দের হোটেল পাবেন।

অথবা রিক্সায় মালপত্র চাপিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন।

রিক্সায় ভাড়া প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া উচিত।

প্রথমেই গ্রীন হোটেল। সাধারণের পক্ষে মন্দ নয়। এদের এখান থেকে KMVN-এর বাসস্টেশন অতি নিকটে। বিকাল ৫-৬টার মধ্যে দূর পাল্লার সকল বাস এসে যায়। যাত্রার আগের দিন বাসে সিট পছন্দ করা যায়। ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরকে বাসেই পাবেন। এদের সাথে কথা বলে রাখলে হোটেলের ঘরে গিয়ে যাত্রীকে ডেকে নিতে কোন দ্বিধা করে না।

নিরামিষ আহারের জন্য শুদ্ধ ব্যঞ্জনা ভোজনালয় দেখতে পারেন। বাস স্টেশনের নিকটে থাকলে ভোরের বাস ধরার কোন ঝুঁকি থাকে না।

এতক্ষণ মুনস্যারী ভ্রমণের সহজ ও সরল পথের কথাই বলেছি। আমার পাঠক ইচ্ছা করলে গাড়োয়াল হয়ে মুস্যারী আসতে পারেন। আমার যাত্রাপথ ছিল গাড়োয়াল হয়ে মুনস্যারী।

এবছর অর্থাৎ ২০০৩ সালে তিনবার গাড়োয়াল যাই। প্রতিবারই কোয়ার্টারমাস্টার সাশ্রুনয়নে হাওড়া স্টেশনে বিদায় জানায়। বাড়ি থেকে যাত্রাকালে মুনস্যারী ভ্রমণের কথা আদৌ ভাবিনি। কিভাবে মুনস্যারী আসি সেটা ভাবতেই নিজেই অবাক হই।

গত ৭ই অক্টোবর প্রাচীন পথে অর্থাৎ পঞ্চপাণ্ডবদের পথে কেদার দর্শনের সংকল্প নিয়ে গাড়োয়ালে পাড়ি জমাই। প্রাচীন পথে কেদার দর্শনের পর মনের শক্তি ও সাহস যেমন বেড়ে যায়, দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ফলে শরীর ও মনে কিছুটা ক্লান্তিভাব অনুভব করি। কয়েকদিন বিশ্রামের ইচ্ছা নিয়ে পাহাড় থেকে ঋষিকেশ নেমে আসি।

ফেরার পথে ২/১ জন বাঙালী পর্যটকের সাথে দেখা হয়। কেদারনাথে রামতনু ও দূর্বা চট্টোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য স্মৃতি ভবনে এসে অভিনন্দন জানায়। রুদ্রপ্রয়াগে নৈহাটির ছেলে রাজেন্দ্রর সাথে দেখা। রাজেন্দ্র বাড়ি থেকে একাই এসেছে হিমালয়ের তীর্থ-ভ্রমণে। বাবা মায়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় অর্ঘ্য নিবেদনের মানসে তার হিমালয় পরিক্রমা।

ঋষিকেশে কয়েকদিন বিশ্রামের পর মনে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করি। পূর্বেই বলেছি ইদানীং ফেরার রিজার্ভেশন করে পাহাড়ে আসি

না। তাই সময় কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে না। ইতিমধ্যে মিলামের স্বপ্ন মনের গভীরে অনেকটাই দানা বাঁধে। কুমায়ুনের অন্যতম আকর্ষণ মিলাম গ্লেসিয়ার। মুনস্যারী থেকেই মিলামের পথে যাত্রা শুরু। সেই আকর্ষণে মুনস্যারীর ঘরে কয়েক দিনের অতিথি।

গাড়োয়াল থেকে কুমায়ুনে আসার সহজ ও সরল পথ কর্ণপ্রয়াগ হয়ে গোয়ালদাম। হরিদ্বার কিংবা ঋষিকেশ থেকে বদ্রী অথবা গোপেশ্বরগামী যে কোন বাসে কর্ণপ্রয়াগ এসে নামতে হয়।

গত ২১শে অক্টোবর ২০০৩, সকাল ৬টায় ঋষিকেশের অস্থায়ী আবাসনকে বিদায় জানিয়ে হরিদ্বার ডেরাদুন রোডের জংশনে এসে দাঁড়াই। সেখানেই গোপেশ্বরগামী বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ঐ গাড়িতে চেপে বসি। গাড়িতে যাত্রীর ভিড় ছিল না। সুতরাং পছন্দের সিট পেতে কোন অসুবিধা হয় না। ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ বাস ভাড়া ১০০ টাকা। বিকাল ৩টে কর্ণপ্রয়াগ এসে গাড়ি দাঁড়ায়।

সাথে সাথেই থরালীর বাস পাই। কর্ণপ্রয়াগ থেকে থরালী বাস ভাড়া ৩০ টাকা। থরালী থেকে জীপে গোয়ালদাম। দূরত্ব ২০ কিমি, ভাড়া ২০ টাকা। এ পথ অতি চমৎকার। সারা পথ পিণ্ডারীর আঁচল ধরে পথ চলা। গোয়ালদাম প্রবেশের আগে থেকেই ত্রিশূল, নন্দাদেবী ও নন্দাঘুন্টির সন্দর্শনে আনন্দে পাগল হয়ে যাই। সুনির্মল আকাশের গায়ে ধ্যানমৌন ঋষিগণের এমন শান্ত সমাহিতরূপ আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। গোয়ালদাম এসে খেলাপের নব নির্মিত Guest House - এ আশ্রয় নিই।

গোয়ালদাম থেকে ভোর ৫টায় পিথোরাগড়ের বাস ছাড়ে। ঐ গাড়ি থল হয়ে যায়। থল থেকে জীপে মুনস্যারী।

সন্ধ্যার পূর্বেই দূরপাল্লার গাড়ি গোয়ালদামে এসে যায়। বাসস্টেশনের উপর খেলাপ সিংয়ের Fast Food Centre ও Guest House । গাড়িতে গিয়ে Driver ও Conductor - এর সাথে কথা বলি।

পরদিন অতি প্রত্যুষে গাড়ি ছাড়ে। ঠিক বেলা ১১টায় গাড়ি এসে থল দাঁড়ায়। উচ্চতা ১০০০ মিঃ। সকাল ৫টায় গাড়ি ছাড়ে। কোথাও দাঁড়ানোর

অবকাশ নেই। থলে এসে চা পান করি।

সাথে সাথেই মুনস্যারীর সুমো গাড়ি পাই। গাড়ি ছাড়তে অনেক দেরী করে। যাত্রী পুরা না হলে গাড়ি ছাড়তে দেরী করে। গাড়িতে মালপত্র তুলে দিই। এদিকে ওদিকে হাতে সময় পেয়ে থলকে ভাল করে দেখে নিই। থল পাহাড়ী শহর। রাত্রিবাসের জন্য বাসস্ট্যাণ্ডের উপর হোটেল আছে। যেখানে বসে চা পান করি সেটি একটি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীর দোকান। অবসরের পর হোটেল ও রেস্তোরাঁ বানিয়েছে। সুন্দর সাজানো হোটেল। লালাজীর নাম ঝড়ু টা পপা। এসব কুমায়ুনি নাম। ঝড়ুজীর সুন্দর ব্যবহারে আনন্দ পাই।

সেদিন দীপাবলী। কুমায়ূনে দীপাবলী কলকাতার দুর্গাপূজার সমান। রাস্তার উপর সুন্দর করে সাজানো কয়েকটি বাজির দোকান। বাজির দোকানে বেশ ভিড়। দীপাবলীর উৎসবে দূর দূরান্ত থেকে ছেলেরা ঘরে ফেরে। শীঘ্রই গাড়িতে যাত্রী বোঝাই হয়ে যায়। গাড়িও চলতে শুরু করে।

থল থেকে মুনস্যারী ৭০ কিমি। মার্শাল অথবা সুমোর ভাড়া ৭০ টাকা। ঠিক যেন গঙ্গোত্রীর পথে চলেছি। ডানহাতে রামগঙ্গার উচ্ছ্বাস, বাঁহাতে পাহাড়। জলের রঙ সবুজ। সবুজ বসন পরা রামগঙ্গা নাচের তালে ছুটে চলে। রাস্তা মোটামুটি চলনসই। আধঘণ্টা এসে গাড়ী দাঁড়ায়। মধ্যাহ্ন আহারের বিরতি। ঘড়িতে সাড়ে ১২টা। স্থানের নাম ক্বটি। উচ্চতা ১২৩০ মিটার।

ক্বটিকে শহর বলা যায় না। তবে STD Booth দেখতে পাই। আর আছে মদের দোকান। ২/১টি দোকান ও হোটেল। ড্রাইভার ও কিছুযাত্রী এখানেই আহার সেরে নেয়। আহারের পর গাড়ি আবার চলতে থাকে।

থল থেকে ৫ কিমি দূরে 'নাচ্‌নী'। নাচ্‌নী পাহাড়ী শহর। এখানে এসে সকল গাড়িকে Toll Tax দিতে হয়। সুন্দর সাজানো শহর। শহরের এক প্রান্তে খেলার মাঠ। কয়েকটি STD Booth দেখতে পাই। পথের পাশে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। সামান্য দাঁড়িয়ে গাড়ি ছাড়ে। আমাদের গাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। তবে মানুষ ধারণ করতে এরা অভ্যস্ত।

পথের ধারে মাইল স্টোনে লেখা দেখে দূরত্ব জানতে পারি। মুনস্যারী এখনও ১২ কিমি। পাগাল করা তুষারাঞ্চল পঞ্চচুলির রূপ দেখে আনন্দে নেচে

উঠি। আমাদের গাড়ি যত এগিয়ে যায় পঞ্চচুলি ততই নিকটে আসে।

আমাদের গাড়ি এসে এক মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়। কালীমন্দির। সকলেই মন্দির দর্শনে যায়। রাস্তার পাশে মাইল স্টোনে লেখা মুনস্যারী ১০ কিমি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এক সাধুবাবা। তিনি নিজেই সবকিছু দেখভাল করেন। মন্দির আঙ্গিনা থেকে পঞ্চচুলি অপূর্ব দেখায়। মন্দিরে প্রণাম করে সকলে গাড়িতে এসে বসি। মন্দিরের সামনে সাইন বোর্ডে লেখা উচ্চতা ২৭০০ মিটার।

আমাদের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলে। পথের পাশে লেখা মুনস্যারী ৮ কিমি। পাইনের বনে সাজানো পথ। দীর্ঘ আট কিমি উৎরাই পথে নেমে গাড়ি এসে বাজার এলাকায় এক দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ায়।

বাড়ির গায়ে লেখা 'পাণ্ডে লজ'। নতুন বাড়ি, লজও নতুন। বাড়ির মালিক হরগোবিন্দ পাণ্ডে ছুটে এসে তার লজ দেখার জন্য অনুরোধ করেন।

দোতলার দুখানি শয়ন কক্ষ দেখে পছন্দ হলেও একজনের পক্ষে মানানসই নয়। একতলার এক শয্যার ঘর একার পক্ষে ভালই। ভাড়াও চলন সই। এখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিই।

পূজালজের মালিক ইন্দোর সিংয়ের কথা পূর্বেই জেনে এসেছি। ওর সাথে দেখা করি। ওকেই মিলামের পথে সকল ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করি। আমার সকল ভাবনাই নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

বাসস্ট্যাণ্ডের উপর ধামী রেস্তোরাঁ। চমপা ধামীর হাতে চা পান করি। বেশ ভাল চা। তার হোটেলে ভাত, ডাল, সবজি সব কিছুই মেলে। আগে থেকে অর্ডার দিলে সবকিছুই পাওয়া যায়।

পাণ্ডে লজের পাশেই বাহাদুর সিংয়ের রেস্তোরাঁ ও হোটেল। স্বামী ও স্ত্রী দুজনের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হোটেল। রাতে বাহাদুর ঘরে খাবার দিয়ে যায়। আহারের পর ঘরে গরম দুধ দিতেও ভুল করে না। বাহাদুরের ব্যবহারের কোন তুলনা নেই।

মুনস্যারী এসে কয়েকজন বাঙালী ভ্রমণ বিলাসীর সাথে দেখা হয়। মিলামের যাত্রী শুনে সকলেই শুভেচ্ছা জানায়। পূজালজে মৌমিতার সাথে দেখা। সে তার বাবা ও মাকে সাথে নিয়ে হিমালয় ভ্রমণে মুনস্যারীতে এসেছে। মেঘমুক্ত

নীল আকাশের গায়ে পঞ্চচুলির সন্দর্শনে সে নিজেই আত্মহারা।

মিলামের কথা শুনে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সে পাহাড় ভালবাসে, ট্রেকিং পছন্দ করে। তাঁর পরিবেশ তাকে সুযোগ দেয় না। বাঙলার ঘরে অনেক মৌমিতা আছে, যাদের স্বপ্নের কোন বিকাশ ঘটে না।

আলমোড়া

ভাগ্যে না থাকলে কোন কিছুই হয় না। ভাগ্য ও চেষ্টা উভয়ের যৌথ উদ্যোগে সফলতা আসে। ভাগ্যে থাকলে হঠাৎই মনে ইচ্ছা জাগে। সেই ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে চাই চেষ্টা।

আলমোড়া আসার কথা আদৌ ভাবিনি। আলমোড়া সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কুমায়ুনের পথে আলমোড়াকে স্পর্শ করে যাতায়াত করেছি মাত্র। আলমোড়াতে রাত্রিবাস অথবা কাছে থেকে চেনা বা জানার ইচ্ছা কোন দিন মনে জাগেনি।

প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় অসমাপ্ত মিলাম করে মুনস্যারী ফিরেছি, বিকাল চারটে। পাহাড়ে উদ্দেশ্য সফল না হলে মনে বড়ই দুঃখ হয়। বাতাস, বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে হিমালয়ের দুয়ারে পৌঁছেও মিলামের দর্শন হয় না।

মিলাম না হওয়ায় অযাচিত ভাবে হাতে কয়েকদিন সময় এসে যায়। কোথায় যাই, কি করি, কিছুই ভেবে পাই না। আমরা যখন অসহায় হয়ে পড়ি তখন তাঁর উপরই ছেড়ে দিই। তিনিই ঠিক করে দেন নূতন পথ। মুনস্যারী বাস স্ট্যাণ্ডে হলদুয়ানীগামী একটি বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় হলদুয়ানী যাত্রা করে। আলমোড়া, রেবীনাজ, সেরাঘাট হয়ে ঐ বাসের গতি পথ।

বাসস্ট্যাণ্ডের পাশেই পাণ্ডে লজ। আমার অস্থায়ী আবাসন। ঘরে এসে ক্যাপ্টেনের কথা মনে পড়ে। ক্যাপ্টেন প্রায়শই আলমোড়া, রানীক্ষেত, কৌশানীর কথা বলে। সুতরাং এই সুযোগে আলমোড়া বেড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। সেই মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ২৮শে অক্টোবর সকাল সাড়ে ৬টা, মুনস্যারীকে বিদায় জানিয়ে আলমোড়ার পথে যাত্রা। বিকাল চারটে, আলমোড়া বাইপাসে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বাস চলে যায়। যেখানে নেমেছি সেখানে ২/৩ টি মিষ্টির দোকান। দোকানে শুধুই বলে মিঠাই। কোথায় গিয়ে উঠি বুঝতে পারি না। হোটেল, লজ, ধর্মশালা, মঠ-মন্দির, কিছুই জানা নেই। একটাই ভরসা যিনি এনেছেন তিনিই

পৌঁছে দেবেন তাঁর জায়গায়। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শুনেছি আলমোড়া স্বামীজীর স্মৃতি বিজড়িত। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নামে এখানে অনেক মঠ, মিশন আছে। এই ধারণাটুকু সম্বল করে আশ্রমের খোঁজ করি। আমার ধারণা আংশিক সত্য। আলমোড়ায় কোন মঠ, মিশন নেই, রামকৃষ্ণ ধাম ও রামকৃষ্ণ কুটির নামে দুটি সংস্থা আছে। দুটি সংস্থাই বহু প্রাচীন, স্থানীয় মানুষের পরিচিত।

বাস থেকে যেখানে নেমেছি সেখান থেকে রামকৃষ্ণ কুটির অনেকটাই দূরে, আনুমানিক ২/৩ কিমি, আলমোড়া "আকাশ বাণীর" সন্নিকটে। 'রামকৃষ্ণ ধাম' অপেক্ষাকৃত নিকটে। আশ্রয় মিলবে কিনা কেউ ঠিকমত বলতে পারে না। যেটা নিকটে সে দিকেই অগ্রসর হই। ঠাকুর মঙ্গলময়। তিনি তাঁর ভক্তকে ভালর দিকেই ঠেলে দেন।

বাইপাস থেকে চড়াই পথে সরুগলি গিয়েছে। উপরে বাজার। মালের বোঝা পিঠে নিয়ে ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই।

পথের দুপাশেই দোকান। রামকৃষ্ণ ধাম বহু প্রাচীন, এ অঞ্চলের অনেকের জানা। ১/২ কিমি পায়ে হাঁটা পথ। কিছুটা গিয়ে পথ দ্বিধা বিভক্ত। বাঁ-হাতি পথ ধরে এগিয়ে চলি। ৭/৮ মিঃ চলার পর রামকৃষ্ণ ধামের সাইন বোর্ড দেখতে পাই। গেটের কাছে সম্মুখে লেটার বক্স। বা-হাতে এস. টি. ডি-র বুথ, ও মনিহারি দোকান।

গেটের নিকট মালপত্র রেখে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামি। দোতলা, টিনের বাড়ি। একতলায় বাড়ির শেষ প্রান্তে গৈরিক ধারী এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পাই। সন্ন্যাসী উদ্যানে জল সিঞ্চনে মগ্ন। দ্বিতীয় কোন মনুষ্য প্রাণী দেখি না। নির্ভয়ে স্বামীজীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। স্বামীজী কোন প্রশ্নের অবতারণা না করেই বলেন - এসে যখন গিয়েছেন, এখানেই থাকবেন, মালপত্র নিয়ে আসুন।

বেশ প্রাচীন আমলের ঐতিহ্যপূর্ণ, অবহেলিত অতিথি শালায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। ঘরে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাঁধানো চিত্র, আলমারিতে সামান্য কিছু বই, কাঁচের জানালায় পর্দা, পর্দা সরাতেই হিমালয়ের শিখর চূড়া

দৃশ্যমান। ঘরে দুখানি চৌকি, একটিতে কম্বল একটিতে তোষক, টেবিল, চেয়ার, বিদ্যুতের আলো, সংলগ্ন স্নানাগার, শয়ন কক্ষে ও স্নানাগারে প্লাগ লাগিয়ে জল গরমের ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ব্যবহার না হলে যেমন দশা, ঠিক তেমনই। আজ আমি ঐ অতিথিশালার রাজা।

ধামের উদ্যানে ফল ও ফুলের বাগান। আশে পাশে কয়েকটি বাড়িতে ছাত্রাবাস। ধামের নীচের তলায় পর-পর তিনটি ঘরে অতিথিশালা । বিশাল ঘেরা বারান্দা। প্রথম ঘরে মন্দির, দ্বিতীয় তৃতীয় ঘরে স্বামীজীর থাকার ঘর ও স্টোররুম, পাশেই বৃহৎ রন্ধনশালা।

ধামের বর্তমান অধ্যক্ষ - স্বামী চিদানন্দ গিরি। স্বামীজীর মধুর ব্যবহারে মুহূর্তে আপন হয়ে যাই। ওদিকে পশ্চিমাকাশে সূর্যদেব পাটে বসে। পঞ্চচুলির গায়ে আবির ছড়িয়ে দিনের আলো নিভে যায়।

মন্দিরের বিগ্রহ পরম গুরু শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাঁধানো চিত্র । সম্মুখে ফুল, ও পূজার নানা উপকরণ। মেঝেতে কার্পেট পাতা। গৃহমধ্যে অধ্যাত্ম ভাব প্রশান্ত। মন্দিরে ক্ষণেক অবস্থানের পর দিনের সকল ক্লান্তির অবসান হয়।

ওদিকে স্বামীজীর ব্যস্ততার সীমা নেই। ঘরে অতিথি, আশ্রমের সকল কাজ নিজেকেই সামাল দিতে হয়।

স্বামীজীর ব্যস্ততা দেখে নিজেই লজ্জা পাই। নিজের হাতেই চা, রুটি, ঘুঘনি করেন । দুধ ভালবাসি আগেই জেনে গিয়েছেন, আহারের পর গরম দুধ— নিজের বাড়িতে যেমনটি ঠিক তেমনটি। স্বামীজীর ত্যাগ, সেবা ও নিষ্ঠা পরিমাপের ঊর্ধ্বে, তাঁর বিরাটত্ব ও মহত্ত্বের মূল্যায়ন করা আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। শিশুর মতন সরল মানুষটির সান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি।

যতদূর জানতে পেরেছি রামকৃষ্ণ ধামের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পরব্রহ্মানন্দ মহারাজ, যিনি অভয় মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। অভয় মহারাজ ছিলেন স্বামী শুভদানন্দজীর (খোকা মহারাজ) মন্ত্র শিষ্য।

অনাদিকাল থেকে আলমোড়া সাধু, মহাত্মা ও যোগীর সাধন ভজনের আদর্শ পীঠস্থান। এখানকার বাতাবরণ অধ্যাত্ম শক্তি, ভক্তি ও ভগবত কৃপালাভের

উপযোগী। তাই এ স্থানের আর এক নাম দেবভূমি। কথিত আছে একদা ভগবান বিষ্ণুরও বাসস্থান ছিল আলমোড়ায়। আলমোড়া শহরের চতুর্দিকে হিমালয়ের কয়েকটি গিরিশৃঙ্গ দেব-দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত।

কাশার দেবী, শেয়ার দেবী বানরী দেবী, মুক্তেশ্বর মহাদেব তাদের মধ্যে কয়েকটি।

পুরাণে কথিত আছে দেবী মহামায়া এক সময় কৌষিকী রূপ নিয়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্যকে শহরের উত্তরে কাশ্যপ পাহাড়ে বধ করেন। পরবর্তীকালে সেখানে পার্বতী ও শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দির আঙ্গিনা থেকে তুষার শুভ্র হিমালয় নয়নাভিরাম শৃঙ্গ দৃশ্যমান।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের 'সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থে দেখেছি —

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে মা কটাক্ষে হেরিয়ে।
অপার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রাখে উদরে পুরিয়ে।।
যে চরণে স্মরণ লয়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যার চরণে লুটায়ে।।
প্রসাদ বলে রণে চলে মা রণনয়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে।।

শহর থেকে ৮ কিমি দূরে গল্লু দেবতার মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে গল্লুদেব ছিলেন রাজপুত্র। তিনি তার অলৌকিক শক্তির জন্য দেবতায় রূপান্তরিত হন। তিনি সকলের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। যাঁদের অভীষ্ট পূরণ হয়েছে সকলে মন্দিরে ঘন্টা দান করেছেন।

শহরের ৩৪ কিমি দূরে জটা গঙ্গা নদীর তীরে জাগেশ্বর শিবের মন্দির। স্থানীয় লোকের কাছে তিনি বালক পীঠ নামে পরিচিত। বালকের নিকটে বৃদ্ধের আবির্ভাব।

পাশের মন্দিরে মহামৃত্যুঞ্জয় শিব যিনি বুড়ো শিব নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের ধারণা ইনি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ছাড়াও প্রকৃতি ও পর্যটকের নিকট আলমোড়ার গুরুত্ব অনেক। মহাতীর্থ পবিত্র কৈলাস ও মানস সরোবরের পথে আলমোড়া দ্বাররক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ সেই অনন্ত কাল থেকে। গ্রীষ্মকালে তীর্থ যাত্রার মানসে অসংখ্য তীর্থ যাত্রী ভক্ত, সাধু ও পর্যটক আসেন আলমোড়ায়। সে যুগে তীর্থ যাত্রীর সেবা ও দুর্গম পথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের উদ্দেশ্য নিয়ে স্বামী পরব্রহ্মানন্দ মহারাজ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন।

২৯শে অক্টোবর সকাল থেকেই স্বামীজীর সান্নিধ্যে কাটাই। মধ্যাহ্ন আহারের পর আলমোড়া পরিভ্রমণে যাই।

ধাম থেকে বেরিয়ে ডান হাতে সামান্য এগিয়ে বাঁ-হাতে চড়াই পথ ধরে এগিয়ে যাই। ঐ পথ গিয়ে মিশেছে জহুরী বাজারে। জহুরী বাজার পেরিয়ে মেন বাজার। মেন বাজার শেষ করে ম্যাল রোড ও বাসস্ট্যাণ্ড। মেন বাজারের কেন্দ্রস্থলে রঘুনাথ মন্দির। মন্দিরের দেবতা রাম, ও লক্ষ্মণ সযত্নে রক্ষিত। নৃত্য ও আরতির ব্যবস্থা দেখে ভাল লাগে। জহুরী বাজার দেখে কলকাতা বহুবাজারের কথা মনে পড়ে। পথের দুধারে শুধুই সোনা রূপার দোকান। বহুকাল পূর্বে তিব্বত থেকে সস্তায় প্রচুর সোনা রূপা আমদানি হত। সোনা রূপার আন্তর্জাতিক বাজার ছিল আলমোড়ায়। ম্যাল রোডে অনেক হোটেল, দোকান ও লজ দেখতে পাই। পূর্বেই রামকৃষ্ণ কুটিরের কথা বলেছি। সেই রামকৃষ্ণ কুটির দেখার আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আলমোড়ায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রামকৃষ্ণ, স্বামীজী ও নিবেদিতার নামে দেখতে পাই। এসব দেখে স্বামীজীর প্রতি স্থানীয় মানুষের শ্রদ্ধার প্রমাণ পাই। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ডান হাতে আকাশবাণীর দেখা পাই। আকাশবাণী পেরিয়ে বাঁ-হাতে সাইনবোর্ডে লেখা Bright End Corner ডান হাতে সাইন বোর্ডে লেখা Ramkrishna Kutir.

পাহাড়ের গায়ে সান বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাই। নীচে নেমে প্রথমেই যে ঘরটি নজরে আসে সেটির গায়ে লেখা Turiananda Library & free Reading Room. নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ। কিছু জিজ্ঞাসা করার মত লোক দেখি না। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। সকল ঘরের দরজা বন্ধ। মনে মনে ভাবি বিশ্রামের সময়। যতদুর সান বাঁধানো চলেছে আমিও এগিয়ে যাই। অবশেষে 'অফিস কার্যালয়' দেখতে পাই। Working Hours 9 a.m.-12 noon & 3p.m.-6

p.m. পাশেই মন্দির। আমার ঘড়িতে তখন সোয়া দুটো। সুতরাং ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আরও এগিয়ে যাই সম্মুখে ডাইনিং হল। চারিদিকে কাঁচের জানলা। চেয়ার ও টেবিল সাজানো । দোতলায় হয়তো অতিথি ভবন। ডান হাতে রন্ধনশালা। পরিবেশ দেখে মনে হয় এ কুটির সাধারণের জন্য নয়। গতকাল এখানে এলে অবশ্যই ফিরে যেতে হত। অবশেষে হতাশ মন নিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই। পাহাড়ের গা বেয়ে উত্তরে যাত্রার পথ নেই। একটি কুটিরের সম্মুখে গিয়ে শেষ হয়। ঘড়িতে পৌনে তিনটে। এক মহারাজের সাক্ষাৎ পাই। স্বামী গঙ্গাধর মহারাজ। শিশুর মত সরল মন নিয়ে কথা বলেন। স্বামীজীর সাথে কথা বলে খুবই আনন্দ পাই। মহারাজ Turiananda Libraryর Change এ আছেন। ফেরার পথে Library পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানান। নীচে এসে রামকৃষ্ণ কুটিরের বর্তমান President-Chinmoyanand মহারাজের দেখা পাই।

স্বামীজীর সাথে কথা বলে জানতে পারি Ramkrishna Kutir সাধারণের জন্য নয়। স্বামীজীরা এখানে আসেন সাধন ভজন ও নির্জন বাসের মন নিয়ে। মিশনের ভক্ত ও সন্ন্যাসীরাই এখানে থাকার যোগ্য। অধ্যক্ষ মহারাজ বিদেশী সন্ন্যাসী। বাণপ্রস্থ জীবনে কুটিরের অধ্যক্ষ রয়েছেন।

ফেরার পথে লাইব্রেরীতে গঙ্গাধর মহারাজের সাথে পুনরায় দেখা হয়। তার মুখে আশ্রম বিষয়ে কিছুটা জানতে পারি।

পূর্বেই বলেছি আলমোড়া অধ্যাত্ম সাধনার পীঠস্থান। একান্ত ও নির্জন বাসের আদর্শ বাতাবরণ। শুচিশুভ্র তুষার হিমালয়ের প্রভাবে প্রশান্ত। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে তাপ মাত্রা ৪.৪ থেকে ২৯.৪ সেলসিয়াস কমে ও বাড়ে। গড় বৃষ্টিপাত ৩৭"। স্বাস্থ্যকর। নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচুলি ইত্যাদি তুষারশৃঙ্গ আলমোড়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দৃশ্যমান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৩ ও ১৯৩৭ সালে আলমোড়ায় আসেন। তাঁর 'শিশু' 'ছড়া ছবি' ইত্যাদি কাব্য কবিতা আলমোড়ায় বসে লিখেছেন।

আলমোড়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম স্বপ্ন দেখেন স্বামী বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দ মহারাজ স্বামাজীর স্বপ্ন সফল করেন। দীর্ঘ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটিরের শুভ উদ্বোধন হয় ২২ মে ১৯১৬ সালে। প্রথম

প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ।

১৯৮৬ সালে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেব দেহান্তর প্রাপ্ত হন। ঠাকুরের অবর্তমানে তাঁর অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যগণ নির্জন সাধনা ও সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় হিমালয়ের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। ঠিক এই সময়ে ঠাকুরের বেশ কয়েকজন মন্ত্র শিষ্য আলমোড়া পরিদর্শন করেন।

ঠাকুরের দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে স্বামী অখন্ডনানন্দ (গঙ্গাধর) প্রথম হিমালয় ও তিব্বতের নানা প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন। তিনিই আলমোড়ায় অধ্যাত্ম স্বাদ অনুভব করেন। তিনি তার উপলব্ধি তাঁর গুরু ভাইদের মনে সংক্রামিত করেন। সেই বার্তা পেয়ে একে একে স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামীজী সেবানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ইত্যাদি তরুণ সাধক সন্ন্যাসিগণ আলমোড়ার নানা প্রান্তে সাধনার আসন পাতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তিনবার (১৮৯০, ১৮৯৭, ১৯০৪) সালে আলমোড়া আসেন। স্বামীজী প্রথম অর্থাৎ ১৮৯০ সালে অখন্ডনানন্দকে সাথে নিয়ে কয়েকটি স্থানে হাজির হন। শতাব্দী প্রাচীন হিমালয়ের গায়ে তখনও প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। বাস রাস্তার কোন চিহ্ন নেই। দণ্ড -কমণ্ডুলু ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল করে দুই সাধক সন্ন্যাসী হাঁটা পথে নৈনিতাল উপস্থিত হন।

দুই একদিন বিশ্রামের পর আবার হাঁটা শুরু। স্বামীজী প্রায়শই পাকদণ্ডি ও জঙ্গলের পথ দিয়ে হাঁটেন। তৃতীয় দিন আলমোড়ার পথে রাত্রি বাসের জন্য এক মনোরম স্থান দেখতে পান। পথের পাশে কৌশিকী নদী। অসংখ্য ছোট বড় উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী। অপর দিক থেকে ছুটে আসা 'সরোতা নদী' কৌশিকীকে আলিঙ্গন করে। মাঝখানে ত্রিকোণাকৃতি ভূখণ্ড ক্রমশ উচুঁ হয়। তার বুকে পিপুল বৃক্ষ। স্বামীজী চিৎকার করে বলেন কি অপূর্ব ধ্যানের জায়গা! স্বামাজী কৌশিকীতে স্নান করে ঐ বৃক্ষের নীচে ধ্যানে বসেন। মুহূর্তে স্বামীজীর দেহ নিস্পন্দ হয়ে যায়। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গে। এই স্থানটি আলমোড়া থেকে ২৩ কিমি দূরে। কাঁকড়িঘাট।

চলার পথে আলমোড়া থেকে ৩ কিমি দূরে স্বামীজী পথশ্রম ও ক্ষুধায়

কাতর হন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী কিছু খাবারের খোঁজ করেন। নিকটস্থ কবর স্থানের পাশে তিনি এক মুসলমান ফকিরের কুটির দেখতে পান। ফকিরের নিকট একটি শসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফকির নিজের ঐ শসাটি নিয়ে ছুটে আসেন। স্বামীজীর নিকট এসে তিনি বলেন - তিনি মুসলমান। স্বামীজী বলেন তাতে কি? আমরা সকলেই ভাই। ঐ শসা খেয়ে স্বামীজী আবার চলার শক্তি ফিরে পান। আলমোড়ায় পৌঁছে স্বামীজী লালা বদ্রীশার বাড়িতে ওঠেন। অখন্ডনানন্দজীর সাথে লালাজীর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। স্বামীজীর আগমনের বার্তা পূর্বেই তিনি লালাজীকে দিয়ে রেখেছিলেন।

আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামীজী ১৮৯৭ সালে পুনরায় আলমোড়া আসেন। এবারে তিনি তিন মাস আলমোড়ায় কাটান। এই সময়ে তিনি আলমোড়া বাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি আলমোড়ায় আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিভাবে যাবেন আলমোড়া ঃ-

হাওড়া থেকে বাঘ এক্সপ্রেসে চেপে তৃতীয় দিনে হলদুয়ানী এসে নামুন। স্টেশন থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে বাস স্টেশন। হলদুয়ানী থেকে আলমোড়া ৭২ কিমি। জীপ ভাড়া ৭০ টাকা, বাস ভাড়া ৬০ টাকা। আলমোড়া থেকে দিল্লী (৩৮০ কিমি), পিথোরাগড় (১২২ কিমি), নৈনিতাল ৬৬ কিমি।

কোথায় থাকবেন ঃ-

আলমোড়া থাকার খরচ সামান্য বেশী। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে ম্যাল রোডে অনেক হোটেল পাবেন। নিজে গিয়ে দেখে হোটেল ঠিক করবেন।

কি কি দেখবেন ঃ-

কাঁশার দেবী মন্দির। শহরের উত্তরে কাশ্যপ পাহাড়। কথিত আছে এই পাহাড়ে মা পার্বতী কৌশিকী রূপ ধারণ করে শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দুই দৈত্যকে বধ করেছিলেন। কাশ্যপ পাহাড় থেকে হিমালয়ের অনেক তুষারময় শৃঙ্গ দেখা যায়। গল্লু দেবতা স্থানীয় মানুষের নিকট খুবই জাগ্রত। বিনসারে তুষার শুভ্র গিরি শৃঙ্গ সমূহ দৃশ্যমান। ত্রিশূল, নন্দাদেবী, চৌখাম্বা এবং শিবলিঙ্ হাতের মুঠোয়। এছাড়া আলমোড়া থেকে নৈনিতাল রানিক্ষেত কৌশানি বেড়িয়ে নিতে পারেন। পিথোরাগড় জেলায় মুনস্যারী বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

মিলামের পথে

গাড়োয়াল থেকে কুমায়ুন। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনবাসীর মনের কথা — মা নন্দাদেবীর শ্বশুরালয় ত্রিশূলী পাহাড়ে। ত্রিশূলীর ছত্র ছায়ায় পালিত গোয়ালদাম। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের প্রবেশদ্বার গোয়ালদাম। ত্রিশূলীর সান্নিধ্যে গোয়ালদামের বুকে মাথা রেখে ঘুমোতে আমার বড় সাধ। মিলামের স্বপ্ন বুকে নিয়ে গতকাল গোয়ালদামে এসে রাত কাটাই।

দ্রুতগতি মন ছুটে যায় মুহূর্তে। অন্তরে মিলামের স্বপ্ন। মনের পাখা থাকলে সেও দেহটাকে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসে পড়ত মিলাম হিমবাহের শিখর চূড়ায়। স্বপ্নে সত্য হলেও বাস্তবে দূরত্ব অনেক, পথের ব্যবধানে সময় সাপেক্ষ। প্রথম দিন ঋষিকেশ থেকে গোয়ালদাম, দ্বিতীয় দিন গোয়ালদাম থেকে মুনস্যারী।

২৪শে অক্টোবর, গোয়ালদাম। খেলাপ সিংয়ের গেষ্ট হাউসে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। রাতের অন্ধকারে বিষণ সিং ঘরে চা দিয়ে যায়। ত্রিশূলীলজের প্রবেশ দ্বারে বিষণের ছোট্ট চায়ের দোকান। একমাত্র ঐ দোকানটুকু সম্বল করে জীবন সংগ্রামের লড়াই করে চলেছে। তার ভালবাসার মূল্য অর্থ দিয়ে মাপা যায় না।

ঘুম থেকে জেগেই তৈরি হয়ে নিই। নূতন সংগ্রামে যাত্রা। মিলামের পথে মুনস্যারী। ঘুম থেকে যিনি ডেকে দেন তিনিই উৎসাহ যোগান, তিনিই সঙ্গে চলেন। অথচ তাঁকে দেখতে পাইনা। সঙ্গে কেউ না থাকলে ঠিক ঠিক সময় মত কাজগুলি হয় কি করে?

ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা। বাসের লোক এসে দরজায় ধাক্কা দেয়। গোয়ালদামকে বিদায় জানিয়ে বাসে গিয়ে বসি।

গতকাল গোয়ালদামে এসেই বাসের খবর নিই। প্রতিদিন ভোর পাঁচটার গোয়ালদাম থেকে পিথোরাগড়ের বাস ছেড়ে যায়। ঐ গাড়ি 'থল' হয়ে যায়। 'থলে' গাড়ি বদল করে জীপে বা টাটাসুমোয় মুনস্যারী। মুনস্যারী মিলামের বেস ক্যাম্প। মুনস্যারী থেকে বাস পথ আরও ১১ কিমি এগিয়ে গেছে। সে পথে এখন বাস চলে না, জীপ চলে।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়ে। ভোরের অন্ধকার তখনও কাটেনি। গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে ড্রাইভার গাড়ি চালায়। পাইনের অরণ্য শোভিত পথ। মন্থর গতিতে গাড়ি চলে। ভোরের আলো আঁধারে নিদ্রালু প্রকৃতির নিরাভরণ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

নূতন পথ, নূতন প্রকৃতি, নূতন জগত। নূতনের আহ্বানে হৃদয়-মনে অভিনবত্বের আস্বাদ অনুভব করি। দেখতে দেখতে গাড়ি গরুড় এসে দাঁড়ায়। গরুড় কুমায়ুনের যোগাযোগের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। গরুড় ভ্যালীর আয়তন সুবিশাল। গরুড় থেকে গাড়োয়ালের ও কুমায়ুনের দিকে দিকে বাস, ট্যাক্সি ও জীপ মেলে। সাজানো শহর। দোকান, বাজার, হোটেল, লজ সবকিছুই আছে গরুড়ে। ড্রাইভার চা-পানের বিরতি ঘোষণা করে। ঘড়িতে পৌনে ছ'টা।

গোমতীর তীরে গরুড়। ভোরের গরুড় তখনও ঘুমিয়ে আছে। দোকান পাট খোলেনি। একটিও চায়ের দোকান দেখতে পাই না। সুতরাং চা-পানের কোন প্রশ্নই আসে না। ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ে।

গরুড় ভ্যালীতে গাড়ি ছোটে। পিচ ঢালা পথের উভয় পার্শ্বে শুধুই ধান ক্ষেত। পাহাড়ের কোন চিহ্ন নেই। দেখতে দেখতে বৈজনাথ এসে যায়।

বাঁ হাতে গোয়ালদামের পথ, গোমতীর বুকে লোহার সেতু পেরিয়ে ডানহাতে বৈজনাথ মন্দির। বৈজনাথ থানা, ও GMGN টুরিষ্ট লজ। দূর পাল্লার গাড়ি যাত্রী না থাকলে দাঁড়ানোর অবকাশ নেই। আমাদের গাড়ি এসে বাগেশ্বরে দাঁড়ায়। ঘড়িতে সোয়া সাত'টা। অতি অল্পক্ষণের বিরতি।

বাগেশ্বর পূর্ব পরিচিত। পিণ্ডারীর পথে বাগেশ্বর এসে দুরাত্রি কাটাই। গোমতী ও সরযূর সঙ্গমে বাগেশ্বরের অবস্থিতি। সঙ্গমে বাঘনাথ শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। একদিকে পার্বতী মন্দির অপর দিকে শিব মন্দির। বাগেশ্বর এখন জেলা শহর। আমাদের গাড়ি এখন যাত্রীর ভিড়ে ঠাসা।

বাগেশ্বরের পর থেকে পথের সৌন্দর্য অসাধারণ। সুউচ্চ পাইন বৃক্ষগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে দণ্ডায়মান। এই বৃক্ষগুলি থেকে নিয়মিত ভাবে 'টারপিন তেল'' সংগ্রহ এখানকার মানুষের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন।

সুপ্রশস্ত সুমসৃণ রাজপথ। গাড়ির গতিও বেড়েছে অনেক। কুমায়ুনের

পথ ঘাট বিপদ সঙ্কুল নয়। কুমায়ুন-প্রকৃতি অনেক বেশী প্রাণবন্ত, রূপসী, মনোহারিণী। তার সান্নিধ্যে দেহ মনে নেশা লাগে। গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলে। গাড়িতে বসে দুচোখ ভরে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি। মাঝে মাঝে চা-পানের ইচ্ছায় কাতর হই। সেই সকালে গোয়ালদাম ছেড়েছি, এখন পর্যন্ত চা-পানের সুযোগ হয়নি। ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর উভয়ই সময়ের সাথে তাল রেখে চলে।

আমার সহযাত্রী অর্থাৎ আমার পাশের সিটে এক সুদর্শন যুবক শঙ্কর রাউথ। সকাল থেকে অনেকটাই আলাপ হয়েছে। শ্রীনগর পলিটেকনিকের ছাত্র। দীপাবলীতে বাবা মায়ের কাছে যাচ্ছে। দেশের বাড়ি পিথোরাগড় জেলার 'জল জিবিতে'। ও কেও থলে গাড়ি বদল করে যেতে হবে।

ইতোমধ্যে সময় অনেকটাই কেটেছে। গাড়োয়ালের পথ ঘাট দেখে অভ্যস্ত। গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে নিই। সামনেই মুনস্যারীগামী টাটা সুমো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। গাড়িতে একজন মাত্র যাত্রী। আমিও গাড়িতে মালপত্র তুলে দিই। গাড়ি ছাড়তে অনেক দেরী। গাড়ি ভর্তি না হলে ছাড়ে না, এই সুযোগে আমিও চা-পান করি। থল থেকে মুনস্যারী ৭৪ কিমি, ভাড়া ৭০ টাকা। এ পথে বাসও মেলে বাসের ভাড়া ৫০ টাকা।

ছোট শহর। রাস্তার উপর হোটেল, রেস্তোঁরা মনিহারী দোকান। দীপাবলী উপলক্ষ্যে রাস্তার উপর বাজির দোকান বসেছে। এদের দীপাবলী আমাদের দুর্গাপুজার বিকল্প। বাজির দোকানে বেশ ভিড়। সকলেই বাজি কিনে বাড়ি ফেরে। বাসে জীপে পথে ঘাটে সর্বত্রই ভিড়। দীপাবলীতে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে। দীপাবলীতে কেউই কাজে যেতে চায় না। মনে মনে ভাবি আগামীকাল পোর্টার পেতে অসুবিধা হতে পারে।

ইতোমধ্যে গাড়ি ভরে যায়। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে, ঘড়িতে ঠিক ১২টা। সুন্দর পিচ্ ঢালা পথে গাড়ি ছোটে। ঠিক যেন গঙ্গোত্রীর পথ। ডানহাতে রামগঙ্গা, বাঁহাতে পাহাড়। রামগঙ্গার জল গাঢ় সবুজ। সবুজের শাড়ি পরা রামগঙ্গা নাচতে নাচতে চলেছে। নাচনী এসে গাড়ি দাঁড়ায়। থল থেকে মাত্র ৫ কিমি। এখানে এসে সব গাড়িকেই 'টোল ট্যাক্স' দিতে হয়। নাচ্‌নী সুন্দর সাজানো শহর। পাশেই

সুন্দর খেলার মাঠ, কয়েকটি STD Booth দেখতে পাই। Telephone Exchange এর সাইনবোর্ড লক্ষ করি। অল্পক্ষণের বিরতি। গাড়ি আবার চলতে থাকে।

পথের পাশে মাইলস্টোন দেখে পথের দূরত্ব বুঝতে পারি। মুনস্যারী এখনও ১২ কিমি। তুষারশুভ্র পঞ্চচুলির ধ্যানময় পাঁচ মূর্তি দেখে আনন্দে নেচে উঠি। আমাদের জীপ যত এগিয়ে যায় দূরত্ব ততই কমে আসে। পঞ্চচুলি মুনস্যারীর প্রধান আকর্ষণ।

মুস্যারী এখনও ১০ কিমি। আমাদের জীপ এসে এক মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়। পাশেই একটি চায়ের দোকান। দোকানের জলে হাত ধুয়ে মন্দিরে যাই। মন্দিরের বিগ্রহ কালীমূর্তি। এক সাধুবাবার প্রতিষ্ঠিত মন্দির। সাধুবাবা নিজেই মন্দিরের পূজা ও আরতি করেন। পাশেই সাধুবাবার শয়ন কক্ষ। সেখানেও কালীমূর্তি। বাবা সকলের হাতেই প্রসাদ দেন। মন্দির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে পঞ্চচুলিকে ছবির মত দেখায়। মন্দিরের সামনে সাইন বোর্ডে লেখা উচ্চতা ২৭০০ মিটার। মন্দির দর্শন করে সকলেই গাড়িতে এসে বসি। ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে।

আমাদের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলে। মাইল স্টোনে লেখা মুনস্যারী ৮ কিমি। উৎরাই পথে ২১৩৫ মিঃ উচ্চতায় নেমে আসি।

মুনস্যারী বাস স্টেশনে প্রবেশের মুখে পাণ্ডে লজ। পাণ্ডেলজের মালিক হরিগোবিন্দ পাণ্ডের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গাড়ি দাঁড়ায়। হরিগোবিন্দবাবু তাঁর লজটি একবার দেখে যেতে অনুরোধ করেন। দোতলার ৭নং ও ৮ নং ঘর দুটি এক নজরেই পছন্দ হয়। তার দক্ষিণা একা থাকার পক্ষে মোটেই মানানসই নয়। ঐ ঘরের ভাড়া ৩৫০ টাকার নীচে নামতে মোটেই রাজি নন। এক তলার এক শয্যার শয়ন কক্ষটি একা থাকার পক্ষে ভালই। ওখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিই। দক্ষিণা ৫০ টাকা। পাশেই বাহাদুরের রেস্তোরাঁ। সেখানে চা, দুধ, ভাত, রুটি সব্জি সব মেলে। সাথে বাহাদুরের মিষ্টি ব্যবহার।

এদিকে মুনস্যারীর ইন্দোর সিংয়ের কথা যাত্রার পূর্বেই শুনেছি। ইন্দোর পূজালজের মালিক। বাঙালী পর্যটক মুনস্যারী এসে পূজা লজেই আশ্রয় নেয়। মিলাম যাত্রীর জন্য পোর্টার, গাইড রেশন সব কিছুই সে ব্যবস্থা করে।

পাণ্ডে লজে ঘর নিলেও পূজা লজে গিয়ে ইন্দোরের সাথে দেখা করি। সেই সুযোগে পূজালজের ব্যবস্থাও দেখে নিই। ইন্দোর সিং কে আগামী কাল মিলাম যাত্রার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করি। ইন্দোর সকল সহযোগিতার আশ্বাস

দেয়।

মুনস্যারী এসে সবচেয়ে বড় কাজ জুতা সেলাই। একই সিজিনে পর পর ২/৩টি ট্রেকিং এর পর জুতার অবস্থা খুবই খারাপ। মুনস্যারী বাজারে ৪০ টাকা দিয়ে দুটো জুতোই সেলাই করে নিই।

মুনস্যারীর আয়তন মোটেই ছোট নয়। সুপ্রশস্ত আঙ্গিনায় বাস স্টেশন। পূজালজের সামনে দিয়ে উৎরাই পথে বাজার এলাকা। পরপর কয়েকটি সবজির দোকান, দোকান দেখে ভাল লাগে।

আজ খেলাপ সিংয়ের বন্ধু জগত সিং মার্তোলীর সাথেও দেখা হয়। জগত চা-পানে আপ্যায়ন করে। জগত মুনস্যারীতে লজ বানিয়েছে: মিলাম থেকে ফিরে ওখানেই থাকার জন্য অনুরোধ করে। ইন্দোর জগত দুই বন্ধু।

সন্ধ্যার পর ইন্দোর পোর্টার নিয়ে ঘরে আসে। আগামী কাল দীপাবলী, কেউ যেতে রাজি নয়। সুতরাং ইন্দোর যাকে এনেছে তাকে বাতিল করার কোন প্রশ্নই আসে না। পোর্টারের নাম ফকিরা সিং, ইন্দোরের আত্মীয়। কথা বার্তা ভাল, হাসি খুশি, মাঝারি বয়স। প্রতিদিন ১৫০ টাকা ওর দক্ষিণা। থাঁকার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। আগামী সকালে ঠিক সময়ে আসবে বলে চলে যায়।

মুনস্যারীর জলবায়ু অতি চমৎকার। বাহাদুর সিং রাতে ঘরেই খাবার দিয়ে যায়। খাবারের পর ঘরেই গরম দুধ পরিবেশন করে।

মুনস্যারী - লিলাম

২৫শে অক্টোবর, দীপাবলী। মুনস্যারী পাণ্ডে লজ। মিলাম যাত্রার আনন্দে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরি হয়ে নিই। বাহাদুরকে চা দিতে বলি। বাহাদুর ঘরেই চা দিয়ে যায়।

মিলামের পথে কিছুই মিলবে না। প্রয়োজনীয় শুকনা খাবার ও রেশনপত্র মুনস্যারী থেকেই সংগ্রহ করে নিই। যথা সময়ে মিলামের সাথী ফকিরা এসে যায়। ফকিরার গরম পোষাক আমার স্যাকে পুরে স্যাক বেঁধে দিই। হরগোবিন্দবাবুও ইন্দোর সিং এসে শুভেচ্ছা জানায়।

সকাল সাড়ে আটটা। ধামী রেস্তোরাঁয় গিয়ে ফকিরাকে প্রাতরাশ করিয়ে নিই। যাত্রাকালে বাহাদুর একটি 'Rotomac' উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। বাহাদুরের দোকানে বেলুড় থেকে আগত মিঃ ভাস্কর ও অরুণা মুখার্জীর সাথে দেখা। সকলের শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে পঞ্চচুলিকে প্রণাম জানিয়ে মিলামের পথে পা বাড়াই। ওঁ নমঃ শিবায়।।

বাসস্ট্যাণ্ড ও ধামী রেস্তোরাঁকে ডানহাতে রেখে পূজালজের সামনে দিয়ে উৎরাই পথে মুনস্যারী জীপ স্ট্যাণ্ডে চলে আসি।

আজ দীপাবলী। কুমায়ুনে জরুরী কাজ ছাড়া দীপাবলীর দিন কেহ্ই বাইরে যায় না। জীপ স্ট্যাণ্ডে ২/৩টি জীপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। যাওয়ার ইচ্ছা কেউ প্রকাশ করে না। ফকিরা একটা ম্যাটাডোর ভ্যানে মালপত্র তুলে দেয়। আজ জীপের বদলে ম্যাটাডোর ভ্যান।

গাড়িতে মোট ৭/৮ জন যাত্রী। ড্রাইভারের পাশের সিট মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে দুইজন মহিলা যাত্রী। আমাদের গন্তব্য মুনস্যারী থেকে সেলাপানি, ১১ কিমি পথ জীপে। সেলাপানি থেকে ট্রেকিং শুরু।

ম্যাটাডোর ভ্যানে আমার সহযাত্রী দেবেন সিং, মিলামের বাসিন্দা। উত্তরকাশী Co-operative Bank এ কর্মরত। দীপাবলীর ছুটিতে বাড়ি ফিরছে। ড্রাইভার আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গাড়ি ছাড়ে।

গৌরী গঙ্গাকে ডান হাতে নিয়েগাড়ি ছোটে। ৫ কিমি পথ অতিক্রম করে ডারকোটে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। রাস্তার উপর ২/১টি পাকা দোতলা বাড়ি। বাড়ির নীচতলায় দোকান। একটিতে কেরোসিন তেলের দোকান দেখি। মাংসের দোকানে বেশ বিড় লক্ষ করি। পূর্বেই বলেছি আজ দীপাবলী। উৎসবের দিনে মাংস কেনার ঝোঁক সর্বত্রই। তবে এখানে ভেড়ার মাংস ছাড়া অন্য মাংস চলে না।

ডারকোটে অল্পক্ষণের বিরতি। ২/১ জন যাত্রীর ওঠানামা শেষ, গাড়ি আবার চলতে থাকে। পথের চেহারা মোটেই ভাল নয়। পিচ্ ঢালা পথে পিচের কোন চিহ্ন নেই। ধূলো উড়িয়ে ভ্যান চলে। পথের দুধারের অরণ্যশোভা মন্দ নয়। দেখতে দেখতে ৬ কিমি পথ শেষ হয়। ঘড়িতে ১০-২০ মিঃ; ভ্যান এসে সেলাপানি দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে নিই।

পথের পাশেই চায়ের দোকান। দোকানের সামনে চারখানি চেয়ার। মিষ্টি রোদে চেয়ারে বসি। ফকিরা ইতোমধ্যে চায়ের অর্ডার দিয়েছে। আমাদের সহযাত্রীরা সকলেই নেমে পড়ে। গাড়ি চলা এখানেই শেষ।;

গাড়িতে যাদের সাথে আলাপ হয়নি সেলাপানিতে নেমে তাদের অনেককে কাছে পাই। লীলামের মেয়ে গীতা, ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। মা ও দুই ভাইকে নিয়ে দেশের বাড়ি চলেছে। নয়ন সিং চা-এনে হাতে দেয়। বেশ ভাল চা-বানিয়েছে। চা-পান করে পথে নামি, বেলা সাড়ে ১০টা।

নয়নের দোকানের সামনে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উৎরাই পথে নেমে যাই। পাকদণ্ডির পথে জীপ রাস্তায় নেমে আসি। ডানহাতে গৌরী গঙ্গার দর্শন পাই। সেলাপানি থেকে রমেশ সিং দুই ঘোড়া নিয়ে গ্রামে চলেছে। রমেশের সাথে কথা বলে আনন্দ পাই। মিলামের পথে মালপত্র পরিবহনের জন্য ঘোড়ার চলন বেশী। ঘোড়া ৫০০ টাকায় মিলাম পৌঁছে দেয়। রমেশ সিং সোজা পথে গ্রামে চলে যায়। ফকিরা ডানহাতি লিলামের পথে গৌরী গঙ্গার তীরে নেমে যায়। এ পথে ফকিরাই আমার গাইড, পোর্টার ও বন্ধু। তার পথই আমার পথ।

পথের চেহারা অতি চমৎকার। ডানহাতে গোরিগঙ্গার প্রাণ মাতানো উচ্ছ্বাস, বাঁহাতে পাহাড়, জঙ্গল ও বসতি। মনে হয যেন গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যে এক ঘন্টা সময় পেরিয়ে গেছে। ঐ যে গ্রামের চেহারা দেখতে পাই। পথের পাশে ডানহাতে বন্ধ চায়ের দোকান দেখি —, ফকিরা পিঠের বোঝা নামায়। গ্রামের নাম 'তল্লাডুমুর' সামনের বাড়িতে সাইন বোর্ডে লেখা Public Telephone Booth.

আজ দীপাবলী, কারুর ব্যবসায়ে মন নেই। সুতরাং গ্রামের দোকানে চা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ফকিরা মাঝে মাঝে শোনায় আজ লিলাম গিয়ে সে 'সোরাব' খাবে, 'ডিম' খাবে। ফকিরা অতি সহজ ও সরল প্রকৃতির। আজ সকালে মুনস্যারীতে ওর ৭ম শ্রেণীতে পড়া ছেলে এসে ওকে বিদায় জানায়। ফকিরার বড় সাধ — ছেলেকে সে বড় করবে। ইতিমধ্যে সে আমাকে পিতার আসনে বসিয়ে 'বাবা' বলতে শুরু করেছে।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। পাহাড়ি গ্রামের পথ, পাথর

দিয়ে বাঁধানো। আজকাল অধিকাংশ গ্রামেই বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। ফকিরা তুল্লাডুমুরে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দেখায়। গঙ্গার তীরে কর্মচারীগণের সরকারী আবাসন। এখান থেকেই মুস্যারী ও আশপাশের গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়।

বাঁহাতে পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসা এক জলপ্রপাত। স্রোতস্বিনীর বুকে কাঠের সেতু। সেতু পেরিয়ে আর একটি গ্রামের দেখা পাই — 'সুঁড়িনঘাট'। অল্প কয়েকটি পরিবারের বাস।

সুঁড়িনঘাটের পর থেকে রাস্তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। আর বাঁধানো রাস্তা নেই। গোরীগঙ্গার তীরে নেমে এসেছি। পথের কোন চিহ্ন নেই, ল্যাণ্ড স্লাইডে রাস্তা ভেঙ্গে নীচে নেমেছে। অনেকটা পথে ধস্। প্রাণান্তকর না হলেও বেশ দুর্গম। প্রায় কুড়ি মিনিট এই দুর্গম পথে চলি। দুর্গমতা অতিক্রম করে আবার সুন্দর পথের দেখা পাই। এ পথ সমতল, উপলখণ্ডে বাঁধানো, অপেক্ষাকৃত মসৃণ।

সুন্দর পথে এগিয়ে চলেছি। ডানহাতে গোরীগঙ্গার উচ্ছ্বাস। আমরা গোরীগঙ্গার উজান বেয়ে চলেছি। গোরীগঙ্গার উৎস মিলাম গ্লেসিয়ার। আজ ফকিরার চলায় মন নেই। ওর কাছে সরাব নেই। প্রতি গ্রামেই ও সরাবের (whisky) খোঁজ করে।

ঘড়িতে ১২-৩০ মিঃ। সুন্দর এক পাহাড়ি গ্রাম জিমিঘাট (Jimighat)। ঘন বসতি। পথের ধারে চায়ের দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁ। পাশেই দোতলা বাড়ির একতলায় যাত্রীনিবাস। হোটেলের মালিক এক কিশোর — গঙ্গা সিং টোলিয়া, অল্প বয়সে পিতৃহারা।

মা, দিদি ও ছোটভাইকে নিয়ে কিশোর গঙ্গা সিংয়ের সংসার। স্বামীর মৃত্যুর পর বুদ্ধিমতী দেবকী দেবী দুই শিশুপুত্র ও কন্যাকে নিয়ে বাড়িতেই একটি চায়ের দোকান করে। মেয়ে এখন শ্বশুরালয়ে, বড় ছেলে গঙ্গা এখন কিশোর, দোকানের সাথে খাবার হোটেলের ব্যবস্থা রেখেছে।

আজ দীপাবলী। সকলের ছুটি। কিশোর গঙ্গা তার দোকান বন্ধ রেখেছে। গঙ্গার মা দেবকী দেবী নিজের ঘরেই আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে। রুটি, ডাল, সবজি ও চাউল।

গ্রামে মোট ১২টি পরিবারে ৬৫-৭০ জল লোকের বাস। একটি জুনিয়র হাইস্কুল আছে। জিমিঘাট থেকে মুনস্যারী ৭ কিমি। লিলাম ২১/২২ কিমি। ভেড়ার পশম থেকে কম্বল, আসন ও কার্পেট তৈরি এখানকার মানুষের অন্যতম উপজীবিকা। সরকার থেকে এইসব কাজের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা আছে।

কার্পাস ও পশম উভয়ের সংমিশ্রণে তৈরি আসনগুলির শিল্পকলা দেখে চমৎকৃত হই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া পেলে এই সব শিল্প বিশ্বের বাজারে অতি সহজেই আপন যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে।

৬ ফুট বাই ৬ ফুট মাপের একটি কার্পেট তৈরিতে সময় লাগে ২ মাস। খরচ পড়ে কার্পাস সুতা ৩০০ টাকা; পশম সুতা ৩০০ টাকা। ঐ মাপের কার্পেটে মোট খরচ ৬০০-৭০০ টাকা। সরকার থেকে পায় কার্পেট পিছু ১৮০০ টাকা। অর্থাৎ দুমাসে মজুরী পায় কম বেশী ১০০০ টাকা। দেবেন্দ্র সিং খেদের সাথে বলে কোন কাজ নেই তাই করি - যতটুকু পাওয়া যায়। লেবারের কাজ পেলে চলে যাই। দেবেন্দ্রর তিন মেয়ে দুই ছেলে। সংসার চলে না। বড় মেয়ে নির্মলা ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। দুধে আলতা মেশানো রঙ, রূপে দেব কন্যা। দেবেন্দ্র বড় মেয়ের বিয়ের জন্য খুবই চিন্তিত। নির্মলার বিয়ে করার খুব ইচ্ছা। শিক্ষার আলো যেখানে প্রবেশ করেনি, সেখানে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই, সেখানে এটা (বিয়ে) নিয়েই ওরা বেঁচে থাকে।

ওদিকে মা-দেবকীর রান্না প্রস্তুত। আহারের ডাক আসে। গঙ্গার রেস্তোরাঁর টেবিলে খাবারের আয়োজন। অতি চমৎকার রান্না, গঙ্গা দাঁড়িয়ে থেকে ভোজনের তদারকি করে। এত উপরে এত সস্তায় খাবার ভাবতেই পারি না। প্রতি থালি পনের টাকা।

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। সুতরাং আর দেরী নয়। যাত্রাকালে মা-দেবকীকে ধন্যবাদ জানানোর কোন ভাষা পাই না। ফেরার পথে আবার আসব — জানিয়ে যাই।

গ্রামের শেষ প্রান্তে কমলার বাড়ি। কমলা থাকে মুনস্যারী। দীপাবলীতে বাপের বাড়ি এসেছে। বাড়ির উঠানে মুসাম্বি গাছ। ফকিরা মুসাম্বির লোভে ওদের ভাষায় কমলাকে কি বলে সেটা সেই জানে। কমলা ঘর থেকে মুসাম্বি

এনে ফকিরার হাতে দেয়। বৃদ্ধা দাদিমা উঠানেই ছিল। — দীপাবলীতে বিদেশে যারা থাকে, সকলেই বাড়ি আসে, তুমি বিদেশে যাচ্ছ কেন? তুমি আজ আমার বাড়ি থেকে যাও।

দাদিমার কথা মনের গভীরে আঘাত করে — ক্ষণেকের জন্য মনটা কলকাতায় উড়ে যায়। জিমিঘাটকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু ২-১৫ মিঃ।

জিমিঘাটের শেষ প্রান্তে এক খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর বুকে নব নির্মিত ঝোলা পুল। ঝোলাপুলের নির্মাণ কার্য শেষ হলেও উদ্বোধন পর্ব শেষ হয়নি। তাই সাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ। ঝোলাপুলের সামনে দিয়ে পায়ে চলা পথে কিছুটা এগিয়ে যাই। উৎরাই পথে স্রোতস্বিনীর তীরে নেমে যাই। স্রোতস্বিনী পেরিয়ে চড়াই পথে ঝোলাপুলের অপর প্রান্তে চলে আসি। সামান্য পথটুকু চড়াই। তারপর সমতল পথে এগিয়ে চলি।

ঘড়িতে ২-৪৫ মিঃ। এক কৃত্রিম গুহার সম্মুখে এসে হাজির। সমতলে হাতে হাত লাগিয়ে মানব বন্ধন তৈরি করে দুপাশের দুটি পাহাড় মাথায় মাথায় লাগিয়ে কৃত্রিম সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি করে। স্থানীয় নাম লিলাম গুম্ফা।

গুম্ফা পেরিয়ে উপলখণ্ডে বাঁধানো পথ। ডানহাতে গোরীগঙ্গার উচ্ছ্বাস ও মনমাতানো নৃত্য। ফকিরা পিঠের বোঝা নামায়। গোরীগঙ্গা রূপসী মনোহারিণী। তার মায়াময় তীরে গণ্ডশিলায় বসে মন উদাস হয়। পথ চলার কথা ভুলে যাই।

আজ দীপাবলী, কুমায়ুনবাসীর শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন। প্রকৃতি রূপময়ী, স্নেহময়ী, শুচিস্মিতা। প্রকৃতির কোলে উন্মাদিনী গোরীগঙ্গা, গিরিরাজের চরণে অহর্নিশ জল সিঞ্চন করে। তার আঁচল ধরে হাঁটতে পথচলার কোন কষ্ট নেই।

অপরাহ্নের সূর্যকিরণে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আলোর মালা। উপরে নির্মল নীল আকাশ, নীচে শুচিশুভ্র বসুন্ধরা, কুমায়ুনের ঘরে ঘরে উৎসব। জিমিঘাটের সকল গৃহকোণ থেকেই রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ।

ফকিরার ডাকে সাড়া দিয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু। পূর্বেই বলেছি জিমিঘাট থেকে লিলামের দূরত্ব মাত্র আড়াই কিমি। দেখতে দেখতে লিলামের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে যাই। বাঁহাতে সামান্য উপরে পাহাড়ের গায়ে টিনের দোতলা বাড়ি।

মোহন সিংয়ের হোটেল, রেস্তোরাঁ ও লজ। পথের পাশে ডানহাতে সাইন বোর্ডে লেখা 'লিলাম'। উচ্চতা ১৭৩৪ মিটার। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে।

লিলামের দুটি ভাগ — তলা লিলাম এবং মালা লিলাম। ফকিরা তলা লিলামে না দাড়িয়ে মালার দিকে এগিয়ে যায়।

পাহাড়ী গ্রাম। চড়াই পথে কিছুটা এগিয়ে যাই। পথ অরণ্য শোভিত। ডানহাতে সামান্য উপরে কয়েকটি টিনের ঘর দেখতে পাই। প্রতি ঘর বেশ বড়। তারই একটি ঘরে হোটেল রেস্তোরাঁ ও লজ। হোটেলের মালিক ঘনশ্যাম সিং। সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত।

আজ এখানেই চলার বিরতি। ঘনশ্যাম ছাড়া মালা লিলামে দ্বিতীয় কোন আশ্রয় নেই। টিনের চালায় রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সামনে কাঠের পাটাতনে বসে চা-পান করি।

দোতলা টিনের ঘরের পাশেই মন্দির। মন্দিরের দেবতা মা পার্বতী। ঐ মন্দির সেনাবাহিনীর। আজ দীপাবলী, মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন। উপরের সবকটি টিনের বাংলোই ITBPF -র দখলে। ঘনশ্যাম যে ঘরে লজ বানিয়েছে সেটিও সেনাবাহিনীর।

লিলামের আসল বসতি সামান্য দূরে পাহাড়ের গায়ে। আমরা যে পথে চলেছি এপথ PWD - র। টিনের বাংলোগুলি সেনাবাহিনীর। লিলামের গ্রামে মোট ১৫টি পরিবারে ৬০-৭০ জন লোকের বাস। সেখানে প্রাথমিক স্কুল আছে।

চা-পানের পর বাংলোয় গিয়ে জোয়ানদের সাথে আলাপ করি। এদের সব কিছুই গোপন রাখতে অনুরোধ করে। এদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাই। লিলামের পথে সর্বত্রই ITBPF-র Camp আছে। এগুলি সবই Tramict Camp. 1962 সালে চিন ভারত আক্রমণের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী এই Camp গুলি তৈরি করে। পরবর্তীকালে এই ক্যাম্পগুলির দায়িত্বে আসে ITBPF। ভরদ্বাজ চা-পানে আপ্যায়ন করেন। মিলামের পথে সর্বত্রই ITBPF-র সাথে যোগাযোগ রাখতে পরামর্শ দেন। Bugdear এ অবশ্য নাম ঠিকানা ও ফোন নং লিখে দিতে পরামর্শ দেন। সন্ধ্যায় দুর্গামন্দিরে দীপাবলীর বিশেষ পূজায় অংশ গ্রহণ করি। লিলামে এসে মাতৃ আরাধনার সুযোগ পাব ভাবতেই পারিনি। পূজার পর প্রসাদ

নিয়ে ঘরে আসি। গাঢ় অন্ধকারে জওয়ানরা টর্চ দিয়ে এগিয়ে দেয়।

এদিকে ঘনশ্যামের রান্না প্রস্তুত। রুটি, ডাল, সবজি। ভাল রান্না। আহারের পর গরম দুধ।

ঘনশ্যামের লজে শোবার ব্যবস্থা ভালই। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা চৌকি। ঘরে সোলার লাইট। রাতে ভালই ঘুম হয়।

লিলাম - বুগড়িয়ার

২৬শে অক্টোবর, দীপাবলীর শেষ রজনী। লিলামের অস্থায়ী আবাসনে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। বিছানাতেই গুরুজীকে স্মরণ করি। প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘনশ্যামকে চা দিতে বলি।

গতকাল অপরাহ্নবেলায় লিলাম এসে ঘনশ্যামের নিকটেই আশ্রয় নিই। ঘনশ্যাম এ পথে নির্ভরশীল ব্যক্তি। পর্যটকের অনেক চিন্তার সে লাঘব ঘটায়।

আজ লিলাম থেকে বুগড়িয়ার যাত্রা। পথের জন্য প্যাকলাঞ্চ - রুটি সবজি সঙ্গে যাবে। ঘনশ্যাম কোন কিছু চিন্তা করতে না করে। ঘনশ্যামের আন্তরিক ব্যবহার ও পরিষেবা প্রশংসার দাবী রাখে। থাকা খাওয়া খরচ সে যথেষ্ট কম নেয়।

চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে ফকিরাকে ডেকে দিই। ফকিরার ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হয়। গতরাতে সে একটু অসুস্থ হয়।

ফকিরাকে সাথে নিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিই। এমন সময় বুগড়িয়ারের চৌকিদার মঙ্গল সিং এসে হাজির। মঙ্গলের বাড়ি লিলামের বুইগাঁও গ্রামে। দীপাবলীর ছুটিতে সেও বাড়ি এসেছিল। আজ কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছে। মঙ্গলকে পেয়ে মনে আনন্দ হয়। তিনজনে একত্রে যাত্রা করি, ঘড়িতে সকাল ৮টা।

সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত প্রকৃতি। ডানহাতে চঞ্চলা গোরীগঙ্গা। পথশোভা অতি চমৎকার। পথের চেহারাও ভাল। আজ সারা পথেই জওয়ানদের সাথে দেখা। এ পথে সর্বদাই জওয়ান যাতায়াত করে। সীমান্ত এলাকা। প্রতিরক্ষার তাগিদে সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

সকলের মুখে একই কথা — এখন সিজিন সমাপ্ত, উপরে কোন অসামরিক লোক নেই, হোটেল সব বন্ধ, ঠাণ্ডার তীব্রতা অধিক। মনে মনে জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগে। এইসব জওয়ান জীবনের মায়া তুচ্ছ করে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এদের গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই।

জওয়ান নায়েক রাজেন্দ্র সিংজীর সাথে দেখা, রাজেন্দ্রজী রেকি করে ফিরছে। পরনে সামরিক পোষাক, হাতে অস্ত্র, পিঠে মালের বোঝা। মিলাম গ্লেসীয়ার, দুং, গঙ্গাপানি, কিংড়ি বিংড়ি, ইত্যাদি শেষ সীমানা পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে যাচ্ছে। আজ লিলাম হয়ে মুনস্যারী ফিরে যাচ্ছে। সকলকেই মাসে ২/১ বার করে আসতে হয়। এদের HQ ধরচুলা।

Major K. T. Varunny, from kerala, সুদর্শন যুবক। দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। পাহাড়কে গভীর ভাবে ভালবাসে। আমি পাহাড়ের বই লিখি জেনে আনন্দে নেচে ওঠে। কোথায় বই পাওয়া যাবে — সে ঠিকানা চায়। দেশে ফিরে সে বই আনিয়ে নেবে।

ঘড়িতে ঠিক ১০টা। রূপসী 'বগড়' এসে বসেছি। বগড় থেকে বুগডিয়ার আরও ৮ কিমি। রূপসী বগড়ে পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের আকৃতি। অসংখ্য নানা রঙের কাপড় বাঁধা আছে। সকলেই প্রণামী দেয় আমিও দিলাম।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা। পথের চেহারা অতি চমৎকার। ডানহাতে গোরীগঙ্গার নৃত্য। পথ চলার কোন কষ্ট অনুভব হয় না।

ঐ যে জওয়ানের দল নেমে আসে। এদের দেখে আনন্দ ও সাহস পাই। ওং নমঃ শিবায় - বলে শুভেচ্ছা জানাই। সকলেই ওঁ নমঃ শিবায় বলে আনন্দ পায়। সকলের পিঠেই মালের বোঝা, হাতে আগ্নেয় অস্ত্র, পরনে সৈনিকের পোষাক। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত শ্রদ্ধা সহ অভিনন্দন জানাই।

উপরে নির্মল নীল আকাশ, ডানহাতে নৃত্যচপল গোরীগঙ্গা, বাঁহাতে অরণ্য শোভিত পাহাড়শ্রেণী, পদতলে মসৃণ পথ, ট্রেকিং পথে এমন আনন্দের আস্বাদন জীবনে প্রথম।

মাঝে মাঝেই পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণা দেখতে পাই। এ পথে জলের কোন

অভাব নেই। ফকিরা মাঝে মাঝে পিঠের বোঝা নামিয়ে বিশ্রাম নেয় ও ধূমপান করে। চৌকিদার মঙ্গল সিং সাথেই চলেছে। পাহাড়ী মানুষ পাহাড়ের মতই মন, বৃদ্ধ মানুষটির চলার গতি দেখে অবাক হই। ও সর্বদাই এগিয়ে চলে।

এতক্ষণ কম বেশী সমতল পথেই চলেছি। ঘড়িতে ১১টা, চড়াই পথের শুরু। এপথ অরণ্য শোভিত। গোরীগঙ্গা সাথেই আছে। আজ সকাল থেকে অরণ্য বিহীন পথে হেঁটেছি। চড়াই পথে চলতে একটু ক্লান্তি অনুভব করি। ফকিরা পিঠের বোঝা নামায়, আমিও বসে একটু বিশ্রাম নিই। মঙ্গল সিংয়ের বিশ্রামের দরকার হয় না, সে এগিয়ে যায়।

ঘড়িতে ১২ টা। গোরীগঙ্গার তীরে নেমে আসি। নদীতটে অপূর্ব বুগিয়াল। বাঁহাতে সুদীর্ঘ একটি চালাঘর। মরশুমে এখানেই জাকজমক হোটেল বসে। স্থানের নাম রাড়াগাড়ি (Raragari)। মধ্যাহ্ন আহারের সময় হয়েছে, আমরাও এখানে বসে আহার সেরে নিই। লিলাম থেকে প্যাক লাঞ্চ সঙ্গে এনেছি, সুতরাং খাবারের কোন চিন্তা নেই।

উপরে সাদা মেঘ এসে নীল আকাশটাকে ঢেকে দেয়। মিষ্টি রৌদ্র আর নেই সুতরাং দ্রুত পদে নামি। কিছুটা গিয়ে রাড়াগড়ি নদী এসে গোরীগঙ্গাকে আলিঙ্গন করে। নদীর বুকে গাছের ডাল পেতে পারাপারের ব্যবস্থা। রাড়াগড়ি আবার সুন্দর পথ। ফকিরার পিঠে মালের বোঝা ওর পক্ষে দ্রুত চলা সম্ভব নয়। ওর তালে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

যত উপরে যাই, গোরীগঙ্গা ততই বসন পাল্টায়। ঘড়িতে ১টা। গোরীগঙ্গার রূপ দেখে পাগল হয়ে যাই। এ পথে গোরীগঙ্গার সন্দর্শনে মন ভরে যায়। মা-গোরী পাহাড় কাঁপিয়ে নীচে নামে।

গঙ্গোত্রীতে মা-গঙ্গাকে যেমন দেখেছি এখানে ঠিক তার বিকল্প। মা-গৌরী মহাদেবের জটায় আবদ্ধ। গিরিরাজের জটার বাঁধন খুলে তাকে নামতে হয়। মা-গৌরী দশভুজা। দশহাতের শক্তি লাগিয়ে তাকে নামতে হয়। সে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোরী গঙ্গার খেলা দেখি।

ঘড়িতে সোয়া ১টা। সুউচ্চ এক জলপ্রপাতের সামনে ফকিরা পিঠের বোঝা নামায়। অতি চমৎকার পরিবেশ। গোরী-গঙ্গার তীব্র গর্জনে প্রকৃতির

নীরবতা ভঙ্গ হয়। অনেক আগেই অরণ্যভূমি অতিক্রম করে এসেছি। আবার বে-রসিক মেঘ এসে সূর্যদেবকে আড়াল করে। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা। মঙ্গল সিং অনেক আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা। দ্রুত পা চালাই। এ পথে গোরী পর্যটকের ক্লান্তি হরণ করে। গোরীগঙ্গার সাথে হিমালয়ের কোন স্রোতস্বিনীর তুলনা চলে না। গোরী মিলাম গ্লেসিয়ার থেকে আগতা। মিলামের সৌন্দর্য বুকে নিয়ে তার যাত্রা। তার মস্তকে স্বর্ণমুকুট, সর্বাঙ্গে মণি-মুক্তা-হীরক খচিত অলংকার, পরনে পীতবর্ণ বসন। মিলামের পথে না এলে গোরী-গঙ্গার এ রূপ দেখা যাবে না। এ পথের অন্যতম আকর্ষণ গোরীগঙ্গা, যার রূপের কোন বর্ণনা নেই। গোরীর তীরে পাহাড়গুলি যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি।

ঐ যে বুগডিয়ারের (২৪৫০ মিঃ) দেখা পাই। ঘড়িতে বিকাল ৩টে। টিনের সেড, তাঁবু, ইত্যাদি। হাবিলদার দর্শন সিং শুভেচ্ছা জানায়। স্নেহভরে তাঁবুতে ডেকে নেয়, তাঁবুর ঘর। তিন চারখানা খাটিয়া। একটিতে অফিস, ৩/৪টি চেয়ার। নাম, ঠিকানা সব কিছু লিখে নেয়। সাথে প্রয়োজনীয় কিছু উপদেশ।

উপরে এখন কোন লোক নেই। শুধু বরফ আর বরফ। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে। যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকলে এ সময়ে উপরে যাওয়া ঠিক নয়। এরই মধ্যে চা-য়ের গ্লাস হাতে এসে যায়।

পূর্বেই বলেছি এপথে সবই ITBPF-র দখলে। তাদের উপদেশ নিয়ে চলা অবশ্যই উচিত। বিপদে এরাই এগিয়ে আসে।

সৌভাগ্যক্রমে এক বাঙালী ITBPF -র সাথে দেখা। দীপক কুমার বিশ্বাস, বুগডিয়ারে কর্মরত। বাঙলার লোক দেখে আনন্দের সীমা নেই। দীপকের মতে এসময়ে আমার উপরে না যাওয়া উচিত। বুগড়িয়ার, রিলকোট, বুরফু, মার্টোলী, মিলাম সর্বত্রই হোটেল ছিল। দীপাবলীর আগে সকলেই হোটেল বন্ধ করে নীচে নেমে গেছে। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মিলাম ট্রেকিং-এর শ্রেষ্ঠ সময়। PWD - Bunglow মুনস্যারী, লিলাম, বুগডিয়ার ও মিলামে PWD - র বাংলো আছে। এই বাংলো গুলি ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল বন্ধ থাকে।

আজ বুগডিয়ারে প্রচণ্ড বাতাস বইছে। টেন্ট পিচ্ না করে PWD-র

বাংলোতে থাকার সিদ্ধান্ত নিই। প্রতি ক্ষেত্রেই বাংলোর চার্জ 100/-

এদিকে চৌকিদার মঙ্গল সিং আমাদের পূর্বেই বাংলোয় পৌঁছে যায়। মঙ্গলের সাথে সারা পথেই আলাপ হয়েছে সুতরাং ঘর পেতে কোন অসুবিধা হয় না। PWD-র ঘরে attached bath ও Latrin। ঘরে দু-খানি চৌকি, টেবিল ও চেয়ার। মঙ্গল সিং ঘরে বিছানাপত্র দিয়ে দেয়।

মঙ্গল সিং এ অঞ্চলের অনেক পুরানো চৌকিদার। আর দু-বছর পর তার অবসর। বুগডিয়ার ITBPF - র সকলের সাথেই তার আলাপ।

পূর্বেই বলেছি দীপাবলীর ছুটিতে সে বাড়ি যায়। আমাদের সাথে সে কর্মস্থলে ফিরে আসে। আমাদের সাথেই তাকে আহারে আমন্ত্রণ জানাই। সেও খুশি হয়। ফকিরাকে আমাদের রেশন থেকে চাল ডাল নিতে বলি। মঙ্গল খিচুড়ি তৈরির দায়িত্ব নেয়।

মঙ্গলের কাঠের উনানে হাত পা সেঁকে নিই। মঙ্গল তার অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। দীপাবলীর পর উপরে যাওয়া উচিত নয়। যে কোন সময় তুষার পাত হয়। ফেরার পথে বিপদ হতে পারে। সে এ পথে অনেককে ঠাণ্ডায় জমে থাকতে দেখেছে। মিলামে ঠাণ্ডার তীব্রতা বেশী।

ইতিমধ্যে খিচুড়ি তৈরী হয়। মঙ্গলের কথা ৫টার মধ্যে আহার সেরে নিতে হবে। দিনের আলো থাকতে রাতের খাওয়া অবশ্যই সেরে নেওয়া উচিত। আকাশে মেঘ।

আমরা সবে খিচুড়ি নিয়ে বসেছি, অকস্মাৎ বৃষ্টি শুরু হয় সাথে তুষারপাত। মঙ্গল বলে প্রকৃতির যা অবস্থা তাতে আপনাদের নীচে নেমে যাওয়া উচিত। উপরে এখন আরও তুষারপাত হচ্ছে। রীলকোট এখন জনশূন্য। একমাত্র ITBPF - ছাড়া সাধারণ মানুষ উপরে যাবে না। মঙ্গলের মোটেই ইচ্ছা নয় আমি উপরে যাই। সে এ অঞ্চলের মানুষ। মিলামের পথে বহুদিন চাকরীতে আছে। চলতে চলতে মানুষের মৃত্যু দেখেছে। মিলামের ক্ষুধা বেশী। দীপাবলীর পর আর কেউ এ অঞ্চলে থাকে না।

সারা রাত স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাই। মঙ্গলের কথা ITBPF - র কথা ভাবতে থাকি। হঠাৎই গৌতমের কথা মনে আসে। পাহাড়ে

লোভ থেকেই যত বিপদ। সুতরাং আগামী কাল নীচে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

বুগডিয়ার - মুনস্যারী

২৭শে অক্টোবর, বুডগিয়ার, PWD - র বাংলো। অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গতেই দেশলাই জ্বেলে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বালি। সারা রাত প্রদীপটা জ্বালাই ছিল। প্রদীপ না থাকলে ঘরে জমাট অন্ধকার। সারা রাত বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দ শুনেছি। সামান্য পূর্বে প্রদীপ নিভিয়ে ঘুমিয়েছি। বাইরে তখনও বাতাস বইছে। গতকাল রাতেই নীচে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরি হয়ে নিই। ওদিকে চৌকিদার মঙ্গল সিংয়ের চা-প্রস্তুত। ফকিরাকে ডেকে দিই। আমাদের সঙ্গের ম্যাগী মঙ্গলকে দিতে বলি। ঐ ম্যাগীতে তিনজনের প্রাতরাশ।

মঙ্গল সিংয়ের মিষ্টি ব্যবহার ও আন্তরিকতার তুলনা নেই। মিলাম অসমাপ্ত হওয়ায় ওর দুঃখটাই বেশী। মঙ্গল সিং ঠিকানা লিখে দেয়। চিঠি পেলে ও আমাদের জন্য ঘর রেখে দেবে।

মঙ্গল মাঝে মাঝে অনেক কথাই বলে — পাশের ঐ ধর্মশালাটি কালীকমলীর। বহুপ্রাচীন আমলের। এখন কেউ ওখানে থাকে না। ১৯৬২ সালে দালাই লামা-এ পথেই ভারতে আসেন। চীন সেই বছরেই তিব্বত দখল করে নেয়। পূর্বে এটাই ছিল ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাসের পথ।

এই মুহূর্তে প্রকৃতি শান্ত। আর বাতাস নেই। প্রভাতী সূর্যকিরণে সমগ্র বুগডিয়ার প্রাণময়। মঙ্গল সিংকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ফেরার পথে পা বাড়াই। যাত্রা কালে ITBPF - র ক্যাম্পে গিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসি।

সুন্দর প্রকৃতি। উৎরাই পথ, দ্রুত নেমে চলি। বুগডিয়ার থেকে মুনস্যারী নামতে হবে, সুতরাং পথে কথা বলার সুযোগ কম।

আজ ঘড়ির কাঁটা কোথা দিয়ে এগিয়ে চলে বুঝতেই পারি না। বেলা সাড়ে ১২টা, লিলাম এসেছি। ঘনশ্যাম-কে দ্রুত চা-দিতে বলি। সকালের ম্যাগী আর নেই। চা-বিস্কুট খেয়ে কিছুটা খিদে মিটাই। ঘনশ্যাম আহারের অনুরোধ

করে। জিমিঘাটে গিয়ে মধ্যাহ্ন আহারের সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিয়েছি। চা-খেয়ে আবার চলা শুরু।

জিমিঘাটে এসে দেখি দোকান বন্ধ। সঙ্গের বিস্কুট খেয়ে মধ্যাহ্ন আহার। ঘড়িতে ১-২০ মিঃ। সুঁড়িগড়ে বলবন্ত সিংয়ের চায়ের দোকানে এসে বসেছি। বলবন্তের দোকানে চা-ভিন্ন কিছুই নেই। স্কুলের পড়া ছেড়ে নূতন ব্যবসায় নেমেছে। চা-পান করে আবার চলা শুরু।

সুঁড়িগড় থেকে সেলাপানি ২ কিমি। সুঁড়িগড়ে নূতন পথসঙ্গী পাই, মঙ্গল সিং। মঙ্গল গ্রামের ছেলে হলেও শহরের ছেলেকেও হার মানায়। সুদর্শন যুবক। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। পড়া ছেড়ে মুনস্যারীতে মনিহারী দোকান করেছে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক। মঙ্গলের চেহারাও সৈনিকের মত। দু-দুবার চেষ্টা করেও সেনাবাহিনীতে চাকরী হয়নি। তাই ব্যবসায় নেমেছে।

ঘড়িতে ৩-৩৫ মিঃ সেলাপানি পৌঁছাই। সামান্য অপেক্ষা করতেই জীপ আসে। যাত্রী অনেক, অনেক কষ্টে জীপে স্থান পাই। মুনস্যারী ১১ কিমি। ভাড়া ১৫ টাকা।

মুনস্যারীতে এসে পাণ্ডে লজেই আশ্রয় নিই। হরিগোবিন্দবাবুর আন্তরিকতা বাহাদুরের সেবা — মনের গভীরে দাগ কাটে।

নন্দাদেবী রাজ জাত

নন্দাদেবী শান্তির প্রতীক, মুক্তির প্রতীক, ত্যাগের প্রতীক। সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্তি মায়ের কাল্পনিক রূপ। মা স্নেহময়ী , মাতৃময়ী। মধ্য হিমালয়ের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে,হৃদয়ে- হৃদয়ে মা বিরাজমানা । দেবী হিমালয়বাসীর দুঃখহারিণী, ত্রাণকারিণী, আধি-ব্যাধি ও বিপদের দিনে দেবীর নাম ও চরণামৃত পাহাড়ী মানুষের মহৌষধ ।

জনক রাজার কন্যা সীতা ছিলেন মিথিলাবাসীর ঘরের মেয়ে, তেমনি নাগাধিরাজের কন্যা নন্দাদেবী গাড়োয়াল ও কুমায়ূনবাসীর আদরের কন্যা । পুরাণে কথিত আছে হিমাচল রাজের কন্যা মা গৌরী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত ত্রিশূল-ধারী ভস্মমাখা সাধুর গলায় বরমাল্য পরিয়ে পরমেশ্বরী হয়েছিলেন। মা নন্দাদেবী গাড়োয়ালবাসীর পরমেশ্বরী। নন্দাদেবী নিজের মেয়ের চেয়েও প্রাণাধিক ,তাদের ইষ্ট-দেবতা ।

গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের অসংখ্য গ্রামে নন্দাদেবীর নামে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে । কোন মন্দিরে দেবীর সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্তি, আবার কোথাও নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক, ত্রিশূল। নন্দাদেবীর প্রতি পাহাড়ী মানুষের প্রেম,ভক্তি ভালবাসার কোন তুলনা নেই। মেয়ে ঘরে এলে তাকে শাঁখা, চুড়ি, সিঁন্দুর, সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয়। পাহাড়ী মানুষ এই সকল বস্তু উপহার দিয়ে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

গাড়োয়ালের রাজ পরিবার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে নন্দাদেবী গৃহদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিতা। সকলের বিশ্বাস দেবী প্রতি বারো বছর অন্তর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসেন।

দীর্ঘদিন পর মেয়ে বাপের বাড়ি এলে সেখানে উৎসবের ধুম পড়ে যায়। যাগ-যজ্ঞ, উৎসব-অনুষ্ঠান মাত্রেই ব্যয়বহুল। রাজপরিবার কিংবা ধনবান ব্যক্তিরাই এই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। প্রজাগণের মনোরঞ্জন

ও কল্যাণ, রাজ্যের উন্নয়ন, এবং শত্রু নাশের আকাঙ্ক্ষায় রাজন্যবর্গ তথা রাজ্যসরকার দেবীর মর্ত্যে আগমন উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দীর্ঘ ১৮দিন ধরে গ্রামের সমস্ত নন্দাদেবীর মন্দির পরিক্রমা করে। এই উৎসবের নাম নন্দাদেবী 'রাজ জাত'। গাড়োয়ালী ভাষায় জাত শব্দের অর্থ আগমন ।

এই উৎসবে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের সকল মানুষ সতস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এটাই তাদের জাতীয় উৎসব। ঐ দিনটিকে স্মরণীয় রাখতে প্রতি বছর প্রতিটি মন্দিরে উক্ত তিথিতে উৎসব পালিত হয়।

এই 'রাজ জাত' প্রথম শুরু হয় পঞ্চম শতাব্দীতে কুমায়ূনের চাঁদগড়ের রাজা অজয় পাল উৎসবের সূচনা করেন। দীর্ঘ যাত্রা পথে বিশ্রাম ও রাত্রিযাপনের জন্য পথের বিভিন্ন স্থানে অনেক শিবির স্থাপন করা হয় । এই যাত্রা শুরু হয় কুরুর গ্রাম থেকে । হোমকুণ্ডের পথে মেয়েকে বিদায় জানিয়ে অর্থাৎ মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ে বেদনাহত শোভাযাত্রা কুরুর গ্রামে ফিরে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দেবীর বিদায় মুহূর্তটি বড়ই করুণ। চারটি শিংওয়ালা ভেড়ার পিঠে চেপে দেবী শ্বশুরবাড়ি গমন করেন। ভেড়াটিকে কনের সাজে সাজানো হয়। গাড়োয়াল ও কুমায়ুনবাসীর দেওয়া যৌতুক সমূহ ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বিদায়ের সংগীতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। চোখের জলে ভাসিয়ে ভেড়াটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় কৈলাসের পথে । কনের সাজে সুসজ্জিত ভেড়া আপন মনে এগিয়ে চলে ত্রিশূলী শৃঙ্গের দিকে, যেখানে রয়েছে শঙ্কর ভগবানের আবাস ভূমি।

শোভাযাত্রার যাত্রা পথে ১৮দিনে মোট ১৮টি শিবির স্থাপিত হয়।

১) কুরুর - ইড়াবন্ধনী ২) ইড়াবন্ধনী - কুরুর ৩) কুরুর - কনসুয়া ৫) কনসুয়া - সেসেম ৬) কোটি - ভাগোতি ৭) ভাগোতি - কুলসারি ৮) কুলসারি - ছেপরাউ ৯) ছেপরাউ - ফলদিয়াগ্রাম ১০) ফলদিয়া-মানদোলি ১১) মানদোলি- বান ১২) বান - গোড়ালি পটল ১৩) গোড়ালি পটল - পাতর-নাচুনি ১৪) পাতর-নাচুনি - জিউনারাগলি ১৫) জিউনারাগলি - শিলাসমুদ্র,পাস (১৭৫০০ ফুট) ১৬) শিলাসমুদ্র-হোমকুণ্ড-চাঁদনিয়াঘাট ১৭) সুতোল-ঘাট

১৮) ঘাট - কুরুর।

নন্দাদেবী সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়নি। পুরাণ, উপপুরাণ, বা মহাভারতে নন্দাদেবীর উপর কোন কাহিনী নেই। তাই নন্দদেবী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। অনেকের মতে নন্দাদেবী যোগমায়া, তিনি মথুরার রাজা নন্দের ঘরে যশোদার সপ্তম গর্ভে জমগ্রহণ করেছিলেন তাই তার নাম নন্দা। তবে নন্দাদেবীঃ বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায় কনৌজের রাজা যশোধাবল্লভ গাড়োয়ালের শাসন কর্তার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাণীর অহংকারে সমগ্র রাজ্য দেবতার রুদ্ররোষে পতিত হয়। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, খরা, অজন্মা, মহামারী ইত্যাদি দেখা দেয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমগ্র রাজ্য ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। রাজ-পুরোহিত ও রাজ-জ্যোতিষীর পরামর্শমত রাজা নন্দাজাত উৎসবে অংশ নিতে সম্মত হন। তাঁদের ধারণা নন্দামায়ের অভিশাপের ফলে রাজ্যের এই দুর্দশা।

রাজা যাবেন নন্দামায়ের শোভাযাত্রায়, চারিদিকে সাজ সাজ রব। কোনরূপ বাধানিষেধের বালাই নেই। গর্ভবতী রাণী, রাজকন্যা, পাইক, বরকন্দাজ, লোক-লস্কর ইত্যাদি সঙ্গে যাবে। আর থাকবে রাজার পছন্দের বাইজী ও নর্তকীগণ। রাজার চিত্তবিনোদনের সকল বস্তুই সঙ্গে যায়।

যথাসময়ে নন্দাদেবীর শোভাযাত্রার উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে , মেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের তেমন নজর নেই, সকলের নজর রাজার প্রতি। দক্ষরাজের ঘরে সতীর অনাদরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সতী পরমেশ্বরী, দক্ষরাজের ঘরে জন্ম নিলেও স্বামীর প্রতি পিতা-মাতার দুর্ব্যবহার তিনি সহ্য করেননি। পিতামাতার আচরণে তিনি নিজেই দেহত্যাগ করেন।

বাপের বাড়ি এসেও বাবামায়ের আদর থেকে বঞ্চিত, অশোভন রাজাকে সামাল দিতে সকলেই ব্যস্ত, এসব নন্দদেবীর মোটেই পছন্দ ছিল না। যাত্রার শেষ পর্যায়ে রাজা অধিক মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন। সেদিন রূপকুণ্ডের তীরে রাত্রি বাসের ব্যবস্থা। রাণী অনতিদূরে একটি গুহায় একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। রাজা আনন্দ সাগরে ডুবে যান, তিনি সকল বাইজী ও নর্তকীগণকে দেহ উজাড় করে নাচতে আদেশ দেন।

গাড়োয়াল কন্যা মা নন্দাদেবী লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে সংকুচিত হয়ে পড়েন। প্রকৃতি জননী মেয়ের অপমানের প্রতিশোধ নেন।

১৬৫৯৫ ফুট উচ্চতায় রূপকুণ্ডের তীরে অকস্মাৎ শুরু হয় তুষার ঝড়। রাজা সপরিবারে প্রাণ হারান। সমগ্র শোভাযাত্রাটি কয়েক ফুট বরফের নীচে চাপা পড়ে। দীর্ঘদিন পরেও রূপকুণ্ডেরতীরে আজও অসংখ্য নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রকৃতি ন্যায়ের প্রতীক, ধর্মে প্রতী ক , তাঁর কাছে অন্যায়ের কোন ক্ষমা নেই।

বুগিয়াল

হিমালয় দেবতাত্মা। দেবতার আবাস ভূমি হিমালয়। হিমালয় অধিপতি সমতলের মানুষের নিকট গিরিগাজ, নগাধিরাজ, শঙ্কর ভগবান ইত্যাদি নামে অর্চিত। তাঁর আঙ্গিনায় যেতে হলে কিছু বিধিনিষেধ মানতে হয়। প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সেইসকল নিয়ম প্রবর্তন করেন। সমতলভূমি, তরাই অঞ্চল, বনাঞ্চল, বনরেখা, তুষাররেখা, তুষারাঞ্চল ইত্যাদি প্রকৃতির ভিন্নভিন্ন রূপ। প্রতিটি ক্ষেত্রই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে স্বয়ম্ভর। বনরেখা ও তুষাররেখার মধ্যবর্তী স্থানসমূহকে সাধারণত বুগিয়াল বলা হয়। এই স্থানসমূহে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অধিকাংশ বুগিয়াল সবুজ ঘাসে ঢাকা থাকে। এই ঘাস তৃণভোজী প্রাণীর খুব প্রিয়। মেষপালকগণ গরমকালে সপরিবারে তাদের ভেড়ার দল নিয়ে এইসব বুগিয়ালে এসে লতাপাতা দিয়ে অস্থায়ী বাসা বাঁধে। তাঁদের এই অস্থায়ী আবাসনকে ছানি বলে। অনেকে ভেড়া বকরির সাথে গরু মহিষ প্রতিপালন করে। এইসব বুগিয়ালকে চারণভূমি বলে। সাধারণত ১২০০০ ফুটের অধিক উচ্চতায় এইসব বুগিয়াল তুষারাচ্ছাদিত থাকে। শীতের আগমনের সাথে সাথে মেষপালকগণ তাদের পশুর দল নিয়ে নীচের চারণভূমিতে নেমে আসে। নীচের চারণভূমিতে গাছপালা দেখো যায়। এই সকল চারণভূমি বুগিয়ালের পর্যায়ে পড়ে না। আবার অনেক বুগিয়াল আছে যেগুলিকে চারণভূমি বলা যায় না। এইসকল বুগিয়াল ১৪০০০ ফুটের অধিক উচ্চতায় অবস্থিত।

নীচের বুগিয়ালগুলিতে সবুজ ঘাসের সাথে নানা রঙ-বেরঙের ফুলের বাহার দেখা যায়। এইসকল বুগিয়াল প্রকৃতি প্রেমিক পর্যটকদের বড়ই প্রিয়। ট্রেকিং অথবা পর্বতাভিযানের পথে অভিযাত্রীগণ এইসব বুগিয়ালে শিবির স্থাপন করে রাত্রি বাস করে। অধিকাংশ বুগিয়ালে নিকটে বা দূরে কিছু না কিছু জলের উৎস দেখা যায়। নদী, ঝর্ণা, স্রোতস্বিনী অথবা জলাশয় অস্থায়ী অধিবাসীর তৃষ্ণা মেটায়। কোন কোন জলাশয়ে তুষারশুভ্র গিরিশৃঙ্গের প্রতিফলন দেখা যায়।

অধিক উচ্চতায় বুগিয়ালগুলি (১৪০০০ ফুটের অধিক) সবুজের কার্পেটে ঢাকা থাকে না। সেখানে দেখা যায় স্বর্গীয় নন্দন কাননের পুষ্পরাজি ব্রহ্মকমল,

ফেনকমল ও হেমকমল।

বুগিয়ালের শিবির স্থাপনের ব্যাপারে পর্যটককে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়, যেমন - জলের উৎস, নিরাপত্তা, বন্য জন্তুর আক্রমণ, জ্বালানি কাঠের যোগান ইত্যাদি।

আলী (১২০০০ ফুট) ঃ রূপকুণ্ডের পথে বেদনীর প্রবেশ দ্বারে আলীর অবস্থিতি। বনরেখা যেখানে শেষ ঠিক সেখানেই আলীর শুরু। আলী পুষ্পালঙ্কারে সুশোভিতা, সে সর্বদাই শুচিস্মিতা। তার বুকে অমৃতধারা। পুষ্পমাল্য হাতে. সুকোমল স্পর্শে সে পর্যটককে বরণ করে। রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় সে স্বর্গে অপ্সরাকেও হার মানায়। আলীর বাসর ঘরে রাতকাটাতে পর্যটকের বড় সাধ। পথের সাথী বেদনীতে গিয়ে শিবির স্থাপনে আগ্রহী। আলীতে জলের উৎস অনেকটা নীচে তাই শিবির স্থাপনে তাদের অনীহা।

বেদনী (১২৮০০ ফুট) ঃ রূপকুণ্ডের পথে ত্রিশূল, নন্দাকোট, হাতি ইত্যাদ অসংখ্য তুষারশুভ্র পর্বত শৃঙ্গের সন্দর্শনে সবুজের কার্পেটে মোড়া সুবিশাল প্রান্তর। পর্যটকগণ রূপকুণ্ডের পথে দ্বিতীয় দিনে বেদনীতে এসে যাত্রার বিরতি টানে। বেদনীতে বসে নির্মল আকাশের নীচে ত্রিশূল, নন্দাকোট, হাতি ইত্যাদি তুষারশুভ্র শৃংগগুলিকে ছবির মতো দেখায়। কথিত আছে মা নন্দাদেবী শ্বশুরালয়ের পথে এইখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। শঙ্কর ভগবান মায়ের স্নানের জন্য এখানে একটি কুণ্ডের সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে ঐ কুণ্ড বেদনীকুণ্ড নামে খ্যাতিলাভ করে। মহর্ষি বেদব্যাস এইখানে বসে বেদ রচনা করেন। তাঁরই স্মৃতিতে এই স্থানের নাম বেদ-বুগিয়াল, পরবর্তীকালে বেদনী-বুগিয়াল।

বগুয়াবাসা (১৪০০০ ফুট) ঃ সবুজের গালিচা না থাকলেও ব্রহ্মকমল ও ফেনকমলের গালিচা পর্যটকের মনে আনন্দের শিহরণ জাগায়। রূপকুণ্ডের পথে পর্যটকের তৃতীয় রাতের বিশ্রাম।

ভূজখর্ক (১২৫০০ ফুট) ঃ কেদারতালের পথে প্রথম রাতের বিশ্রাম। কেদার গঙ্গার তীরে পর্যটকের প্রথম দিনের অস্থায়ী শিবির। রাতের প্রতিবেশী কয়েকশত ভেড়া ও মেষপালক। সুউচ্চ পাহাড়ে হিমালয়ের নিসর্গ

শোভা ও কেদার গঙ্গার সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন। কিভাবে যাবেন — হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে বাস অথবা জীপে গঙ্গোত্রী এসে নামুন। গঙ্গার বুকে লোহার সেতু পেরিয়ে ট্রেকিং পথের শুরু।

কেদারখর্ক (১৪০০০ ফুট)ঃ কেদারতালের পথে দ্বিতীয় দিনের বিশ্রাম স্থল। সবুজ সুমসৃণ গালিচায় ঢাকা প্রান্তর। থ্যালাইসাগর, মান্দা ও ভৃগু পথের সান্নিধ্যে রাত্রিযাপন। অধিক উচ্চতায় প্রকৃতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে একাধিক দিনের বিশ্রাম।সবুজ প্রান্তরে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পর্যটকের জলের সমস্যা মিটায়।

দয়ারা ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা উত্তরকাশী, সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা৩০৪৮ মি। রূপে সৌন্দর্যে ও আয়তনে প্রকৃতির কোলে দয়ারা বুগিয়াল অদ্বিতীয়া। সবুজের কার্পেট পাতা সুবিশাল আঙ্গিনায় এক প্রান্তে স্বচ্ছ সুপেয় সরোবর বুগিয়ালের অন্যতম আকর্ষণ। সরোবরের তীরে শিবির স্থাপন করে রাত্রিবাস স্বর্গীয় আনন্দকেও হার মানায়। শীতকালে ২৮ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট স্থান তুষার গালিচায় ঢাকা পড়ে। দয়ারা বুগিয়ালের এক আঁকর্ষণ স্কি-স্লোপ। হিমালয়ের তুষারশুভ্র মধুর মূর্তি বুগিয়াল থেকে দৃশ্যমান। দায়রা বুগিয়াল সকল পর্যটকের জন্যই উন্মুক্ত।.কিভাবে যাবেন - উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রীর পথে ২৮ কিমি দুরে ভাটোয়ারী। ভাটোয়ারীতে পথ দ্বিধাবিভক্ত। বাঁহাতি পথ গিয়েছে বাসুর। বাসুর থেকে ৮ কিমি ট্রেক। দয়ারা বুগিয়াল থেকে ২২ কিমি ট্রেক ডোডিতাল। সে পথ অরণ্যশোভিত।

শার্তোলি ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা চামোলী। কুয়ারী গিরিবর্ত্মের পথে শর্তোলি। পালনা থেকে চারণভূমি। চারিদিকে জঙ্গলের প্রাচীর ঘেরা। চারণভূমির বুকে মেষপালকের পায়েচলা চিহ্ন। ডাইনে বাঁয়ে মেষপালকের ভগ্নপ্রায় ছানি। এক প্রান্তে অতিক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। শিবির স্থাপনের অপূর্ব পরিবেশ। সংজ্ঞা অনুসারে শার্তোলি বুগিয়ালের পর্যায়ে পড়ে না। কিভাবে যাবেন- হরিদ্বার কিম্বা ঋষিকেশ থেকে চামোলী এসে যাত্রার বিরতি টানুন। চামোলীতে হোটেল ও লজ পাবেন। পরদিন জীপে বিরোহীর আঁচল ধরে নিজমুলা এসে নামুন। নিজমুলা

থেকে ট্রেকিং পথের শুরু।

ডাকোয়ানী (১০৫০০ ফুট) ঃ কুয়ারীর পথে ডাকোয়ানী বুগিয়াল। কুয়ারী যাত্রীর শিবির স্থাপনের অস্থায়ী আস্তানা কুয়ারী গিরিবর্ত্মের প্রথম সোপান। কিভাবে যাবেন - চামোলী থেকে জীপে নিজমুলা। নিজমুলা থেকে ট্রেকিং শুরু। কুয়ারী জয়ের প্রথম সোপান ডাকোয়ানী।

খুলারা (১০৫০০ ফুট) ঃ কুয়ারী জয়ের পর বুগিয়ালে শিবির স্থাপন ও রাত্রিবাস। শিবির প্রাঙ্গণে কুয়ারী জয়ের বিজয়োৎসব পালিত হয়। খুলাবার পরিবেশ দায়ারা বুগিয়ালকেও হার মানায়। চারণভূমির দক্ষিণ প্রান্তে সুগভীর অরণ্য। রডডেনড্রন, কনিফার, পাইন ইত্যাদি অরণ্যের শ্রীবৃদ্ধি করে। উপরদিকে হাতি, ঘোড়ি, দুনাগিরি, নন্দাদেবী, ত্রিশূল ইত্যাদি। তুষারময় শৃঙ্গগুলি সন্দর্শনে পর্যটক আনন্দে নৃত্য করে। সুবিশাল আঙ্গিনায় সবুজ কার্পেট পাতা বুগিয়াল। বুগিয়ালের বুকে কুলু কুলু নূপুর নিক্কণে প্রবাহমানা স্রোতস্বিনী।

দেউলী ঃ কে জানে দেউলীর কথা? সে তো পঞ্চপাণ্ডবদের যুগ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ বেরিয়েছেন শিবজীর দর্শনে। নগাধিরাজ গিরিরাজ থাকেন হিমালয়ে। গুপ্তকাশীতে (১৪৭৪মি) শিবজী আত্মগোপন করেন। হিমালয়ের গোপন অন্তঃপুর কেদারখণ্ডে এসে তিনি আশ্রয় নেন। সত্য-নিষ্ঠ পাণ্ডবগণ মহাদেবের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সুচতুর পাণ্ডবগণ হিমালয়ের দুর্গম পথে কেদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, প্রকৃতি-রানী পাণ্ডবদের যাত্রাপথে আঁচল বিছিয়ে দেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সবুজের গালিচাপাতা আঙ্গিনা দেউলীতে (২৮৭০মি) এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। চারিদিকে পাহাড় জঙ্গলে ঢাকা দেউলী, প্রকৃতির আনন্দধারায় অবগাহন করে দেউলীর কোলে প্রথম রাতের বিশ্রাম। কিভাবে যাবেন হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে বাসে গুপ্তকাশী এসে প্রথম রাতের বিশ্রাম। পরদিন প্রাতরাশ সেরে জীপে কালীমঠ, কোটমা হয়ে খুন্নু থেকে ট্রেকিং শুরু।

ছিপি, ধনেজু, বহুজাতিয়া ইত্যাদি ঃ বুগিয়াল সাধারণ তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের নিকট তেমন পরিচিত নয়। এপথে কেউই যাতায়াত করে না। এ

বড় প্রাচীন পথ, পাণ্ডবগণ এপথেই কেদারখণ্ডে গিয়েছিলেন, তাদের বিশ্রামের জন্য প্রকৃতি-রানী চলার পথে বুগিয়ালের সৃষ্টি করেন। প্রতিটি বুগিয়ালের পরিপাটি অতি চমৎকার। সুমসৃণ কার্পেট বিছানো প্রান্তর। দুই একজন মেষপালক ও জড়িবুটি সংগ্রহকারী লোক এপথে মাঝে মাঝে চলাফেরা করে। কিভাবে যাবেন? হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে বাস অথবা জীপে গুপ্তকাশী। প্রথম রাতের বিশ্রাম। পরদিন জীপে কোটমা হয়ে খুন্নু (১৫৮০মি) লালা জিতার সিংয়ের দোকানে চা-পান, মধ্যাহ্ন আহার, নৈশ আহার ও রাতের বিশ্রাম। খুন্নু থেকেই পথের সাথী গাইড ও পোর্টার সংগ্রহ করাই সুবিধা। খুন্নুতে এলেই কোটিমায়েশ্বরী ও রুচ্ মহাদেবের দর্শন মেলে। কালীগঙ্গা, মধুগঙ্গা ও গুপ্তগঙ্গার ত্রিবেণী সঙ্গমে মায়ের অবস্থান। আধ কিমি ট্রেকিং করে মায়ের আশীর্বাদ নিতে ভুলবেন না।

তাল

কেদারতাল ঃ সুউচ্চ পর্বত শিখরে স্বচ্ছ সুপেয় সরোবর। কথিত আছে শঙ্কর ভগবান অর্থাৎ বাবা কেদারনাথ এই সরোবরে স্নান করেন, তাঁরই নামানুসারে সরোবরের নাম কেদারতাল। রাজ্য-উত্তরাঞ্চল, জেলা উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী এলাকা। উচ্চতা-১৬৬২০ ফুট। থ্যালাইসাগর ও যোগিন ১,২,৩ পর্বত শিখরের বেসক্যাম্প। গঙ্গোত্রী থেকে ট্রেকিং পথের শুরু। গঙ্গার বুকে সেতু পেরিয়ে ডানহাতে গঙ্গালজ, আরও কয়েক-পা এগিয়ে কেদার গঙ্গার বুকে লোহার পুল, পুল পেরিয়ে সম্মুখে নিরীক্ষণ ভবন। নিরীক্ষণ ভবনকে বাঁহাতে রেখে সামান্য এগিয়ে পথ গিয়েছে পাহাড়ের মাথায়। ওটাই কেদার তালের পথ। অরণ্য শোভিত সে পথ, বার বার পিছনে ফিরে থাকাই, গঙ্গেত্রীকে প্রণতি জানাই, দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। ওঁ নমঃ শিবায় নম মন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে পথ চলি। পথের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য সর্বদাই মনে শিহরণ জাগায়।

৫ কিমি চড়াই পথ অতিক্রম করে ভুজখর্ক (১২৫০০')। চারিদিক খোলা গোলাকৃতি টিনের আচ্ছাদনের নীচে পর্যটকের বিশ্রাম স্থল। ভুজখর্কে তাঁবুর ঘরে প্রথম রাতের বিশ্রাম। রাতের প্রতিবেশী কয়েক হাজার ভেড়া ও মেষপালক। দ্বিতীয়দিন প্রাতরাশের পর যাত্রা শুরু। ৫ কিমি প্রাণান্তকর চড়াই অতিক্রম করে সবুজের কার্পেট পাতা আঙ্গি"। কেদারখর্ক (১৪৫০০') পৌছাই। প্রকৃতির কোলে তাঁবুর ঘরে দ্বিতীয় রাতের বিশ্রাম। শুভ্র উষ্ণীষ ধারী শৈলশিখর থ্যালাইসাগর ও যোগীনের সন্দর্শনে নিশাবসান।

তৃতীয় দিনে ৬ কিমি ট্রেক কেদারতাল, তালে পৌছে ধ্যান মৌন গিরিরাজকে প্রণতি জানাই। তালে থ্যালাইসাগরের প্রতিফলন দেখে আনন্দে আত্মহারা হই। তাল সংলগ্ন সমতল প্রান্তরে তাঁবুর ঘরে রাত্রিবাস।

কোদারতালের প্রাকৃতিক ও অধ্যাত্ম পরিবেশ প্রাণময় ও রূপময়। সায়াহ্নে প্রকৃতি আবির রঙে মাতে, পূর্বদিগন্তে চন্দ্রিমা নগধিরাদের সন্ধ্যাবন্দনায় স্বর্ণ প্রদীপ প্রজ্বলিত করে। চতুর্দিকে সুউচ্চ পর্বতমালা এক একটি ধ্যানমৌন ঋষিকুমার।

শুভ্র বসনে দেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে। অনিন্দ্যসুন্দরী রূপময়ী প্রকৃতির কোলে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

কি ভাবে যাবেন ঃ ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকেই আসুন ট্রেনে হরিদ্বার এসে নামুন। হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে বাস, ট্যাক্সি, চেপে গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীতে এক দিন বিশ্রাম। পথের সাথী মালবাহক ও পথপ্রদর্শক গঙ্গোত্রী থেকেই সংগ্রহ করে নেওয়া উচিত।

কোথায় থাকবেন ঃ থাকার জন্য গঙ্গোত্রীতে অসংখ্য ধরমশালা, হোটেল ও লজ পাবেন।

ডোডিতাল ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা উত্তরকাশী। উচ্চতা-৩৩০৭মিঃ। অপর নাম গণেশ জন্মভূমি। কথিত আছে গণেশজী পার্বতীর মাস (গায়ের ময়লা) থেকে সৃষ্টি। গণেশজীর সৃষ্টি বিষয়ে দ্বিমত প্রচলিত। কারো মতে গণেশের উৎপত্তিস্থল ডোডিতাল আবার কারো মতে গৌরীকুণ্ড। ডোডিতাল উত্তরকাশী থেকে ৩৯ কিমি। জীপে কল্যাণী, ১৪ কিমি। কল্যাণী থেকে ২৫ কিমি ট্রেক। প্রথম দিন ৬ কিমি ট্রেক করে আগোড়া গ্রামের প্রাইভেট লজে অথবা ৮ কিমি গিয়ে ডেবরাতে কেবল সিংয়ের হোটেলে রাত্রিবাস।

দ্বিতীয় দিন ১৭ কিমি ট্রেক, পথ বন্ধুর নয়, সুগভীর অরণ্য শোভিত। পথে অনেক ছানি মিলতে পারে। গুজ্জরদের ছানিতে দুধ, ছানা ও মাখন পেতে পারেন। ডোডিতালে রাত্রিবাস। স্বর্গীয় সুষমা মিশ্রিত অরণ্য শোভিত পরিবেশ। জলে ট্রাউট মাছের খেলা, তালে মৎস শিকারের ব্যবস্থা আছে। তীরে গণেশ ও দুর্গা মন্দির দর্শনীয়। দলে দুই একজন থাকলে পূজারীর ঘরে আশ্রয় ও আহারের সুযোগ পেতে পারেন। অথবা তাল সংলগ্ন সবুজ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করতে পারেন।

বিছানা পত্র সঙ্গে থাকলে ভগ্নপ্রায় টিনের ছাউনি দেওয়া সরাইতে থাকতে পারেন। মরসুমে তাঁবুর হোটেল বসে।

নচিকেতাতাল ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা উত্তরকাশী। জেলা শহর থেকে দূরত্ব ২৯ কিমি। উত্তরকাশী থেকে বাসে অথবা জীপে ২৬ কিমি দূরে চৌরঙ্গিখাল এসে নামুন। চৌরঙ্গিখাল থেকে সবুজ অরণ্যশোভিত পথে তিন

কিমি ট্রেক। পথ সমতল ও মসৃণ। তালে অসংখ্য ট্রাউটমাছ। পশ্চিম তীরে বিগ্রহহীন উন্মুক্ত মন্দির। রাত্রিযাপনের জন্য অরণ্যশোভিত বুগিয়ালে শিবির স্থাপন করা যায়। অনুমতিপত্র সঙ্গে নিলে বনবিভাগের চমৎকার যাত্রীনিবাসে থাকা যায়। উত্তরকাশী জেলা-বনদপ্তরের অফিস থেকে অনুপতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। তবে দিনে দিনে বেড়িয়ে উত্তরকাশীতে ফিরে আসাই শ্রেয়।

দেউরিয়াতাল ঃ (২৪৩৮মি) রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ২৪৩৮ মি। নিকটতম শহর উখিমঠ। উখিমঠ থেকে ১৪ কিমি পিচঢালা পথে সারিগ্রাম (২৪৩৮মি)। গ্রামে লখপত সিং এর দেউরিয়া যাত্রীনিবাসে রাত কাটাতে পারেন। লখপত নিজেই খাবার সরবরাহ করে। তালের পরিবেশ ও সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। মেঘমুক্ত আকাশে তালে তুষারশুভ্র চৌখাম্বার প্রতিফলন অসাধারণ। তালের তীরে শিবির স্থাপন করে রাত্রিযাপন খুবই উপভোগ্য।

কি ভাবে যাবেন — সারি থেকে ২ কিমি ট্রেক। কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশী। গুপ্তকাশী থেকে বাস কিম্বা জীপে উখিমঠ আসা যায়। আবার রুদ্রপ্রায়াগ থেকেও দুই একটি বাস উখিমঠ হয়ে সরাসরি আসে।

কোথায় থাকবেন --- উখিমঠে ভারত সেবাশ্রম সংঘের যাত্রীনিবাস অতি চমৎকার।

চোরাবালিতাল ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। সমুদ্রতল থেকে ৩৫৮১মিঃ উচ্চতায় হিমালয় মহাতীর্থ কেদারনাথজী। কেদারের মন্দিরের পশ্চাতে মন্দাকিনী নদী। মন্দাকিনীর পরপারে অনধিক চড়াই পথে ২ কিমি ট্রেক। মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম এই সরোবরে বিসর্জন দেওয়া হয়, তাই এর অপর নাম গান্ধীসরোবর। হিমালয়ের কোলে শান্ত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুপেয় সরোবর। প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন তুলনা নেই। তালের তীরে স্বর্গীয় সুষমা মিশ্রিত কার্পেটের গালিচায় শিবির স্থাপন আরও রোমাঞ্চকর। তবে তালের সান্নিধ্য লাভের পর কেদারনাথে ফিরে রাত কাটানোই সুবিধা।

বাসুকীতাল ঃ (৪১৩৫মি) রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। হরিদ্বার কিম্বা ঋষিকেষ থেকে বাস পথে ২১৮ কিমি গৌরীকুণ্ড, রাত্রিবাস। প্রথম দিনের

ট্রেক ১৪ কিমি, গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ, রাত্রিবাস। সারা পথেই মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি-রাণীর হাতছানি, সুউচ্চ জলপ্রপাত ও মন্দাকিনীর সান্নিধ্য। কেদারনাথ (১১৭৫৩ ফুট) থেকে চড়াই পথে ৮ কিমি ট্রেক বাসুকীতাল। সুউচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। তালে চৌখাম্বা পর্বতমালার অপূর্ব প্রতিফলন। তাঁবুর ঘরে রাত্রিবাস অথবা দিনে দিনে তাল ঘুরে কেদার নাথে ফিরে এসে রাতের বিশ্রাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে তালের তীরে ব্রহ্মকমল পেতে পারেন।

বাসুকীতাল ঃ (নন্দনবন) রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা উত্তরকাশী। উত্তরকাশী থেকে বাস বা জীপে ১০৬ কিমি গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রী থেকে ১৮ কিমি ট্রেক গোমুখ। গোমুখ থেকে ডানহাতি ৪ কিমি পথে তপোবন। বাঁহাতি ৬ কিমি পথ নন্দনবন। নন্দনবন থেকে ৬কিমি ট্রেক বাসুকীতাল (৪৮৮০মি) প্রকৃতির বিস্ময়। সাধারণ তীর্থযাত্রীর জন্য এ পথ নয়। এ পথে অভিজ্ঞ গাইড ও পোর্টার সঙ্গে নিতে হয়।

নৈনিতাল ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলাশহর নৈনিতাল। নিকটতম রেলস্টেশন কাঠগুদাম থেকে জীপ ওথবা বাসে নৈনিতাল। শহরের কেন্দ্রস্থলে সুবিশাল তাল (লেক)। লেকে নৌকাবিহার বড়ই রমণীয়। লেকের পশ্চিম তীরে দেবী নৈনিমাতার মন্দির। তালের চতুর্দিকে পিচঢালা পথ। পথের পার্শ্বে সারি সারি বৃহৎ অট্টালিকা। অশ্বারোহণ, নৌকাবিহার, ট্রেকিং নৈনিতালের প্রধান আকর্ষণ। স্নোভিউ (২২৭০মি) পয়েন্ট থেকে তুষারশুভ্র নন্দাদেবীর প্রধান শৃঙ্গ দৃশ্যমান। থাকার জন্য নানা মাপের হোটেল ও লজ আছে।

নওকুচিয়াতাল ঃ (১২১৯মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা নৈনিতাল। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ১২১৯ মি। নৈনিতাল থেকে জীপ অথবা বাসে ১১কিমি দূরে ভাওয়ালী (১৭৯৪মি)। ভাওয়ালী থেকে উৎরাই পথে ভীমতাল ভীমতাল হয়ে নওকুচিয়াতাল। তালের নয়টি কৌণিকবিন্দু তাই নাম হয়েছে নওকুচিয়াতাল। ভীমতাল থেকে নওকুচিয়াতাল বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধা।

ভীমতাল ঃ (১৩৭১)রাজ্য উত্তরাঞ্চল, জেলা নৈনিতাল। নিকটতম রেল স্টেশন কাঠগুদাম,২১ কিমি। হলদুয়ানি থেকে আলমোড়া জাতীয় সড়কের উপর ভাওয়ালী (১৭৯৪মি) অবস্থিত। ভাওয়ালী থেকে ১১ কিমি নৈনিতাল,

১১ কিমি ভীমতাল। আপেল ও নানা প্রকার ফল উৎপাদনের জন্য ভাওয়ালীর খ্যাতি। ভাওয়ালীর জলবায়ু সাস্থ্যপ্রদ। ভাওয়ালী থেকে জীপ অথবা বাসে ভীমতাল বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধা। সারা পথেই নন্দাদেবী দৃশ্যমান। ভাওয়ালীতে থাকার জন্য হোটেল ও লজ পাবেন।

সাততাল ঃ (১৩৭১মি) ভীমতালের অনতিদূরে সাততাল। সাতটি তালের একত্র সমাবেশ। ভীমতাল ও সাততালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কোন তুলনা নেই। জলাভাবে দুই একটি তালের কোন চিহ্ন নেই। থাকার জন্য সর্বত্রই পি.ডব্লু.ডি-র ইনস্পেশন বাংলো, বনবিভাগের বিশ্রামভবন ও টুরিষ্ট রেষ্টহাউস পাবেন।

খুরপাতাল ঃ (১৬৩৫মি) উত্তরাঞ্চল, জেলা-নৈনিতাল। মৎস শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। নৈনিতাল থেকে বেড়িয়ে নেওয়াই সুবিধা। শিকারের জন্য জেলাশাসকের অনুমতিপত্র সঙ্গে নিতে হয়।

তারাকতাল ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা চামেলী। জেলা-শহর চামেলী থেকে ১৯ কিমি জীপে নিজমুলা গ্রাম। নিজমুলা থেকে ৭ কিমি ট্রেক তারাকতাল। প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ। *বঙ্গ মায়ের দামাল ছেলে রবীন ব্যানার্জী পাহাড়ী মানুষের সেবায় দীর্ঘদিন তারাকতালে কাটিয়েছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় তারাকতালে একটি স্কুল বাড়ি নির্মিত হয়েছে। গ্রামের মানুষের কাছে তিনি কখন ডাক্তার,* কখন ব্যানার্জী সাহেব, কখন ভগবান ইত্যাদি নামে পরিচিত। আজ তিনি সেখানে নেই, তাঁর কর্মকাণ্ড তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

গোণাতাল ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা চামোলী। জেলা-শহর চামোলী থেকে জীপে ১৯ কিমি নিজুমলা গ্রাম। নিজুমলা থেকে ৩কিমি কুয়ারীর পথে গোণাতাল। আনুমানিক ১৮৯৫ সালে এক মহা প্রলয়ের ফলে এই তালের সৃষ্টি হয়। পাহাড়ের ধ্বংসস্তূপে নদীর গতিপথ বন্ধ হয়। গভীর জল স্ফীতিতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করে বিশাল জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। নিকটস্থ গোণাগ্রামের নামানুসারে জলাশয়ের নাম হয় গোণাতাল। আনুমানিক ১৯৭০ সালে দ্বিতীয়বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিরোহী তার গতিপথ ফিরে পায়। গোণাতালের রূপ পাল্টে সৃষ্টি হয় সবুজের কার্পেট পাতা সুবিশাল চারণ ভূমি। এখনও নাম আছে তাল, সে তালে জল নেই।

মাসারতাল ঃ খাটলিং গ্লেসিয়ারের (৩৭১ মি) পথে। উত্তরাঞ্চল। জেলা-টেহেরী। নিকটতম বাস স্টেশন ঘুট্টু (১৫২৪মি)। জেলাশহর টেহেরী থেকে বাস অথবা জীপে ঘাংশিয়ালি হয়ে ৬৩ কিমি দূরে ঘুট্টু এসে নামুন। বর্তমানে বাসপথ আরও১০ কিমি এগিয়ে রী-তে গিয়ে থেমেছে। ঘুট্টু থেকে জীপে রী (২১৩২ মি)-তে গিয়ে প্রথম রাতের বিশ্রাম। রী থেকে হাঁটা পথের শুরু। রী-তে পথ দ্বিধাবিভক্ত। বাঁ-হাতে ২০ কিমি ট্রেক সহস্রতাল (৪৫৭২ মি) ডানহাতে মাসারতালের পথ। ১০ কিমি চড়াই পথে গঙ্গি (২৫০০ মি) অথবা আরও ৫ কিমি এগিয়ে কল্যাণী (২৬৮৩ মি)-তে দ্বিতীয় রাতের বিশ্রাম। পরদিন প্রাতরাশ সেরে যাত্রা শুরু। চড়াই পথ। ১৩ কিমি ট্রেক। অপরাহ্ন বেলায় ভেলবাগী (৩১১০মি)-তে তাঁবুর ঘরে তৃতীয় রাতের বিশ্রাম। ৪র্থ দিন প্রাতরাশ সেরে যাত্রা। চড়াই পথে ৭ কিমি ট্রেক করে মাসারতাল (৩৬৭৫ মি)। তালের তীরে প্রকৃতির খেলাঘরে শিবির স্থাপন। ৪র্থ রাতের বিশ্রাম। অপরাহ্ন বেলায় প্রকৃতি ভগবানের সান্নিধ্যে আনন্দধারায় অবগাহন। সম্মুখে খাটলিং হিমবাহের হাতছানি, ধ্যানমৌন গিরিরাজের তুষারশুভ্র জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শনে পথের সকল ক্লান্তি ভুলে যাই। উৎসাহী পর্যটকগণ এপথে বাসুকীতাল (৪১৩৬) হয়ে কেদারনাথ নামতে পারেন।

সহস্রতাল ঃ (৪৫৭২মি) মাসারতালের পথে সহস্রতাল। পূর্বেই বলেছি রী থেকে ২০ কিমি পথ ট্রেক সহস্রতাল। এ পথে অভিজ্ঞ গাইড, তাঁবু, রেশন ও রান্নার সামগ্রী সঙ্গে নিতে হয়।

গিরিতাল ঃ উত্তরাঞ্চল। জেলা-উধমসিংনগর (রুদ্রপুর)। জেলার বৃহত্তম শহর কাশীপুর। কাশীপুর থেকে ২ কিমি দূরত্ব। কাশীপুর-রামনগর জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত। গিরিতাল বনভোজন ও শিবির স্থাপনের অপূর্ব পরিবেশ। নিকটতম রেলস্টেশন মোরাদাবাদ। মোরাদাবাদ থেকে বাস অথবা জীপে কাশীপুর ৫৮ কিমি। কাশীপুর শিল্প নগরী। রাত্রিবাসের জন্য টুরিষ্ট লজ ও হোটেল পাবেন। অন্যপথে ট্রেনে হলদুয়ানী। হলদুয়ানী থেকে বাস অথবা জীপে ২-৩ ঘন্টায় উধমসিংনগর। সেখান থেকে দেড় ঘন্টায় কাশীপুর। কাশীপুর থেকে তুষারশুভ্র ত্রিশূলকে ছবির মতো দেখায়।

দ্রোণাতাল ঃ (উচ্চতা ৫০০মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা উধমসিংনগর। জেলার প্রধান শহর কাশীপুর। উত্তরাঞ্চলের প্রধান শিল্পনগরী কাশীপুর। দ্রোণাতাল এবং গিরিতাল কাশীপুরের অন্যতম আকর্ষণ। পাণ্ডবদের অনেক কাহিনী এই দুই তালের সাথে মিশে আছে। কথিত আছে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য এই তালের তীরে বসে হিমালয় পরিভ্রমণরত পাণ্ডবদের কিছু উপদেশ দেন। সেই থেকে তালের নাম হয় দ্রোণাতাল। মধ্যযুগের কথা, সে সময় কুমায়ুনের শাসনকর্তা ছিলেন চাঁদ বংশীয় রাজন্যবর্গ। কাশীনাথ অধিকারী নামে এক ব্যক্তি রাজার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন কাশীপুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই নামানুসারে শহরের নাম কাশীপুর। বর্তমান যুগে কাশীপুরের অন্যতম শিল্পপতি যোগেশ জিণ্ডাল, যার নাম কেদারখণ্ডের মাটির সাথে মিশে আছে। নূতন গৌরীকুণ্ড নির্মাণে যোগেশ জিণ্ডালের অবদানের কোন তুলনা নেই।

কিভাবে যাবেন ঃ হাওড়া থেকে ৩০১৯ আপ বাঘ এক্সপ্রেস, প্রতিদিন রাত ২১/৪৫ মিনিটে ছাড়ে। তৃতীয় দিন সকাল ৮ টায় কাঠগুদাম পৌঁছায়। কাঠগুদাম থেকে সর্বদাই বাস, ট্যাক্সি পাবেন। কাশীপুর আসার।

শ্যামলাতাল ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা চম্পাবত। নিকটতম রেলস্টেশন টনকপুর। টনকপুর থেকে শ্যামলাতাল ৩০ কিমি। বাস অথবা জীপে ২৬ কিমি, সুখিটাং। সুখিটাং থেকে ৪কিমি ট্রেক। দেড় বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট নির্মল, স্বচ্ছ, নীল জলাধার। শ্যামলাতাল কুমায়ুনের বিস্ময়। শ্যামলাতালের অঙ্গে অঙ্গে রূপের ধারা রসের ধারা। পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। তালের চতুর্দিকে বনকুসুমের হাতছানি। স্বর্গীয় মায়াময় পরিবেশ। থাকার জন্য কে.এম.ভি.এন-এর টুরিষ্ট লজ আছে।

হোমকুণ্ড সাহিব ঃ (৪৩২৯ মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। নিকটতম বাসস্টেশন গোবিন্দঘাট, যোশীমঠ থেকে ২০ কিমি, ৫৮নং জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত। গোবিন্দঘাট থেকে ১৩ কিমি ট্রেক ঘাংগারিয়াতে পথ দ্বিধা বিভক্ত। বাঁহাতি পথে সাড়ে তিন কিমি ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স। ডানহাতি পথে ৬ কিমি ট্রেক হেমকুন্ড সাহিব। স্বচ্ছ সুপেয় সরোবর। সরোবরের তীরে সুবিশাল গুরুদুয়ারা। বিনা মূল্যে চা ও আহার মেলে। রাত্রিবাসের জন্য কম্বল পাবেন

এদের কাছে। সারা পথেই দোকান ও রেস্তোরাঁ। ঘাংগারিয়া এখন চটির শহর। থাকার জন্য হোটেল ও লজ পাবেন।

শতপন্থতাল ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা চামোলী। নিকটতম বাসস্টেশন বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথ থেকে ট্রেক শুরু। সঙ্গে তাঁবু, রান্নাসামগ্রী, রেশন কুলি বা গাইড নিতে হবে। সময়-মধ্য মে থেকে জুন অথবা সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর। প্রাতরাশ সেরে যাত্রা শুরু। পিচ-রাস্তা ধরে ৩ কিমি দূরে মানাগ্রাম। মানা ছাড়িয়ে ডানহাতে বসুধারা। বাঁহাতে অলোকানন্দার বুকে সেতু পেরিয়ে ৮ কিমি গিয়ে বাণধার, প্রথম রাতের বিশ্রাম। পরদিন সাতসকালে শিবির গুটিয়ে প্রাতরাশ সেরে যাত্রা শুরু। চড়াই পথে ৮ কিমি ট্রেক, চক্রতীর্থ, দ্বিতীয় রাতের বিশ্রাম। ছোট বড় অনেক গুহা পাবেন চক্রতীর্থে। তৃতীয় দিন অতি প্রত্যূষে যাত্রা করে ৫ কিমি দূরে সতোপন্থতাল। তাল বেড়িয়ে উৎরাই পথে ১৩ কিমি নেমে বাণধারে তৃতীয় রাতের বিশ্রাম। ৪র্থ দিন বদ্রীনাথ ফিরে রাতের বিশ্রাম ও বিজয়োৎসব।

কাকভুষণ্ডিতাল ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা চামোলী। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ৫২৩০ মি। নিকটতম বাসস্টেশন বদ্রীনাথের পথে গোবিন্দঘাট। নিকটতম শহর যোশীমঠ। গোবিন্দঘাট থেকে পায়ে হাঁটা পথের শুরু। ভিউণ্ডারভ্যালী অতিক্রম করে, লক্ষ্মণ গঙ্গা পেরিয়ে, ভুইন্দরনালার তীর বেয়ে কাকভুষণ্ডিতালের পথ গিয়েছে পাহাড়ের মাথায়।

রূপকুণ্ড ঃ (৫০২৯মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা বাগেশ্বর। নিকটতম রেলস্টেশন হলদুয়ানি। হাওড়া স্টেশনে রাত ৯-১৫মিঃ বাঘ এক্সপ্রেসে চেপে তৃতীয়দিন সকালে হলদুয়ানিতে পৌঁছাই। স্টেশন থেকে পাযে হাঁটা দূরত্বে অনেক হোটেল ও বাস-স্ট্যাণ্ড। গ্রীন হোটেলে রাত্রিবাস ও বাসের অগ্রিম টিকিট বুকিং। আমাদের লক্ষ্য গোয়ালদাম, দূরত্ব২০০কিমি।। বর্তমান বাসপথ আরও ২৯ কিমি এগিয়ে গেছে, লোহাজং পর্যন্ত (২১৩৩মি)। লোহাজং এপথের প্রান্তিক বাসস্টেশন। পরদিন ভোরের প্রথম বাসে চেপে অপরাহ্ন বেলায় গোয়ালদামে পৌছাই। গোয়ালদামে থাকার জন্য কে এম ভি এন-এর টুরিষ্ট লজ ও প্রাইভেট হোটেল পাবেন। পরদিন বাস অথবা জীপে লোহাজাং। লোহাজাং থেকে হাঁটা

পথের শুরু। সঙ্গে তাঁবু, রেশন ও রান্নাসামগ্রী অবশ্যই থাকা চাই। পূর্বে গোয়ালদাম (৬৫০০ ফুট) থেকে হাঁটাপথে দেবল (৪২২৬ ফুট) ও মানদোলি (২১৩৪ মি) অতিক্রম করতে হত। দেবল বর্দ্ধিষ্ণুগ্রাম। হাসপাতাল, দোকান ও হোটেল আছে।

লোহাজাং থেকে চড়াই পথে ১২ কিমি ট্রেক ওয়ান (২৪৩৬)। ওয়ানে কে.এম. ভি. এন-এর টুরিষ্ট লজ অথবা তাঁবুর ঘরে প্রথম রাতের বিশ্রাম। পরদিন অতিপ্রত্যুষে প্রাতরাশ সেরে যাত্রা। চড়াই পথে ১২ কিমি ট্রেক, বুগিয়াল (৩৩৫৪ মি)। বেদিনিকুণ্ডের তীরে শিবির স্থাপন। স্বর্গীয় পরিবেশ। দ্বিতীয় রাতের বিশ্রাম। পরদিন প্রাতরাশের পর যাত্রা শুরু। চড়াই উৎরাই পথে ১২ কিমি ট্রেক করে বগুয়াবাসা (৩৩৫৪ মি)। পথে ঐতিহাসিক পাতরনাচুনি ও কৈলুবিনয়ক গণেশজীর দর্শন নিয়ে অপরাহ্ন বেলায় বগুয়াবাসায় পৌঁছাই। উপলখণ্ডে সাজানো প্রকৃতির বাসর ঘরে তৃতীয় দিনের বিশ্রাম। বগুয়াবাসা থেকে ৫ কিমি চড়াই পথে রহস্যময়ী রূপকুণ্ড (৫০২৯ মি)।

হোমকুণ্ডঃ (৪০৬১মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা বাগেশ্বর। রূপকুণ্ড এবং হোমকুণ্ড সাধারণ তীর্থযাত্রীর জন্য নয়। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হিমালয় প্রেমীদের জন্য এ পথ। একই পথে উভয় তালের সন্ধানে যাত্রা। উৎসাহী পর্যটকগণ একই যাত্রায় উভয় তাল বেড়িয়ে নিতে পারেন। নিকটতম রেলষ্টেশন হলদুয়ানী, নিকটতম বাসস্টেশন গোয়ালদাম হয়ে লোহাজাং। লোহাজাং থেকে হাঁটা পথের শুরু।

দেবীকুণ্ডঃ উত্তরাঞ্চল। জেলা বাগেশ্বর। সুন্দরডুঙ্গা ভ্যালী। নিকটতম রেলস্টেশন হলদুয়ানী। প্রান্তিক বাসস্টেশন সঙ। বর্তমানে সঙ থেকে হাঁটা পথের শুরু। শীঘ্রই বাসপথ আরও ৪ কিমি এগিয়ে যাবে পিণ্ডারীর পথে। এপথের শেষ গ্রাম খাতি। খাতিতে পথ দ্বিধাবিভক্ত। সোজাপথ পিণ্ডারীর দিকে এগিয়ে গেছে। বাঁহাতি পথে সুন্দরডুঙ্গা ভ্যালী। সুন্দরডুঙ্গার পথে শেষগ্রাম জাতোলী। খাতি থেকে জাতোলি ৭ কিমি। এপথে পোর্টার ও গাইড অবশ্যই সঙ্গে নিতে হয়। তাঁবু, রেশন এ রান্নার সামগ্রী সঙ্গে নিলে ভাল। গাইড রূপসিং-এর বাড়ি জাতোলী গ্রামে।

ডাললেক শ্রীনগর ঃ (১৭৩০মি) রাজ্য-কাশ্মীর। শহরের কেন্দ্রস্থলে লেকের অবস্থিতি। রূপে, গুণে, সৌন্দর্যে, আয়তনে ডাললেকের কোন তুলনা নেই। ডাল, নাগিন, আনচার প্রভৃতি লেক কাশ্মীরের অলংকার। ডাললেকে হাউসবোটে চিত্তবিনোদন কিম্বা মধুচন্দ্রিমা যাপন, পর্যটকের কাশ্মীর ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিটি হাউসবোটে অ্যাটাচড বাথরুম, দুই থেকে চারটি বেডরুম, কমন সিটিং রুম এবং একটি ডাইনিংরুম থাকে। ডাললেকের হাউসবোট গুলিতে যাতায়াতের জন্য শিকারা অর্থাৎ ছোট নৌকা ব্যবহার করতে হয়। চার্জের সাথে হাউস বোটে থাকা, খাওয়া, শিকারার ভাড়া সবকিছুই ধরা থাকে। লেকের ভাসমান নৌকায় দোকান, বাজার, ডাক্তার, বেকারি ইত্যাদি সবকিছুই মেলে। শ্রীনগরের সৌন্দর্যের কোষাগার নিশাতবাগ, শিকারায় চেপে যাওয়া যায়।

মণিমহেশ ঃ (১৩,৫০০ ফুট) হিমাচল প্রদেশ। জেলা চাম্বা। স্বচ্ছ-সুপেয় সরোবর। চতুর্দিকে সান বাঁধানো চাতাল। চাতালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতীক দেবতা জ্ঞানে পূজিত। তালে তুষার শুভ্র মণিমহেশ শৃঙ্গের প্রতিফলন। নিকটতম রেলস্টেশন পাঠানকোট। পাঠানকোট থেকে বাসে জেলাশহর চাম্বা হয়ে ভারমৌর। ভারমৌর রূপে, গুণে, সৌন্দর্যে ভারতের সুইজারল্যাণ্ড। আপেল ও মধু উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারমৌর থেকে ১০ কিমি বাসে বা জীপে হাড়সার। হাড়সার থেকে চড়াইপথে ১৫ কিমি ট্রেক। ৭কিমি অতিক্রম করে ধানছৌতে প্রথম রাতের বিশ্রাম। সঙ্গে তাঁবু থাকলে ভাল অন্যথায় টিনের সরাইখানা। মণিমহেশে কোন দেবতা বা বিগ্রহ নেই। শিবের ত্রিশূল আছে।

বেদনীকুণ্ড ঃ (১২০০০ ফুট) রূপকুণ্ডের পথে বৈদনীবুগিয়াল (১২০০০ ফুট) বুগিয়ালের প্রাণকেন্দ্র বেদনীকুণ্ড। কুণ্ডের চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমি, নরম সবুজের গালিচা। নীলগঙ্গা নাম নিয়ে ধারায় ধারায় বয়ে চলে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। তীরে এসে দাঁড়ালে সকল ক্লান্তির অবসান হয়। তীরে ছোট্ট মন্দিরে নন্দামায়ের মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। নন্দাষ্টমীর দিন মাতৃভক্ত গাড়োয়াল-কুমায়ুনবাসী শোভাযাত্রা সহকারে কুণ্ডের তীরে উপস্থিত হন। এই যাত্রার নাম ছোট নন্দাজাত যাত্রা।

হিমালয়ের মন্দির

কেদারনাথ মন্দির ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রায়াগ। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ৩৫৮১মি। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পঞ্চকেদারের প্রথম কেদার। গাড়োয়ালের শ্রেষ্ঠতম তীর্থমন্দির। কথিত আছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ মহাদেবের দর্শন প্রার্থী হয়ে গাড়োয়ালে আসেন। দর্শন দিতে অনিচ্ছুক মহাদেব মহিষরূপ ধারণ করেন। মহিষরূপী মহাদেব পাতাল-প্রবেশে উদ্যত হন। পাণ্ডবগণ সেই মুহূর্তে মহিষের পশ্চাতার্ধ জাপটে ধরেন। মহাদেব শিলারূপ ধারণ করেন। পাণ্ডবগণ ঐ শিলা মূর্তির উপর মন্দির নির্মাণ করে মহাদেবের পূজাপাঠ আরম্ভ করেন। গর্ভ মন্দিরে মহিষরূপী মহাদেবের পশ্চাতার্ধ প্রকাশিত। মে থেকে অক্টোবর ছয়মাস মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ছয়মাস সমগ্র আঙ্গিনা বরফে ঢাকা থাকে। প্রান্তিক বাস স্টেশন গৌরীকুণ্ড। নিকটতম রেলস্টেশন হরিদ্বার, ঋষিকেশ ও দেরাদুন। গৌরীকুণ্ড থেকে ১৪ কিমি ট্রেক। পথে ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও পোর্টার মেলে। রাত্রিবাসের জন্য সর্বত্রই হোটেল, ধর্মশালা ও লজ আছে।

কিভাবে যাবেন ঃ- ট্রেনে হরিদ্বার এসে নামুন। হরিদ্বার থেকে বাস অথবা ট্যাক্সিতে গৌরীকুণ্ড, সময় লাগে ৮ ঘন্টা। থাকার জন্য শিবলোক, দেবলোক, পাঞ্জাব সিন্ধ ইত্যাদি হোটেল ও লজ পাবেন।

ত্রিযুগীনারায়ণ ঃ- (১৯৮০মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রায়াগ। নিকটতম রেলস্টেশন ঋষিকেশ কিম্বা দেরাদুন। প্রান্তিক বাস স্টেশন সোনপ্রয়াগ থেকে ৬ কিমি ট্রেক অথবা গৌরীকুণ্ড থেকে ৮ কিমি যেতে হত। বর্তমানে বাসপথ ত্রিযুগী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাসপথে ১৪ কিমি। প্যাগোডা ধরণের মন্দির। কথিত আছে সত্যযুগে শিব ও দুর্গার বিবাহ হয়েছিল এইখানে। সমস্ত ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন বিবাহ বাসরে। তাঁদের স্নানের জন্য আঙ্গিনায় কয়েকটি কুণ্ড আছে। রুদ্রকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, এবং ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত দেবতাগণ স্নান করেন। বিবাহযজ্ঞের হোমাগ্নি তিন যুগ ধরে আজিও প্রজ্জ্বলিত। যজ্ঞে কাষ্ঠ প্রদানের

বিধি প্রচলিত। বিবাহের পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ। মন্দিরের বিগ্রহও নারায়ণ মূর্তি।

মদমহেশ্বর ঃ (৩২৮৯ মি) পঞ্চকেদারের দ্বিতীয় কেদার। পুরাণে কথিত আছে মদমহেশ্বরে মহাদেবের নাভি প্রকাশিত। গর্ভমন্দিরের লিঙ্গমূর্তি। নিকটতম শহর গুপ্তকাশী ও উখিমঠ। কালীমঠ থেকে ৩০ কিমি ট্রেক। কালীমঠে থাকার জন্য ধর্মশালা আছে। ট্রেকিং পথে লেঙ্ক, গৌণ্ডার, রাঁশু, বানতৌলী ও নানু প্রভৃতি স্থানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। মন্দির আঙ্গিনা সবুজ কার্পেটে ঢাকা। মদমহেশ্বরের মন্দিরে কমিটির কাঠের দোতালা যাত্রীনিবাস। যাত্রীনিবাসে লেপ-কম্বল মেলে। ১ কিমি উপরে বৃদ্ধ মদমহেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের পূজারী দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ। শীতকালে মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। বিগ্রহ শোভা যাত্রা সহকারে উখিমঠে নামিয়ে আনা হয়।

তুঙ্গনাথ ঃ (৩৬৮০মি) পঞ্চকেদারের তৃতীয় কেদার। গাড়োয়ালের সর্বোচ্চ তীর্থমন্দির। প্রাচীন কাহিনী অনুসারে তুঙ্গনাথে মহাদেবের বাহু প্রকাশিত। নিকটতম বাসস্টেশন চোপ্তা। চোপ্তা থেকে চড়াই পথে সাড়ে ৩ কিমি ট্রেক। মরসুমে সারাপথেই রডডেনড্রনের সমারোহ। থাকার জন্য চোপ্তায় মঙ্গল সিং-এর-চটির হোটেল, তুঙ্গনাথে বিক্রমের হোটেল। তুঙ্গনাথ থেকে তুষারশুভ্র চৌখাম্বা ছবির মত দেখায়।

চন্দ্রশিলা ঃ (১৪০০০ ফুট) তুঙ্গনাথ থেকে ১ কিমি উপরে চন্দ্রশিলা। কথিত আছে চন্দ্রশিলায় বসে রামচন্দ্র তপস্যা করতেন। চারিদিকের পাহাড়গুলি এক একটি ধ্যানমৌন ঋষি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। চন্দ্রশিলা থেকে চৌখাম্বাকে আরও নিকটে মনে হয়।

রুদ্রনাথ গুহামন্দির ঃ (১১৬৭০ ফুট) উত্তরাঞ্চল। জেলা চামোলী। জেলাশহর গোপেশ্বর। নিকটতম বাসস্টেশন সাগর। গোপেশ্বর থেকে ৪ কিমি সাগর। সাগর থেকে চড়াই পথে ১৭ কিমি ট্রেক। ৮ কিমি গিয়ে মাঝপথে পানারের গুল্ফা অথবা শিবির স্থাপন করে রাতের বিশ্রাম। থাকার জন্য পূজারীর সান্নিধ্যে মন্দির সংলগ্ন বিশ্রাম গৃহ। রুদ্রনাথ থেকে চৌখাম্বা, ত্রিশূল, নন্দাদেবী,

দ্রোণগিরি, নীলকণ্ঠ প্রবৃতি শৃঙ্গগুলি দৃশ্যমান। পাণ্ডবদের দর্শন দিতে অনিচ্ছুক মহাদেব বৃষরূপ ধারণ করেন। রুদ্রনাথে মহাদেবের রুদ্র আনন প্রকাশিত।

কল্পেশ্বর গুহামন্দির ঃ (৮০০০ ফুট) উত্তরাঞ্চল। জেলা-চামোলী। নিকটতম বাসস্টেশন বদ্রীনাথের পথে হেলাং। হেলাং থেকে ৯ কিমি ট্রেক। কল্পগঙ্গার তীরে গুহামন্দির। গর্ভমন্দিরে মহাদেবের জটা প্রকাশিত। পথ বন্ধুর নয়। মন্দির দর্শন করে উর্গম গ্রামে পথিক লজে রাত্রিবাস।

কোটেশ্বর মন্দির ঃ উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রয়াগ। গুহামন্দির। অলোকানন্দার তীরে অবস্থিত। জেলাশহর থেকে ৩মি। কথিত আছে কেদার পথে শিবজী এইখানে কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন। প্রতি বছর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কোটেশ্বর মেলা বসে। ঐ সময় গাড়োয়ালের নানাপ্রান্ত থেকে শিবভক্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ কোটেশ্বরে সমাবেত হন।

অগস্ত্যেশ্বর মহাদেব মন্দির ঃ (১০০০মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রায়াগ। জেলাশহর রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বাসপথে ১৮ কিমি দূরে মন্দাকিনীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে ঋষি অগস্ত্যমুনি মন্দাকিনীর তীরে একসময়ে বসে তপস্যা করেছিলেন। সেই স্মৃতিতে মন্দিরের নাম রাখা হয়েছে অগস্ত্যেশ্বর মহাদেব। গর্ভমন্দিরে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি। মন্দির গাত্রে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত। প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমায় মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত প্রাণ মানুষ দেবতাকে শ্রদ্ধা জানাতে এখানে উপস্থিত হন। থাকার জন্য বনবিশ্রাম ভবন ও প্রাইভেট হোটেল পাবেন।

অর্দ্ধনরেশ্বর মন্দির গুপ্তকাশী ঃ (১৩১৯মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রায়াগ। কাশীর ন্যায় গুপ্তকাশীর গুরুত্ব সমধিক। প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দির, অর্দ্ধনরেশ্বর মন্দির, এবং মণিকর্ণিকা কুণ্ড গুপ্তকাশীর বিশেষ আকর্ষণ। গুপ্তকাশী থেকে বাস, জীপ ও ট্যাক্সিতে গাড়োয়ালের সর্বত্র যাতায়াত করা যায়। থাকার জন্য টুরিষ্ট লজ ও প্রাইভেট হোটেল পাবেন।

কালীমঠ মন্দির ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা রুদ্রপ্রায়াগ। সরস্বতী

গঙ্গার তীরে অবস্থিত। সিদ্ধপীঠ। ত্রেতাযুগে দেবীদুর্গা কালীমঠে মহাকালী শক্তি নিয়ে প্রকট হন। এইখানে মা রক্তবীজ নামক অসুরকে বধ করেন। অসুর বধের পর মা প্রস্তর রূপে পাতালে অবস্থান করেন। মা যে পথে পাতালে প্রবেশ করেন সেই সুড়ঙ্গ মুখে একটি রৌপ্য নির্মিত ঢাকনা আছে। ঐ ঢাকনার উপর সারাবছর মায়ের পূজা হয়। মায়ের প্রস্তর মূর্তি দর্শন নিষিদ্ধ। ঐ ঢাকনা সরিয়ে কেউ মায়ের মূর্তি দর্শনের চেষ্টা করেন তবে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। অতীতে এধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায় কেহই আর মায়ের মুর্তি দর্শনের ঝুঁকি নেন না। প্রতি বছর মহাষ্টমী পূজার দিন গভীর রাতে সমস্ত আলো নিভিয়ে পূজারী চোখবাঁধা অবস্থায় ঐ সুড়ঙ্গ পরিস্কার করেন। বছরে মাত্র একটি দিন। মন্দিরে ছোট ছোট নানান দেবদেবীর মূর্তি দর্শনীয়। গুপ্তকাশী থেকে ৪ কিমি বাস বা জীপ। থাকার জন্য মন্দির কমিটির ধর্মশালা আছে। মদমহেশ্বরের পথের কুলি, ঘোড়া, ডাণ্ডি কালীমঠ থেকে সংগ্রহ করা যায়।

কার্তিকস্বামী মন্দির ঃ (রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ৩৮ কিমি, বাস অথবা জীপ পাবেন। নিকটতম বাসস্টেশন কনকচৌরি। রুদ্রপ্রয়াগ-পকরি বাসরুটের উপর অবস্থিত। কনকচৌরি থেকে ৩ কিমি ট্রেক। নূতন ট্রেকার্সদের খুবই ভাল লাগবে। অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে অযত্নে রক্ষিত মন্দির। পর্যটক আকর্ষণের জন্য মন্দির সংস্কারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মন্দিরের বিগ্রহ মহাদেবের পুত্র কার্তিকের মূর্তি। উৎসাহী পর্যটকগণ আপন উদ্যোগে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। দিনে দিনে বেড়িয়ে রুদ্রপ্রয়াগ এসে রাত্রি বাস করাই শ্রেয়।

রাকেশ্বরী মাতার মন্দির, রাঁশু ঃ (৬৫০০ ফুট) মদমহেশ্বরের পথে। উখিমঠ থেকে জীপে উনিয়ানা গ্রাম। উনিয়ানা থেকে ২ কিমি হাঁটা পথে রাকেশ্বরী মাতার মন্দির। কালীমঠ থেকে ট্রেকিং পথে ১৪ কিমি। বহু প্রাচীন কালের মন্দির। পাহাড়ী গ্রাম। গ্রামে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান পাবেন। থাকার জন্য পঞ্চায়েতের অতিথিশালা আছে। অথবা প্রয়াত পূজারী জনার্দন ভট মহাশয়ের যাত্রীনিবাস। যাত্রীনিবাসে পারিবারিক অতিথেয়তা মিলবে। হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকে বাসে কিংবা জীপে উখিমঠ। উখিমঠ থেকে সর্বদাই

জীপ পাবেন উনিয়ানা আসার।

বিশ্বনাথ মন্দির উত্তরকাশী ঃ (১১৫৮মি) উত্তরাঞ্চল। জেলা উত্তরকাশী। জেলাশহরের মধ্যমণি বাবা বিশ্বনাথ মন্দির। ভাগীরথী গঙ্গার উভয় তীরে উত্তরকাশীর বিস্তৃতি। ঋষিকেশ থেকে ১৪৫ কিমি। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের আদলে তৈরী। আধ্যত্ম সাধনার পীঠস্থান। ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রীর নিকট মন্দিরের আকর্ষণ সমধিক। পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে উত্তরকাশীর খ্যাতি জগতজোড়া। গঙ্গোত্রীর পথে সকলকেই উত্তরকাশীতে নামতে হয়। থাকার জন্য অসংখ্য হোটেল, লজ ও ধর্মশালা আছে।

গঙ্গোত্রীর গঙ্গামন্দির ঃ (৩০৪৮মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা উত্তরকাশী। বাসপথের প্রান্তিক স্টেশন। উত্তরকাশী থেকে বাস, ট্যাক্সি অথবা জীপে ৯৯ কিমি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোর্খা জেনারেল অমর সিং থাপা এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করান। ভাগীরথী গঙ্গার বামতীরে মন্দিরের অবস্থিতি। শীতকালে অর্থাৎ নভেম্বর-এপ্রিল গঙ্গোত্রীর পাঠ বন্ধ থাকে। থাকার জন্য অসংখ্য হোটেল, লজ ও ধর্মশালা আছে।

শ্রীশ্রী রামমন্দির, অমৃতঘাট, গঙ্গোত্রী ঃ (৩৩০০মি) গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখীর পথে ১.৮ কিমি দূরত্বে শ্রীশ্রী গঙ্গাদাসজী ফলাহারী বাবার মন্দিরের অবস্থিতি। মন্দির আঙ্গিনা বনকুসুমে সুসজ্জিত। আঙ্গিনায় রামলালা, হনুমানজী, রাধাকৃষ্ণ ও গুরুজীর প্রস্তর নির্মিত মূর্তি পর পর চারটি মন্দিরে সুশোভিত। মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের তুষারশুভ্র সুদর্শন শৃঙ্গের হাস্যময় হাতছানি সর্বদাই আকর্ষণ করে। আশ্রমে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে অধ্যাত্ম ভাব অনুভূত হয়। গোমুখ যাতায়াতের পথে আশ্রমের প্রসাদ নিতে ভুলবেন না।

গঙ্গামন্দির, মকুবা ঃ জেলা উত্তরকাশী। নিকটতম বাসস্টেশন ধরালী। গঙ্গার পরপারে মকুবা। গঙ্গামায়ের শীতকালীন আবাসন। শীতকালে গঙ্গোত্রীর চত্বর তুষার গালিচায় ঢাকা পড়ে। গঙ্গামায়ের বিগ্রহ শোভাযাত্রা সহকারে মকুবার মন্দিরে নামিয়ে আনা হয়। ধরালী ও মকুবা আপেল উৎপাদনের জন্য

বিখ্যাত।

ছিপলা কেদার ঃ (৪২৮৬) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা পিথোরাগড়। রূপ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোষাগার। জেলাশহর থেকে বাসপথে ১৪৯ কিমি। পর্যটকের স্বর্গরাজ্য।

মল্লিকার্জুন মন্দির ঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা পিথোরাগড়। জেলা শহর থেকে ৫৪ কিমি। কাতুরির রাজার প্রাচীন রাজধানী। কাতুরির শেষ রাজাও এখানে রাজত্ব করেছেন। এখানে রাজাদের আশিটি দুর্গ ছিল। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্তমান। সেই থেকে ৮০ কোট। অপভ্রংশে আশকোট। শাল, সেগুন ও পাইন অরণ্যে সুশোভিত। নিকটেই নারায়ণ স্বামীর আশ্রম।

পাতালভুবনেশ্বর ঃ (১৩৫০) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা পিথোরাগড়। জেলাশহর থেকে বাসপথে ৯১ কিমি। গোংগোলিহাট থেকে ১৪ কিমি। গুহামন্দির। সুড়ঙ্গপথে গুহা-মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ দ্বারে ছোট ছোট গুহায় অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে।

মহাকালী মন্দির, গংগোলি হাট, শক্তিপীঠঃ রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা পিথোরাগড়। জেলাশহর থেকে বাস পথে ৭৮ কিমি। লোকনৃত্য ও সংগীত চর্চার জন্য বিখ্যাত। আদিগুরু শঙ্কারাচার্য গংগোলিহাটে শক্তিপীঠ স্থাপন করেন। মন্দিরে দেবতা মহাকালীমূর্তি। অতি প্রাচীন মন্দির। শক্তি উপাসনার পীঠস্থান।

রঘুনাথ মন্দির, দেবপ্রয়াগ ঃ (৬১৮মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা টেহরী। অলোকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। ঋষিকেশ থেকে বাসপথে ৭১ কিমি। মহারাষ্ট্রের রাজা দেবশর্মার নামে সঙ্গমের নামকরণ। সঙ্গমের তীরে মন্দিরের অবস্থিতি। মন্দিরগাত্রে অপূর্ব কারুকার্য। বৌদ্ধধর্ম ও দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন। মন্দিরের বিগ্রহ রঘুনাথ অর্থাৎ রামচন্দ্র, মাতা জানকীদেবী ও লক্ষ্মণ। রাত্রিবাসের জন্য জি.এম.ভি এন এর টুরিষ্টলজ। চালককে বলে রাখলে টুরিষ্ট লজের সামনেই নামিয়ে দেয়।

বুড়াকেদার মন্দির ঃ (১৩৫০) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা-টেহ্‌রী। টেহ্‌রী থেকে বাসপথে ৫৯ কিমি। বালগঙ্গা ও ধরমগঙ্গা নদীর সঙ্গমে বুড়াকেদারের অবস্থিতি। কথিত আছে রাজা দুর্যোধন এই সঙ্গমে তপস্যা করেছিলেন। সঙ্গমের তীরে ভৃগু পর্বত। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ ভৃগু পর্বতে বালখিল্য ঋষির দর্শন পান। ঋষির পরামর্শমত সঙ্গমের তীরে এসে এক প্রাচীন ব্যক্তির পরিবর্তে দীর্ঘদেহী শিবলিঙ্গের দর্শন পান। ঋষির উপদেশ মত পাণ্ডবগণ ঐ শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করেন। আলিঙ্গনের চিহ্ন লিঙ্গের গাত্রে আজিও বর্তমান। এই শিবলিঙ্গ উত্তর ভারতের দীর্ঘতম শিবলিঙ্গ তাই এর নাম বুড়াকেদার।

কি ভাবে যাবেন — ঋষিকেশ থেকে সরাসরি বাস পাবেন বুড়াকেদারে আসার।

সুরখাণ্ডা দেবীমন্দির ঃ (৩০৩০মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা-টেহ্‌রী গ্রামের নাম কাঁদুখাল। বাসপথে মুসৌরী থেকে ৪০ কিমি, এবং চাম্বা থেকে ২৪ কিমি দূরত্বে কাঁদুখালের অবস্থিতি। কাঁদুখাল থেকে ২ কিমি হাঁটাপথে সুরখাণ্ডা দেবীর মন্দির। মন্দির আঙ্গিনা থেকে তুষারশুভ্র হিমালয় দৃশ্যমান। প্রতিবছর জুন মাসে মেলা বসে।

কুঞ্জপুরী মন্দির ঃ (১৬৪৫মি) রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা-টেহ্‌রী। ঋষিকেশ থেকে অনধিক দূরত্বে পাহাড়ের মাথায় মন্দিরের অবস্থিতি। জীপ কিংবা বাসে দিনে-দিনে মন্দির বেড়িয়ে ঋষিকেশ ফেরা যায়। প্রতি বছর দুর্গাষ্টমী তিথিতে মেলা বসে।

চন্দ্রবদনী মন্দির ঃ উত্তরাঞ্চল। জেলা-টেহ্‌রী পাহাড়ের মাথায় মন্দিরের অবস্থিতি। মন্দিরের বিগ্রহ দেবী চন্দ্রবদনী। প্রতিবছর এপ্রিল মাসে মেলা বসে। গাড়োয়ালের নানা প্রান্তের মানুষ মেলায় উপস্থিত হন। শ্রীনগর-টেহ্‌রী রাস্তার উপর কন্দিখাল থেকে মন্দির ৮ কিমি ট্রেক। চন্দ্রবদনী থেকে তুষারশুভ্র হিমালয়ের ধ্যানমৌন রূপ দৃশ্যমান।

যমুনোত্রী মন্দির ঃ (৩১৮৫মি) উত্তরাঞ্চল। জেলা-উত্তরকাশী। যমুনোত্রীর মন্দির থেকে ১ কিমি উপরে ৪৪২১ মি উচ্চতায় যমুনা নদীর উৎস। মন্দিরে যমুনা মায়ের কাল্পনিক মূর্তি। ঋষিকেশ থেকে গঙ্গোত্রীর পথে ধরাসু। ধরাসুতে রাস্তা দ্বিধা বিভক্ত। বাঁ-হাতি পথে যমুনোত্রী। বাস পথের প্রান্তিক স্টেশন

হনুমানচটি। হনুমান চটিতে জি এম ভি এন এর টুরিষ্ট লজ আছে। হনুমানচটি থেকে ১৩ কিমি ট্রেক। ঋষিকেশ থেকে সরাসরি বাস মেলে হনুমানচটির। যমুনোত্রী উষ্ণপ্রস্রবণের জন্য খ্যাত। থাকার জন্য কালীকমলী ধর্মশালা, জি এম ভি. এন টুরিষ্ট লজ ও প্রাইভেট হোটেল পাবেন।

মা হরিয়ালদেবী ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা- রুদ্রপ্রয়াগ। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ১৪০০মি। জেলা শহর রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কর্ণপ্রয়াগের মাঝে নাগাসুর। নাগাসুর থেকে পথ গিয়েছে হরিয়ালী দেবী মন্দির। বাস, জীপ, অথবা ট্যাক্সিতে দূরত্ব ২২ কিমি। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ৩৭ কিমি। সুগভীর অরণ্য শোভিত ও পর্বতমালা বেষ্টিত পরিবেশ। প্রতি বছর জন্মাষ্টমী তিথি এবং দীপাবলীতে বিরাট মেলা বসে। মন্দিরের বিগ্রহ সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি। দেবীমূর্তি স্বর্ণালংকারে সুশোভিত। প্রতিবছর দীপাবলীর দিন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে দেবীমুর্তি পাল্কিতে চাপিয়ে ৭ কিমি দূরে হরিয়ালী কান্তায় নিয়ে যাওয়া হয়। উচ্চতা ৩০০০মি। এখান থেকে হিমালয়ের তুষারশুভ্র শৃঙ্গ ছবির মতো দেখায়।

ওঁকারেশ্বর শিবমন্দির ঃ রাজ্য উত্তরাঞ্চল। জেলা-রুদ্রপ্রয়াগ। স্থান উখিমঠ এখন আধুনিক শহর। ওঁকারেশ্বর শিবমন্দির শহরের প্রধান আকর্ষণ। জেলা শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। বাস, জীপ ও ট্যাক্সি সর্বদাই মেলে। মন্দিরকে কেন্দ্র করেই শহরের ব্যাপ্তি। প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায় রাজা বাণাসুর একদা ঊষাকে নিয়ে এইখানে বাস করতেন। কন্যার নামানুসারে স্থানের নাম রাখেন ঊষামঠ। পরবর্তীকালে উখিমঠ। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ কোন এক সময়ে রাজকন্যা ঊষার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উখিমঠের মন্দিরে ঊষা ও শিব-পার্বতীর প্রস্তরময় মূর্তি শোভিত। মন্দিরের এক দিকে প্রিয় সখী চিত্রলেখার মূর্তি স্থাপিত হয়। নেপালের রাজা ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে রাজমাতা বর্তমান মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। থাকার জন্য উখিমঠে ভারত সেবাশ্রম সংঘের অতিথিশালার ব্যবস্থা ভালই। উৎসাহী পর্যটকগণ উখিমঠ থেকে ১৪ কিমি দূরের প্রকৃতির বিস্ময় দেউরিয়াতাল বেড়িয়ে নিতে পারেন।

কমলেশ্বর মহাদেব মন্দির : রাজ্য-উত্তরাঞ্চল। জেলা-পৌরী। শ্রীনগর শহরের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের অবস্থিতি। মন্দিরের বিগ্রহ শিবমূর্তি। কথিত আছে রাবণ বধের পর শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনগরে আসেন। তিনি এইখানে বিদেহী আত্মার মঙ্গল কামনায় প্রতিদিন একশত পদ্মফুল দিয়ে শিবজীর উপাসনা করেন। শিবজী একদিন রামচন্দ্রের নিষ্ঠার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একটি পদ্মফুল লুকিয়ে রাখেন। রামচন্দ্র অর্ঘ্য নিবেদনকালে একটি ফুল না পেয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। তিনি বিনা দ্বিধায় একটি আঁখি উৎপাটন করে সংকল্প পুরণ করেন। রামচন্দ্রের নিষ্ঠায় শিবজী পরম তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি সশরীরে আবির্ভূত হয়ে রামচন্দ্রকে বর প্রদান করেন।

কোথায় থাকবেন

হিমালয় সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই হরিদ্বার ও ঋষিকেশের কথা এসে যায়। ভারতবর্ষের সকল মানুষের মনে এই দুই স্থানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা জড়িয়ে আছে অনাদি কাল থেকে। জীবনে, অন্ততঃ একবার হরিদ্বার ঋষিকেশ না গেলে জীবনটাই যেন বৃথা।

হরিদ্বার ঋষিকেশ হিমালয়ের প্রবেশদ্বার। এই স্থানদ্বয় সমতল ও পাহাড়ের সঙ্গমে অবস্থিত। জলবায়ু অতীব চমৎকার। এই দুই স্থানের যাত্রা পথ অপেক্ষাকৃত সহজ।

অতীতে রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। সে সময়ে হিমালয়ে যাওয়া ছিল অতি কষ্টসাধ্য ও দুঃসাধ্য। হিমালয় দেবভূমি, শ্রেষ্ঠতম, উচ্চভূমি। হরিদ্বার ও ঋষিকেশের আগল ডিঙিয়ে হিমালয়ে প্রবেশ।

হরিদ্বারের মাহাত্ম্য আরও বেশী, এখানে কুম্ভমেলা হয়। প্রতি ১২ বছর অন্তর পূর্ণ কুম্ভ, ৬ বছর অন্তর অর্ধ কুম্ভ। কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ঋষি, মুনি, ও মহাত্মার সমাগম হয় হরিদ্বারে। তাঁদের চরণ স্পর্শে হরিদ্বারের প্রতিটি ধূলিকণা, উপলখন্ড পরম পবিত্র।

মা গঙ্গা ঋষিকেশে এসে প্রথম সমতলভূমি স্পর্শ করেন। মহর্ষি ভগীরথ সুদীর্ঘ তপস্যায় মা-গঙ্গাকে ব্রহ্মার কমন্ডুলু মুক্ত করেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ আজীবন তপস্যা করেও যা সম্ভব করতে পারেন নি।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। এদের কল্যাণে আধুনিক হয়েছে শহর। পর্যটন কেন্দ্র, ধর্ম চর্চার পীঠস্থান। এই দুই পবিত্র স্থানে এসে কোথায় থাকবেন সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মনে একটা অশান্তির ভাব থেকেই যায়। হরিদ্বার স্টেশনে নেমে পাঁচ টাকার রিক্সা ভাড়ায় বদলে বিশ টাকা দিতে হয়। অসাধু ব্যক্তির প্ররোচনায় অশান্তির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। সাধারণ ভ্রমণ পিপাসু ও হিমালয় প্রেমী মানুষের এই অশান্তি দূরীকরণের ইচ্ছা নিয়ে এই লেখার অবতারণা।

পূর্বেই বলেছি হরিদ্বার-ঋষিকেশ এখন আধুনিক শহর। ছোট, বড় মাঝারি মাপের অনেক হোটেল, লজ, ও রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে হরিদ্বার ও ঋষিকেশে।

বিলাস ব্যয় বহুল ব্যবস্থায় এদের নিকট থাকার কোনই অসুবিধা নেই।

সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত, ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তীব্র।আমার এই লেখা তাদের জন্য।যাত্রার পূর্বে ভ্রমণে গিয়ে কোথায় থাকব সে বিষয়ে জানা থাকলে চিন্তার অনেক লাঘব হয়। কলকাতার যাত্রিগণ যাত্রার পূর্বে ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে হরিদ্বারে তাদের আশ্রমে থাকার অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

হরিদ্বার ঋষিকেশ অতি প্রাচীনকাল থেকেই তীর্থ নগরীর সম্মানে ভূষিত। বর্তমান যুগে হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরে অসংখ্য মন্দির, ধর্মশালা ও আশ্রম নির্মিত হয়েছে। তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক তীর্থ যাত্রীর অভ্যর্থনায় হরিদ্বার ও ঋষিকেশের আয়োজনের কোন ঘাটতি নেই। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ ২৪ কিমি। এই সুদীর্ঘ গঙ্গাতীরে এখন 'মেরিণ ড্রাইভ' তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

যাত্রার পূর্বে লক্ষ্য স্থানের বিষয়ে কিছু জানা থাকলে ভ্রমণ সুন্দর ও আনন্দ প্রাপ্তি অধিক হয়।

তীর্থে এসে হোটেলের চার দেওয়ালে বন্দী থাকা মোটেই কাম্য নয়। মানুষ হরিদ্বার ঋষিকেশ আসে গঙ্গা, প্রকৃতি ও হিমালয়ের স্বাদ পেতে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এই চার মাস এখানে আসার অতি চমৎকার সময়। ঠান্ডার আমেজ থাকলেও মিষ্টি রৌদ্রে খোলা মেলা পরিবেশে হাত পা ছড়িয়ে বসতে ভালই লাগে। শরীর ও মনের খোরাক মেলে।

ঋষিকেশ ঃ ঋষিকেশ এসে কয়েকটা দিন নিশ্চিন্তে আনন্দে ও শান্তিতে থাকতে চাইলে ঋষিকেশ স্বর্গাশ্রমে চলে আসতে পারেন। মুনি-কি-রেতি ঘাটের অপর পার স্বর্গাশ্রম। এখানে পাবেন —

গীতা ভবন ঃ মুনি - কি - রেতি ঘাটে রামঝূলা পেরিয়ে স্বর্গদ্বার ঘাট। হরিদ্বার থেকে বাসে অথবা অটোয় রামঝুলা। ডান হাতে সামান্য গিয়ে 'গীতাভবন'।

প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করে বাঁ-হাতে ৯নং ঘরে অফিস। অফিসে

যোগাযোগ করলে বিনা ভাড়ায় দ্বিশয্যার শয়ন কক্ষ পাবেন। সাথে রান্না ঘর টয়লেট, বাথ ইত্যাদি। একা হলে ডরমিটারিতে থাকার জায়গা মিলবে, সাথে জিনিষপত্র রাখার জন্য আলমারি পাবেন। এদের ক্যান্টিনে ১০ টাকায় পেট ভর্তি আহার মেলে। ভাত, ডাল, সবজি, রুটি ও পায়েস। যত দিন ইচ্ছা থাকতে পারেন। গীতা ভবনের এখন ৫নং পর্যন্ত চালু। ৬ও৭ নম্বরে কাজ চলছে। এদের নিকট ২-৩ হাজার কামরা আছে।

পরমার্থ নিকেতন ঃ গীতা ভবন পেরিয়ে সামান্য এগিয়ে পরমার্থ নিকেতন। মার্বেল পাথরের বাঁধানো আঙ্গিনা। অপূর্ব পরিবেশ। এদের অফিসে যোগাযোগ করলে ৬০ টাকায় আলো বাতাস যুক্ত দ্বিশয্যার সুসজ্জিত ঘর পাবেন। সাথে রান্না ঘর, জল, লাইট, টয়লেট বাথ, হাতের কাছে এস.টি.ডি বুথ, লাইব্রেরী, সিকিউরিটি। সর্বক্ষণ প্রবচন, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি পাঠ। রান্নার বাসনপত্র বিনা ভাড়ায়। বিনা পয়সায় মেন্টেনেন্স সার্ভিসিং। পরমার্থ নিকেতনে কিছু টাকা অগ্রিম (ফেরত যোগ্য) জমা রাখতে হয়। রসিদে সবকিছু লেখা থাকে। যাত্রার দিন রসিদ দেখিয়ে বাড়তি টাকা ফেরৎ পাবেন।

বানপ্রস্থ আশ্রম ঃ পরমার্থ নিকেতন পেরিয়ে কিছুটা গিয়ে রাস্তার উপর লম্বা সাইনবোর্ডে লেখা বানপ্রস্থ আশ্রম, বাবা কালী কমলী ওয়ালা।

এদের দুটি ক্যাম্পাস। এদের কাছে প্রতিদিন১০০ -১৫০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়ায় ঘর পাবেন। এরা ঘরের ভাড়া বলতে রাজি নয়। এদের বক্তব্য আমাদের কোন চার্জ নেই। Maintenance Cost টুকু মাত্র নিই। এদের অনেক স্টাফ অনেক সিকিউরিটি। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এদের কাছে Single Room, 2 Rooms Flat, Delux, Double Room etc. আছে। পরিবেশ অসাধারণ। সাধারণের পক্ষে ১৪০ টাকার ঘর যথেষ্ট। মনে হবে নিজের কোয়ার্টারে আছি।

এত বিশাল ক্যাম্পাস আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই।

কোলকাতা অফিস থেকে বানপ্রস্থ আশ্রমের অগ্রিম বুকিং হয়। ঠিকানা—

Baba Kalikamali Wala Panchayet Kshetra
Manohar Katra
208, Mahatma Gandhi Road, Kolkata - 700 007

Where to Stay

Garwal Srinagar	1)	Kalikamali Dharmashala
	2)	GMVN Tourist Lodge
	3)	Hotels & Lodges near Bus Stand
Rudraprayag	1)	Kalikamali Dharmashala
	2)	Badri-Kedar Mandir Committee's Guest House.
	3)	GMVN's Tourist Lodge
	4)	Private Hotels & Lodges
Gourikund	1)	Kalikamali Dharmashala
	2)	Bharat Sevashram Sangha
	3)	hotel Devlok
	4)	Hotel Shivlok etc.
Kedernath	1)	Bharat Sevasharam Sangha
	2)	Kalikamali Dharmashala
	3)	Sankaracharya Samiti Bhawan
	4)	Birlaniketan
	5)	Panjab Sindh
Guptakashi	1)	Panjab Sindh
	2)	Hotel Neelkamal
Ukhimath	1)	Bharat Sevashram Sangha
Badrinath	1)	Balananda Tirthasram
	2)	Bharat Sevashram Sangha
	3)	Kalikamali Wala

Goaldam	1)	Fast Food Centre Guest House
	2)	Hotel Trisul
Munsyari	2)	Pandey Lodge
	2)	Puja Lodge
Haridwar	1)	Inder Kutir Guest House *Niranjani Akhara Road,* *Ph. : (01334) 226336*
	2)	Raj Hotel, Bishnu Ghat
	3)	Bharat Sevashram Sangha, *Deopura*
Rishikesh	1)	Hotel Dig Vijay, *Yatra Bus Stand*
	2)	Hotel Uttaranchal, *Dehradoon Rd.*
	3)	Hotel Himalaya, *Dehradoon Rd.*
	4)	Siva Nanda Sadan, *Muni-Ki- Reti (Ramjhoola)*

Accommodation in Badri-Kedar Temple Committee's guest houses are also available at the following places :

In Kedarnath Route :

Rishikesh *Deboprayag*
Srinagar *Rudraprayag*
Guptakashi *Madamaheswar*
Kedarnath *Kalimath*
Gourikund

In Badrinath Route :

Karnaprayag *Pipulkothi*
Badrinath *Chamoli*
Joshimath

Banaprastha
Kalikamali Wala
single room A.B. Furnished @100/- Per day
Double room A.B. Furnished @..........
Monohar Das Katra
208, Mahatma Gandhi Road,
Kolkata - 700 007

Baba Kali Kamali Wali Panchyet
Monohar Katra
208, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007

for Booking Accommodation in Banaprastha Asram at Kali Kamali Walw Panchyet Kshetre,

Rishikesh Swargasharam
1-2 room Flats with big hall, Kitchen Indian &English toilet & Baths.@ 800/- Per Day
Super delux @.......
Ordinery
Double Bed Room with Kitchen, toilet, one fridge – good & Almirah Furnished.

এদের এখানে 100/- টাকা থেকে 150/- পর্যন্ত কামরা আছে।
ঘরের ভাড়া 100/- - 140/-
AC 2 Rooms Passage 1500/- per day for 3 days.
বর্তমানে 268 টি রুম আছে।

Secretary - Mr. Sm. Tulsian

HIMALAYA DARSHAN

Vol. III

KALIDAS CHAKRABORTY

TREKS & TOURS
KOLKATA 700008

Himalaya Darshan, Vol. III

A book on Trekking.

by Kalidas Chakraborty

Published by

Ranju Chakraborty

Kolkata Book Fair -2004

Available

Treks & Tours

76A/1 Bamacharan Roy Rad

Kolkata-700008

Ph.2406 8597

Index

ISBN 81-901723-11

Rs 180.00

Acknowledgement

The publication of Himalaya Darshan Vol.III has become successful due to absolute kindness of the omnipotent God Lord Shiva and the blessings of my venerable Gurudev late swami Gangadasji Falahari baba. My highest regards to them with humble submision and melted heart.

I am thankful and grateful to Swami Sachhidananda Brahamachari of Tapavan Valley of Gomukh Glacier, for the troubles that he has taken for me to accompany in different parts of Mt. Himalaya. Swamiji was responsible and source of inspiration to visit Chandrabadani, Kartick swami on the top of Mt. Cronch and Budakedar.

I would like to pay my sincere thanks and gratitude to Mr. Jagadambaprasad Nambrudi, the Deputy Chief Executive officer of Badri-Kedar Temple Committee for the act of kindness, services and co-operation extended to me for the interest of the pilgrims. All the valuable infomatios with respect to Lord Kedarnath temple,Tourists, Trekers, Sadhus, Pilgrims and their welfare are given by him, have been published in the book.

I am very much greatful and thankful to Mr. Ajoy Sing Nabial, IAS , Managing Director of Garwal Mondal Vikas Nigam for the troubles that he has taken for me to give patience hearing on my Trekking expedition in Garhwal & Kumaon Himalaya. His valuable suggestions acted upon me like a dynamic thrust. He is a Himalayan man with Himalayan spirit & mind.May Lord

bless him to remain in happy & peaceful life.

It is needless to say that revered Dr.Kedareswar Chakraborty, Kabya-Biyakaran-Puran-tirtha is my beloved Sir, His Himalayan Grateness& softness are beyond estimation. He has writen the preface of this Book.I like to convey my bow and best wishes to him.

Professor Sudhangshu Sekhar Chattopadhya is my friend, Philosopher & Guide. He has spend his valuable time for me to make the Publication fair and perfect, I am indebt and grateful to him.

At last but not the least,my best wishes & regards to my friends,companions,Guide, porters, Hosts etc etc in my journey at Mt. Himalaya. 'Our entire journey to crush the ego' It is an opportunity to me to acknowledge the debt which I owe to the Himalaya.

I am thankful and greatful to Mr. K.S.Sah of Mid point Fast Food Centre & Guest house, main market Goaldam, for the troubles that he has taken for me to send the photographs which were taken from the roof of his Guest house. The cover of my 11th publication 'Rahaswer Antarale Rupkund' is due to his achievement. Mr. sing is a man of Garwal & Kumaon with Himalayan mind & services. All sorts of Co-operation, help and guidence are available with him. My readers can contact him over phone Ph. : (35962) 280 609 . My readers reply the debt which I borrow with him.

About the Author

Himalaya Darshan Vol. I, II & III are the open-handed distribution of practical experiences of the Author. Author is neither yogi,Rishi, Muni or Sadhu.He is a dedicated Treker & Mountain-lover.Deep devotion to Mt.Himalya has bring about a great change in his life.He is diciplined, sincere and particular in nature.He is self confident. He has firm faith in absolute truth. He never thinks alone. He never says 'alone'. In his openion— right from the deperture of the house somebody guide me in the right path.

This path-finder cannot be seen. Author finds everythings ready in Himalaya. He becomes stimulus by reciting-'Om namah Shiva'.

Himalaya is the treasure of happyness,peace and wealth.It receives nothing but gives everything. The Author was gifted with highest sense or blessings of his Himalayan Gurudev of Amritaghat, Gangotri. He has been initiated with a spirit of Service, sacrifice and sincerity. Himalaya is great majestic and Devine. Its magnitude of grateness and depth of spirituality are beyond estimation.

About the Book

The book Himalaya Darshan is flavoured with Himalayan essence. it is the true reflection of truth,beauty & goodness. The book is a publication of perfect distribution of recent Practical experiences of the Author.

The book is specially writeen for Bengali Tourists, Trekers and pilgrims. They find the details informatons of their destinations. Mountain-lovers and Nature-worshipers are able to prepare the tour programme without any problem. Route map, route chart, datewise itinerary, Bus,Train arrival & departure timings, distances,altitudes etc. are all available in the book as ready-reconer.

Vivid descriptions of the Himalayan tourist-spots,trekking route, places of interest, Shrines & Abode of dieties are also given in the book.The places where the Author visited personally have been included in the book.Author is fond of Garhwal & Kumaon Himalaya. He visits every year at different parts of these regions . He is familiar and popular with the Nature & climate of that area. He is treated as a member of the family of that locaiities. Himalaya Darshan is the current,alive and were failing companion into tourists trekers & Pilgrims.

Mystery of Himalaya

Mt. Himalaya is the principal creation of lord Bramha,the God of creator of the Universe. It is the paradise of plants,animals and human existence, origin of rivers, streams and mountains. Place of meditation, of salvation . Tresure of pleasure, peace & happiness. Deep silence,excelent climate ,Superb beauty of nature and endless sacrifice are its object. Green woods, every stone, each drop of water, are pure, and delightful holly time immemorial. From Rishis , Munis yogis used to go to Himalaya for devotional practice and Salvation. The great king Surat and the king Samadhi went to Himalaya in search of peace and happiness. Pandavas went to Himalaya to be liberated from sin. Devotees proceed to Himalaya for the attainment of Divinity.Himalaya is great and a secured place of God & Goddes and a house of worship.

At the present set up of the society, wondering in Himalaya during leisure has became a status symbol. People of various sections of different parts of the country move to the Himalaya in search of peace and happiness and made themselves refreshed.

The Lord of Himalaya is called Lord Shiva are resides at the top of Mt. Kailash. He is defind as a symbolic representaion of universal truth and supreme conciousness. – It is called.

Treak To Roopkund

01 Day : Gowaldam – Lohajang

After breakfast drive 60 Km. from Gowaldam to Lohajang via Tharali, Deval & Mandoli, night halt at zila parisad Banglow, Lohajang. Arrange Porter & collect Ration etc from Lohajang market.

02 Day : Lohajang – Didna Village

After breakfast 10 Km. trek to village Didna. Night halt at Didna primary school, very small village.

03 Day : Didna (8000') –Bedni Bugyal (12800')

After breakfast up hill trek through dense forest to Ali Bugyal, valley of flowers and Gods' Paradise in Nature. Continue another 5 km. asscending the Bedni bugyal and Night halt. Set up Camp and enjoy Lake and Mountain like Nanda Ghunti, Trishul, Hatiparbat etc etc.

04 Day : Halt at Bedni for acclimatization.

05 Day : Bedni – Baguabasha (14000')

After breakfast left for Baguabasha. 12 km trek to Baguabasha. Passing over Panoromic view of Patarnachuni and Kailuvinayak. Set up camp at Baguabasha (14800') and night halt.

06 Day : Baguabasha – Roopkund (16800')

After breakfast 6 Km.up hill trek to Roopkund enjoy panoromic of snow-caped mountain . Wonderful lake.

As per ligendary Mother Nanda Devi saw the reflection of herself in the water. On the way to her father's in law's house at Trishuli Mountain. Offer Puja & Prayer to Lord Siva.

07 Day : Roopkund – Bedni

Return down hill trek, 18 km. to Bedni from Roopkund. and night halt.

08 Day : Bedni – Lohajang

After breakfast 24 km down hill trek to lohajang through the dense forest, Lunch enroute. The trek ends. Night halt at Lohajang.

Treak To Milam Glacier

01 Day : Haldwani – Munsyari (2135m)

After breakfast drive 29 Km. from Haldwani to munsyari. Bus, taxi, Jeep are available. Bus fare Rs. 185.00 each. Bus left Haldwani at 5 am in the morning and reach munsyari at afternoon, through the mountain township Almorah, koushani, Ranikhet etc. Night halt at Munsyari.

02 Day : Halt at Munsyari

Halt at Munsyari for porter etc, Contact Indore Singh for breakfast, Lunch, Dinner. Contact Bahadur Singh's Restaurant or Dhami Restaurant. Enjoy Mt. Panchachuli. Meet (ITBPF) for necessary help & permition.

03 Day : Munsyari – Lilam (18km)

After breakfast drive 11 Km. to Selapani by Jeep or Sumo, trek 7 km to Lilam. Lunch at Jimighat or Lilam. The river Gori Ganga always accompany. Night halt Lilam at the house of Ghana Shyam Shing. Lilam is under of ITBPF. They are very nice and helpful, worship at the temple of Goddes Durga.

04 Day : Lilam – Bagudiar (2609m)

After breakfast, Collect packed Lunch from Ghana Shyam (Host) Singh. Trek 13km to Bagudiar. Beautiful path along the dancing river Goriganga. night halt in the tent or PWD'S rest House. Room is good, attached bath. Room charged Rs. 100/- Contact Chowkidar. Just after the arrival at Bagudiar inform ITBPF for permition onword trek.

05 Day : Bagudiar – Rilkote (2135m)

After breakfast trek 12 km. Lunch enroute. Dancing Gori

snow-caped Mountain. Night halt at the private hotel of the Local people. take help of ITBPF.

06 Day : Rilkote – Milam (3707m)

After breakfast collect packed lunch. trek 14 km. Night halt at PWD'S rest house. Charges Rs. 100/-. Temperature is low.

07 Day : Milam – Milam Glacier (4242m)

After breakfast 5 km uphill trek to milam glacier. After enjoying back to Milam village. Then to Rilkote and night halt.

08 Day : Rilkote – Bagudiar (2135m)

After breakfast trek to Bagudier and night halt.

9 Day : Bagudier – Munsyari (2135m)

After breakfast trek to Selapani. Lunch enroute. drive 11km to Munsyari and trek ends.

Treak To Kedarnath

Ancient Path

01 Day : Rishikesh–Guptakashi – Khunnu

After breakfast 8hrs. drive to Guptakashi by bus. Another 15 kms drive to Khunnu Base Camp by Jeep. via Kalimath/Kotma Dancing Kaliganga shall accompany you. Enjoy ukhimath on the opposite bank of the river Kaliganga. Establish Base Camp at Khunnu. Khunnu is famous for Kotimayeswari and Ruch Mahadev. confluence of Madhu Ganga & Saraswati Ganga is wonderful. Offer Puyas & Prayer to the God & Goddess.

02 Day : Halt at Khunnu.

Arrange Porters, Guide, Tent etc. Collect ration, Kerosin & Kitchen, make ready packing etc. do welfare Programme for this Local people i.e Distribution of medicine, Health cheake-up Camp, Slide show etc.

03 Day : Khunnu – Deuli Bugiyal

After breakfast, 5 hours trek to Deuli, Passing the village like Jaltalla, Malla, Choumashi, The trek is fantastic. night halt at Deuli.

04 Day : Deuli – Dhaneju Bugiyal

After breakfast 5-6 hrs. trek to Dhaneju Bugiyal. The trek is fantastic, charming and adventurous through the dense forest. The trek is ascending. Night halt at Dhaneju Bugiyal at your choice.

05 Day : Dhaneju – Bahujatia Bugiyal

After breakfast 3-4 hrs trek to Bahujatia Bugiyal, night halt with the association of Glacier Bahajatia top. Enjoy Snow-Caped Mountains. Night halt at the Bugiyal.

06 Day : Bahujatia – Kedarnath

After breakfast 4-5 hrs. trek to Kedarnath via Vairabnath Temple. On the way enjoy the valley of Brahma Kamal of Fen Kamal.

07 Day : Kedarnath – Gourikund

After breakfast 4-5 hrs trek to Gourikund. Take bath at hot spring and be refreshed. Halt at Gourikund. The trek ends.

Rules of Life

1. Rise in the morning , ready for the day (toilet, bath, exercise, prayer etc.) make you feel refreshed & re-gained.

2. An Ounce of simplicity is more valuable than a pound of cleverness.
3. No one can make you feel inferior but your consent.

4. Patience is bitter plant but has a sweet fruit.

5. Always see the bright side of every thing & neglect dark side.

6. Always develop positive attitude in all activities. Avoied all negative thinking.

7. The fear of wrong deesds is the begining of perfection.

8. Addiction decreases the sense of justice, Devotion increases confidence.
9. Temptation is the route of all miseries.
10. Faliure of your expectation make you unhappy, should remain away from it.
11. Happiness and sufferings are opposite in nature be ready to face both of them.
12. Greatest things are always simple in neture.
13. Never do anything which make you fool.

14. Poverty is a curse, nobody likes it. It is the result of past sins and present lithargey.

15. Those who are reach within, usually lead a simple life.
16. Do you feel happy in receiving or giving ? If former you are an ordinary person, but latter you are an extra ordinary.
17. Never think injurious and speak ill of other.
18. Increase the habit of sacrifice by practice.
19. Never give any false statement which make you weak.
20. Always be truth in word and deeds which make you strong and happy.

Om Namah Shibaya

Pandit Sreenibash Posti

FRONTIEER HOUSE

(GUPTA KASHI), kEDARNATH

Janapad-Rurdaprag Arunachal Pradesh - 246445

বিজ্ঞানের ছাত্র। জন্ম ঃ ২রা ফাল্গুন ১৩৪১। পেশা অধ্যাপনা। নেশা ভ্রমন ও সমাজসেবা। আন্তর্জাতিক সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানে অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে (অবৈতনিক) দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন। বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ আশৈশব। প্রথম জীবন কেটেছে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে। পরবর্তীকালে শুশুনিয়া পাহাড়ে বেসিক ও স্ট্যান্ডার্ড রক-ক্লাইম্বিং কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

হিমালয়ের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরেছেন রসের সন্ধানে। যোগীমহাত্মার সান্নিধ্যে রাত কাটিয়েছেন গিরি-কন্দরে। পায়ে পায়ে ভ্রমণ করেছেন হিমাচল, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, সিকিম ও নেপালের নানা অঞ্চলে। আহরণ করেছেন হিমালয়ের ঐশ্বর্য ও বিরাটত্ব। শুভ্র গি[illegible] সন্দর্শনে অনুভব করেন ভগবানের অপার মহিমা। অন[illegible] পার্বতীয় মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। স[illegible] ভগবানের করুণাধারায় অবগাহনের নেশায় লেখক বর্তমান[illegible] বেশিরভাগ দিনগুলি হিমালয়েই কাটান।

প্রকাশক